Jagannath University

Journal of Arts

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস

Faculty of Arts | কলা অনুষদ

Volume 14, Number 2

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts

Volume 14, Number 2, July-December 2024
ISSN 2519-5816

Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, Number 2, July-December 2024

Published in : April, 2025

All views and ideas expressed in articles published in the journal solely belong to the author(s). The Editor, the Editorial Board and the Publisher have no responsibility or liability in such cases.

Published by : Dean, Faculty of Arts
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh

Cover Design : Rasel Rana

Printed at : DS Printing and Packaging
234/D New Elephant Road, Dhaka-1205
Cell : 01817078796

Subscription : BDT 300/- (Three Hundred Taka)

ISSN : 2519-5816

Chief Editor

Dr. Hosne Ara Begum

Faculty of Arts
Jagannath University, Dhaka-1100
www.jnu.ac.bd

Advisory Board

Professor Dr. Sharif Uddin Ahmed
Retd. Professor
Department of History
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Syed Manzoorul Islam
Retd. Professor
Department of English
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Syed Azizul Haque
Retd. Professor
Department of Bangla
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. M. Matiur Rahman
Retd. Professor
Department of Philosophy
University of Dhaka, Dhaka

Professor Nisar Hossain
Department of Drawing & Painting
Faculty of Fine Arts
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Lutfor Rahman
Department of Drama & Dramatics
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

Professor Dr. Farida Akter Khanam
Department of Sociology
Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Muhammad Shafiq Ahmad
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Nusrat Fatema
Department of Islamic History and Culture
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Shamima Sultana
Department of Bangla
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

Editorial Board

Chief Editor	:	**Professor Dr. Hosne Ara Begum** Dean Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka
Associate Editor	:	**Professor Dr. Protiva Rani Karmaker** Institute of Modern Languages Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. A. K. M Mahbubul Haq Department of Bangla Jagannath University, Dhaka
Members	:	**Professor Md. Aloptogin** Dean Faculty of Fine Arts, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Mozaharul Alam Salim Chairman Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Md. Momin Uddin Chairman Department of English, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Murshida Bintey Rahman Chairman Department of History, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Mahmuda Khanam Chairman Department of Islamic History and Culture Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Md. Rais Uddin Chairman Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Mohammad Hafizul Islam Chairman Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka
		Dr. Jhumur Ahmed Chairman Department of Music, Jagannath University, Dhaka
		Katharin Purification Chairman Department of Theatre, Jagannath University, Dhaka
Editorial Assistant	:	**Md. Anamul Hoq** Deputy Registrar Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

সম্পাদকীয়

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি 'জার্নাল অব আর্টস' খণ্ড-১৪ সংখ্যা-২ প্রকাশ করা হলো। এ সংখ্যায় **১১**টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'জার্নাল অব আর্টস'-এর উপদেষ্টামণ্ডলী, সম্পাদনা-পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই জার্নালের সম্মানিত প্রাবন্ধিকগণকে, যারা তাদের মূল্যবান গবেষণা-প্রবন্ধ প্রেরণ করে কলা অনুষদ জার্নালকে সমৃদ্ধ করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা বিচক্ষণতার সাথে প্রবন্ধগুলো মূল্যায়ন করে তাদের সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা। জার্নালের দুজন সহযোগী সম্পাদকসহ কলা অনুষদভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা এই জার্নাল প্রকাশনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রবন্ধগুলোর বিন্যাস ও সূচি প্রবন্ধ গৃহীত হওয়ার তারিখ-ক্রম অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে।

অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম
প্রধান সম্পাদক
জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস

সূচি

		পৃষ্ঠা
১.	**আলী যাকের: স্বতন্ত্র রাজনীতি-সংস্কৃতির কাল্টপুরুষ** ড. সেলিম মোজাহার	১
২.	**আবুজাফর শামসুদ্দীনের *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* উপন্যাসে জাতীয় চেতনার স্বরূপ** ড. মো. মাসুদ পারভেজ	১৩
৩.	**খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধ : বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও ইসলামি নির্দেশনার আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা** মোহাম্মদ নুরুল আমিন সাইয়্যেদ মোঃ মাহবুব জাবিরী	২৭
৪.	**গৌরকিশোর ঘোষের ছোটগল্প : রাজনৈতিক অনুষঙ্গ** তাসনুমা জামান	৫১
৫.	***থিংস ফল এপার্ট*: ইবো সমাজে নারীর চিত্র** সোনিয়া পারভীন	৬৭
৬.	**রবীন্দ্রসংগীতে লোকগানের প্রভাব** নুসরাত জাহান প্রভা	৭৯
৭.	**ইকবালের দর্শনে আত্মার ধারণা : একটি বিশ্লেষণ** মুহাম্মাদ আবদুস সালাম	৮৭
৮.	**বাংলাদেশের কাব্যনাটকের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা** ড. জান্নাত আরা সোহেলী	১০৩
৯.	**সাঁওতাল হুল সূত্র অনুসন্ধান: বাংলার কৃষক আন্দোলনের মার্কসীয় বিচার** মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান হাওলাদার	১১৯
১০.	**A Comparative Study of Modernism and Postmodernism in Creative Yields** Md. Abdus Salam	১৩৭
১১.	**Thirty-five years later: Long-term effects of Maternal Health on the number of Births at Matlab, Bangladesh** Md. Rezaul Karim	১৫১

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

আলী যাকের: স্বতন্ত্র রাজনীতি-সংস্কৃতির কাল্টপুরুষ

ড. সেলিম মোজাহার*

Abstract:

Ali Zaker is a renowned cultural personality of Bangladesh, widely known as an actor. However, his identity goes far beyond acting alone. As a theatre activist, he not only wrote scripts (through translation and adaptation) but also directed a notable number of critically acclaimed stage plays. Moving beyond the boundaries of theatre and film, his life and work—if woven in a straight line—form a cohesive, epic-like narrative. This narrative, like pure art, may seem profoundly worthy in guiding both society and the individual. This writing seeks to follow and explore such an Ali Zaker—one who is not only politically inclined but for whom politics lies at the very core of his being. Yet, his politics does not conform to familiar or conventional patterns; it resides within the scope of his own cultural and social realization. This exploration will revolve around that remarkable scope, under the title: "Ali Zaker: The Cult Figure of Distinct Politics and Culture."

চাবিশব্দ: সৌখিন নাটক, গ্রুপ থিয়েটার, পেশাদার মনোভাব, বাঙালি জাতিসত্তা, বাঙালি-সংস্কৃতি, বাংলা অভিনয়তত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এক

সময় যদি দায় বোধ করে একজন প্রয়াত ব্যক্তিকে স্মরণ করার; সে ব্যক্তি মানুষটির গুণবাচক সত্তাগুলোকে পরীক্ষা করার; সেসব সত্তার সমন্বিত রূপে গড়া একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বে আবিষ্কার করার; তাহলে, নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, ব্যক্তি মানুষটি [কোনো এক সমাজের] বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে সামান্য কিছু নন; অনুসরণীয়, অনুকরণীয় একজন। অনুকরণীয়, হয়তো, সমাজ-রাষ্ট্রের উদার-নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে; প্রগতিমুখী পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায়; কিংবা নিছক ব্যক্তির আত্মজাগরণের আদর্শ হিসেবে। বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বৃত্তে 'আলী যাকের' [১৯৪৪-২০২০] তেমনই এক ব্যক্তিত্ব, যাকে 'অনুস্মরণ' করা গেলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতিকর্মীর আসল দায়টা উপলব্ধিতে আসে। যাকে অনুকরণ করা গেলে বাঙালির নিজস্ব প্রগতিবোধে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ ঘটে। যাঁর শরণ নিলে ব্যক্তির রাজনীতিবোধ পরিশীলিত মাত্রা পায়; ব্যক্তিজীবনে কৃত্যশাসিত জীবনাচারের অনুপ্রেরণা জাগে। এমনসব অনুসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা গেলে, তাহলে, সোজাসাপ্টা এ প্রশ্নটা তোলা যায়: 'আলী যাকের' নামের ব্যক্তিসত্তাটির ভিতর এমন কী-কী গুণ, কোথা থেকে, কী-পথে এসে জড়ো হয়েছে; যার সমন্বিত রূপ, একটা আর্টের মতো অনুকরণ করা হলে, জাতি হিসেবে অথবা একজন নিছক সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে সমৃদ্ধ হবার দিকদিশা পাওয়া যায়? তেমন এক অনুসন্ধানই জরুরি মানা হয়েছে প্রস্তাবিত রচনায়।

উত্থাপিত প্রশ্ন ও অনুসন্ধানের পথে প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে আনতে হবে [অতিসংক্ষেপে] আলী যাকেরের জন্ম-বিকাশ-বেড়ে ওঠা। সংক্ষেপে আসবে, কী করে যৌবনের সূচনারেখায় দেশকালের বৃহৎ প্রয়োজনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উপলব্ধির তাড়নায়, নিজেকে তিনি দাঁড় করান রণাঙ্গনে; পালন করেন, দেশ-জাতি-কালের সবচেয়ে গুরুদায়। অতি সংক্ষেপে আসবে, তাঁর পেশাগত জীবন [তথা আয়-রোজগারের] আর নেশাগত জীবন [নাট্য ও চিত্রধারক]-এর সীমানা-চৌহদ্দি। আর সবশেষে, সবিস্তারে আসবে, এসব কিছুকে ঘিরে এবং একই সাথে এসব কিছুকে ছাড়িয়ে তাঁর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার জগৎ; সবে মিলে, যেখানে আলী যাকেরকে ওপরে তোলা প্রশ্নটির বিপরীতে একটি মীমাংসিত জবাব হিসেবে পাওয়া যাবে – যা এ অনুসন্ধানের প্রাপ্তিফল।

উল্লেখ্য, এ লেখায় পণ্ডিতজনের তত্ত্বসমাহারের চেয়ে যাকেরের নিজস্ব বয়ান ও তাঁর জীবনকর্মে বাঙ্ময় কথামালাকেই মৌলিক পাঠ ও তথ্য-উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা বেশি গুরুত্বের মনে করা হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণে অনুসন্ধানটিতে থাকছে গুণগত, পর্যবেক্ষণমূলক বিচারপদ্ধতি। তুলনামূলক, ঐতিহাসিক বিচারের আশ্রয়ও থাকবে প্রক্ষিপ্তভাবে।

লেখায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের প্রাথমিক উৎস আলী যাকের রচিত *মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ!* নামের গ্রন্থটি। তাঁর রচিত *সেই অরুণোদয় থেকে* [২০১২], *ধর নির্ভয় গান* [২০১২], *দূরে কাছে স্বর্গ আছে* [২০১৫] শিরোনামের গ্রন্থগুলো সারপাঠ হয়ে ধরা পড়েছে *মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ!*-তে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে থাকছে তাঁর ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে 'এশিয়াটিক ইএক্সপি' প্রকাশিত *আমাদের বাতিঘর* [২০২১] নামের সংকলনে তাঁর পেশাগত কর্মসঙ্গীদের স্মৃতিচারণা এবং *থিয়েটার* ৫০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় [আলী যাকের স্মরণ সংখ্যা] তাঁকে নিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ জীবন-কর্ম-নাট্য সহচরদের স্মৃতি-কথামালা। বর্ণনামূলক বিচারপদ্ধতির চিরায়ত ফাঁক-ফোকর এখানেও থাকবে নিশ্চয়ই। তবে, কথা এই, সে ফাঁক-ফোকর থেকে কালে নতুন-নতুন প্রশ্ন উঠে এসে, নতুন সন্ধানের পথ তৈরি করে দেবে।

একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের বিচার আরও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নে শুদ্ধতর হয়ে প্রজন্মের কাছে নতুন-নতুন গুণে আর মানে ধরা দেবে। আগামীর কোনো এক বাঙালি-বাংলাদেশি তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণীয় ভেবে ধারণ করবেন নিজের সত্তায় – হয়তোবা হয়ে উঠবেন [অন্তত] বাংলা নাট্যমঞ্চের নতুন কোনো নূরলদীন, দেওয়ান গাজী, গ্যালিলিও, ম্যাকবেথ। অথবা, তাঁর দুর্বলতা, প্রত্যয়ের ফাঁক, ব্যক্তিত্বের ও বোধের দ্বন্দ্বগুলো শনাক্ত করে – সেগুলো এড়ানোর দিকদিশাও চিনে নিতে পারবেন সময়ের দায়ভাগ শুদ্ধ রাখার প্রশ্নে।

আলী যাকের স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাগরিক নাট্যাঙ্গনের একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাট্যাভিষেক ঘটেছিল মুনীর চৌধুরীর বিশুদ্ধ রাজনৈতিক নাটক *কবর* [১৯৫৩]-এর নেতার ভূমিকায়। নাট্যসংগঠন 'নাগরিক'-এর হয়ে বাদল সরকারের *বাকি ইতিহাস* [১৯৭৩] নির্দেশনা দিয়ে এদেশে 'গ্রুপ থিয়েটার' চর্চায় কালান্তর ঘটান তিনি; 'দর্শনির বিনিময়ে নাটক' দেখানোর সাহস দেখিয়ে, দর্শনির বিনিময়ে নাটকে দেখানোর রীতি চালু করে। ঘটনাটি বাংলাদেশের নাগরিক নাট্যচর্চায় পেশাদারি মনোভাবের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে।[১] বাংলাদেশের নাগরিক নাটক সৌখিনতার অনিয়মিত তরঙ্গদোলা পার হয়ে একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যমের স্থায়ী ও মৌলিক ভূমিকার রীতি প্রতিষ্ঠিত করে নেয়।[২] আলী যাকের নির্দেশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর* নাটকের সূত্র ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বৃটিশ আরোপিত 'প্রমোদকর' রহিত হওয়ার[৩] ঘটনাটি বাংলাদেশের মঞ্চনাট্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সে-সূত্রে শিল্পকলা একাডেমির প্রথম 'নাটক সেন্সর বোর্ড'-এর একমাত্র নাট্যকর্মী সদস্য হিসেবে তাঁর যুক্ত হওয়া; দায়িত্ব পাওয়া 'সেন্সর নীতিমালা' তৈরির। এবং সে দায়িত্ব খুবই সরল-সংক্ষিপ্ত, নাট্যবান্ধব একটি নীতিমালা প্রস্তাবের মাধ্যমে পালন।[৪] 'দর্শনির বিনিময়ে নাটক' করতে হলে নিয়মিত নাটক করার মঞ্চ দরকার – তাঁর উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডে অবস্থিত 'মহিলা সমিতি মঞ্চে' সূচনা হয় নাট্যযাত্রার;[৫] যে সড়কটি এখন 'নাটক সরণি' নামে ঘোষিত, পরিচিত; যা 'আলী যাকের নাটকসরণি' করা হলে খুব বেশি অযৌক্তিক মনে হতো না।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে আলী যাকেরের উপরিউক্ত মৌলিক ভূমিকাগুলোর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত নাট্যভূমিকার আরো কিছু তথ্য জুড়ে নেয়া যাক। অভিনেতা হিসেবে প্রায় দুই হাজারের মতো পরিবেশনায় মঞ্চে ছিলেন তিনি। নির্দেশক, সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ২০টির বেশি মঞ্চসফল নাটকের। বেতারে টেলিভিশনে অভিনয় করেছেন সাড়ে তিন শতাধিক চরিত্রে। মঞ্চের জন্যে নাটলিপি রচনা করেছেন [অনুবাদ-রূপান্তর] মলিয়ের, কাম্যু, ব্রেশ্‌ট্, চেকভ, স্যুখমায়ার, আয়েনেস্কো, অসবোর্ন, শেক্সপিয়র-সহ বিশ্বনাট্যের সেরা নাট্যকারদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাটক; যা প্রায় এককভাবে নিজেকে দাবি করতে পারে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাগরিক নাট্যে দেশজ মৌলিক নাটকের সমান্তরালে বিশ্বনাট্যের মননশীল, বলিষ্ঠ সহযাত্রী হিসেবে।

এ বিপুলায়তন নাট্যভূমিকার প্রতিটি দৃশ্যের গভীরে তাকালে, আলী যাকের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন বলে মনে হয়। যদি তা না মনে হয়, বিষয়টি তোলা থাকুক আপাতত। একে ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর নাট্য ও জীবননাট্য ভূমিকার রাজনীতি-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, আবারও; যেখানে তিনি হাজির হন একজন ভিন্নতর ব্যক্তিসত্তার নমুনা

হিসেবে; যেখানে তিনি নিজস্ব এক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দর্শনে জাগর ও সক্রিয়। সে ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত ভর ও বেগ, হয়তো, তুলে রাখা প্রশ্নটির সমাধান হয়ে ফিরে আসবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ শেষ না হতেই আলী যাকের সময়ের ডাকে রণাঙ্গনে। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'র ইংরেজি বিভাগের প্রযোজক আর ঘোষক-পাঠকই কেবল ছিলেন না, যুদ্ধের প্রতিবেদন পেতে টেপরেকর্ডার কাঁধে ছুটে গেছেন রণাঙ্গনে, সেক্টর থেকে সেক্টরে। জহির রায়হানের অমর রচনা *স্টপ জেনোসাইড*-এ বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম কাল্টপুরুষ আলমগীর কবীরের [১৯৩৮-১৯৮৯] সাথে তাঁরও এক টুকরো কণ্ঠস্বর যোগ হয়ে গণহত্যা বন্ধের ডাক দিয়েছিল বিশ্ববাসীকে।[৬] মুক্তিযুদ্ধের শব্দ ও সংবাদসৈনিক আলী যাকের ছিলেন পেশাদার চিত্রধারক; যা তাঁকে বাঙলার রূপ আর ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি রীতিমতো আসক্ত করে তোলে। বাংলার নিসর্গ আর লোকালয় ছিল তাঁর সময়-অসময়ে অহেতুক ছুটে যাবার গন্তব্যরাজি।[৭] খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে, ৭৫-এর পর স্বৈরাচার-বিরোধী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গণ-আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন আলী যাকের। বাংলাদেশের একমাত্র 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও ট্রাস্ট'-এর অন্যতম ট্রাস্টি তিনি। [...] এসবে মিলে আলী যাকেরের যে পরিচয়সত্তা সামনে আসে, তাতে তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিরল ব্যক্তিত্ব কি-না, তা প্রমাণিত না হলেও; এর প্রতিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করতে ভিন্ন-ভিন্ন আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করা অযৌক্তিক নয়।

তবে, উপরে আঁকা আলী যাকেরের প্রায় সবটুকুই মূল প্রতিপাদ্যের ভূমিকা হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত। আলোচনা মূল খাতে যাবার আগে যাকেরের আরো একটি পরিপূর্ণ গুণসত্তা সামনে আনা দরকার। যাকের তাঁর কর্মময় জীবনসত্তাকে স্পষ্ট করেই দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো তাঁর পেশাগত জীবন [বিজ্ঞাপনী সংস্থা], যা তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন জোগায়। দ্বিতীয়টি তাঁর নেশাগত জীবন [নাট্য-চিত্র সংযোগ], যা তাঁর মন-মননের খোরাক জোগায়।[৮] তবে, আলী যাকের তাঁর এ নেশাগত জীবনকে নাট্যকেন্দ্রিক করে রাখলেও, ক্রমে দেখা যাবে, সে নেশা তাঁকে তন্ময় করে রেখেছিল তাঁর জীবননাট্যের সব কটা দৃশ্যে, সকল ভূমিকায়; যা তাঁর স্বোপার্জিত উপলব্ধির রাজনীতি আর সংস্কৃতিবোধে একাগ্র হতে থাকবে। এটাকে একটা স্বতন্ত্র পরিক্রমা ধরে নিয়ে, অতিসংক্ষেপে, তাঁর সে পেশাগত জীবনটাকেও কয়েক ছত্রে ছেঁকে নেয়া যেতে পারে।

করাচির বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'এশিয়াটিক' থেকে ঢাকার 'ইস্ট এশিয়াটিক', তারপর 'এশিয়াটিক' হয়ে 'এশিয়াটিক থ্রি সিক্সটি' এখন চৌদ্দটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সংস্থা। বর্তমানে তা ছয় শতাধিক সৃজনশীল কর্মীর ব্যক্তিগত স্বপ্ন-সম্ভাবনার শ্রমাগার। বিগত প্রায় অর্ধশতক ধরে যার কেন্দ্রে ছিলেন একজন পেশাদার আলী যাকের বা A-Z, বা ছোটলু ভাই; এবং যিনি আবিষ্কৃত হন তাঁর নিজের ও সহযাত্রীদের দ্বারা: শৃঙ্খলা [ম.সা ২৫][৯], মনোবল[১০], নিষ্ঠা, সেবা, সংবেদনশীলতা, সততা, পরিশ্রম, জেদ, প্রীতি ও বন্ধন [...][১১] নামের আরো অসংখ্য সূচকে। এসব শব্দচিহ্ন তথা স্বীকৃতিমালা নিয়ে আলী যাকেরকে বস্তুনিষ্ঠ বিচারে সত্যায়িত করা গেলে, আলী যাকের কেবল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন বিরল ব্যক্তিত্বই হয়ে ওঠেন না, হয়ে উঠতে থাকেন একটি অঙ্গনের বা পরিসরের কাল্টপুরুষ। তেমন এক সহায়ক ছক পাওয়া যাবে তাঁকে নিয়ে তাঁর নাট্যসতীর্থদের কাছ থেকে। সেখানে তিনি: মঞ্চনাটকের বরপুত্র;[১২] বাংলার গ্যালিলিও;[১৩] পিতৃতুল্য বন্ধু;[১৪] – এমন নানা চিহ্নে-প্রতীকে সম্বোধিত।

এত কিছুর ঊর্ধ্বে আলী যাকের একজন সুলেখকও ছিলেন। তাঁর অনুবাদ মৌলিকতাগুণে রূপান্তরকেও ছাড়িয়ে গেছে, দেশজ গল্প বুননের তাগিদে। তিনি লিখেছেন দৈনিকের অসংখ্য কলাম। তাঁকে দেখা গেছে, বেশ কটি টেলিভিশন চ্যানেলে আড্ডাধর্মী অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবেও। এসব মৌলিক স্বতন্ত্র জীবনাখ্যানেও তিনি দেখে নিতে চেয়েছেন নিজস্ব রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উপলব্ধির আতসে জাতিসত্তার সনাতন-বহমান রূপ ও রূপান্তর।

দুই

পৈত্রিক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া হলেও, সরকারি চাকুরে পিতার কর্মসূত্রে যাকেরের জন্ম বন্দরনগর চট্টগ্রামে; যেখানে পাহাড়-সাগর মিলিত হয়ে অনির্বচনীয় নিসর্গশোভা রূপ দিয়েছে। যাকের জন্মেছেন সম্ভ্রান্ত আচারিয়া মুসলিম পরিবারে। পারিবারিক চৌহদ্দির মনোগঠনকাল তাঁর জীবনস্বভাবে বড়ো রকম ছাপ ফেলবার কথা। যাকের জানাচ্ছেন, পরিবার থেকে পেয়েছিলেন তিনি প্রশ্ন করার অবাধ স্বাধীনতাভিত্তিক এক উদার-মানবিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ।[১৫] তখনকার বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের চিরায়ত রূপ ছিল বুঝি সেটি। যেখানে নামাজ-রোজার সাথে সংগীত, নাটক, পালা-পুজোর উৎসব মিলেমিশে থাকতো।[১৬] তাঁর শৈশব-কৈশোর তথা আত্মগঠনকাল এমনই নানা ঐশ্বর্যময় অভিজ্ঞতায় আলোকিত। সেখানে আছে এক শহর থেকে অন্য শহর ছোটার স্মৃতি, আবেগ, রোমাঞ্চ; নতুন-নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর লোক-গণমুখী অভিজ্ঞতা; মায়ের হাত ধরে [কলকাতায়] নানাবাড়িতে বেড়াতে যাওয়া; কৈশোর না পেরুতেই কলকাতার মঞ্চে মৌলিক নাটকের পাশাপাশি ব্রেশ্‌ট, চেকভ, ইবসেন, পিরানদেল্লো প্রমুখ বিশ্বখ্যাত নাট্যকারদের নাটক দেখা – কিংবদন্তির মতো মঞ্চাভিনেতাদের অভিনয়ে।[১৭] এবং বিশেষত কুষ্টিয়ার কৈশোর কাল: প্রখ্যাত মোহিনী মিল্‌স-এর পুজোর উৎসবে কলকাতার প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত শিল্পীদের গানের আসর। আর তাঁর দিদি, যাঁর কারণে শৈশব থেকে প্রখ্যাত সব শিল্পীদের গানের রেকর্ড শোনার সুযোগ।[১৮] দেখা যাবে, এমন শত অনুষঙ্গ তারুণ্য-যৌবনের আলী যাকেরে একটি রুচিশীল, প্রগতিমুখী, পরিণত জীবনবোধের বিকাশ রেখেছে।

৫০-এর দশকে বাঙালির সাংস্কৃতিক জাগরণের পথ ধরে, ষাটের শুরুতে শিক্ষা আন্দোলনের পথ ধরে, বাঙালির যে জাগরণ, তা ছিল মূলত সাংস্কৃতিক জাগরণ। একই সাথে পাকিস্তানি শাসকদের রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রতিবাদে যে জাগরণের জোয়ার ওঠে পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির, সেটাও ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক জাগরণ। ৬৬-তে বাঙালি প্রথমবারের মতো নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির ডাক নিয়ে স্বাধিকারবোধে জাগে। তার আগে পূর্ববাংলার বাঙালিরা তিন-তিনটা সাংস্কৃতিক গণ-আন্দোলন সফলভাবে সম্পন্ন করে। ঐ জাগরণকালেই যাকের ছায়ানটের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির কিছু ধারক-বাহকের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মতে, সে সংযোগ ছিল তাঁর 'জীবনবোধের দীক্ষা'র[১৯] মতন। তাতে ছিল ভাষাচিন্তা, দেশচিন্তা, জাতিচিন্তা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিচিন্তা। যাকেরের বয়ানে, এগুলো তখন তাঁদের জীবনে একেবারে সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাসী ছিল।[২০] তাঁদের তখন একটাই চিন্তা, কীভাবে দেশের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা যায়। আর দেশের কাজ হলো, যার যা ভূমিকা সেটি পালন করতে পারা, পালন করে যাওয়া।[২১] আর সংস্কৃতিকর্মীর দিক থেকে, বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির জীবন বা অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারা।[২২]

এমন সব দীক্ষায় আলী যাকের আর দশটা বাঙালি-বাংলাদেশির মতোই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদর্শের অনুসারী। সহজ কথায়, তাঁর জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ; সে জাতীয়তাবাদে সবুজ-শ্যামল বাংলার নিসর্গশোভা তো আছেই; আছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ – অনুপ্রেরণার উৎসমূল হয়ে। বাংলাদেশকে ভালোবাসা এবং জীবনানন্দ দাশকে ভালোবাসা এক সময় তাঁর কাছে সমার্থক মনে হতো। রবীন্দ্রনাথের অহিংস-বাঙালিত্ব, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক মানবাদর্শ, আর জীবনানন্দের বাংলাপ্রেম; যা মরমিয়া হয়ে ধরা পড়েছে রবীন্দ্ররচিত স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে – তাঁর জীবনাদর্শের মৌলিক প্রেরণাভূমি। তবে যখনই বলা হচ্ছে স্বাধীন ভাষা, স্বাধীন পতাকা, স্বাধীন ভূখণ্ড, স্বাধীনতার শ্লোগান; সে স্বাদেশিকতায় যুক্ত হয়ে পড়ে একটা আদর্শ; যাকেরের কাছে, মাতৃভাষা ও বাঙালিত্ব, বাঙলার জয় সে আদর্শের মৌলিক বন্ধন। ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক সাম্য সে জাতির কেন্দ্রীভূত ভর – অথবা জাতীয় চেতনার মূল।

যাকেরের রাজনীতি ও রাজনীতিচিন্তার প্রসঙ্গে যাবার আগে, আবারও একটুখানি ফেরা যাক তাঁর জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিবোধের অন্যতম অনুষঙ্গ বাঙলার নিসর্গ-প্রকৃতিতে। নিসর্গের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল কৈশোরেই, যা তাঁকে ‘বহির্মুখী করেছিল’, যা তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার অবারিত লোকালয়ে। তাঁর যৌবনে ও পড়ন্তে এ টান আরো প্রবল হয়ে ওঠে।[২৪] বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতির চিত্রশোভা তাঁকে করে তুলেছিল বাংলার ‘চিত্রগ্রাহক’, যা তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার পরিশীলিত, পরিণত এক বৃত্ত। নিসর্গ তাঁর জীবনে আসে অনুধাবনে, অনুধারণে, প্রীতি ও প্রেমের উৎস হয়ে; জীবনানন্দে যেমন। তিনি মানেন, নিসর্গের সঙ্গে প্রাত্যহিক একটা সংযোগ স্থাপন করতে পারলে মানুষের জীবন প্রকৃত অর্থেই সার্থকতা পেতো।[২৫] নিজের জীবনের প্রতিটি দিন নিসর্গে গেঁথে রাখার আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়েছে তাঁর জীবনকথায়। সে নিসর্গ জন-জনপদহীন মিস্টিক নিসর্গ-প্রকৃতি নয়। [...] দেখা যাচ্ছে, একেক সময় কেবল দেশের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখার জন্যেই বেরিয়ে পড়ছেন তিনি। কাজে বা অকাজে যখনই বাংলাদেশের প্রত্যন্তে যাচ্ছেন, নতুন এক জীবন যেন লাভ করছেন।[২৬] এসব সূত্র স্পষ্ট করে, তাঁর ভাবাবেগহীন জাতীয় সাংস্কৃতিক বোধের আয়তন। নাট্যের পাশাপাশি লোকালয় ভ্রমণকেও যাকেরের নেশাগত জীবনেরই অংশ ধরে নেয়া যায়। সে ভাগে আছে, নানা ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ইতিকথা, যা বাঙালির সংস্কৃতি সন্ধানে বহুপথ বহুমতের সম্মিলনে ঐশ্বর্যময় আগামীর গন্তব্য দেখায়। এটা তাঁর সম্মিলনী সংস্কৃতিবোধের স্বতন্ত্র আখ্যান। সেখানে কত স্থাপনা, কত পুরাকীর্তি; কত ব্যক্তি, কত নাম; সাল-সন-হিজরির টীকা। বোঝা যায়, বাঙালি সংস্কৃতির বিরল পুরুষ হয়ে ওঠার পথে, বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতি আর লোক-ঐতিহ্যের চিহ্নভাষা তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল।

প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্রত্যয় যাকেরের রাজনীতি প্রসঙ্গে আসা যাক এবার। রাজনীতি বিষয়ে যাকের এতটাই তন্ময় ছিলেন যে, একেক সময় নিজের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে তাঁর ‘করোটিতে অনবরত উদ্বেগের সৃষ্টি হতো’। তিনি বুঝতে পারতেন না, একটা ‘চিন্তাশীল মানুষ নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন ছাড়া কীভাবে পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে?’ এটা তাঁর খেয়ালি-বিলাসী প্রশ্ন না। তিনি জানাচ্ছেন, কৈশোর থেকে দেখে এসেছেন যে, তাঁর দেশটি একটি ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে চলেছে; তার ভাষা, তার সংস্কৃতি, তার জীবনবোধকে অনবরত আঘাত করছে, বিনষ্ট করছে ভিনদেশি শত্রুরা – এ সহজ অসহায়ত্ববোধ থেকেই জন্ম নেয় তাঁর মনে সত্যিকারের রাজনীতি বোধ। তিনি মনে করেন, ‘রাজনীতির শিক্ষা’ কেবল রাজার বা রাজনীতিকের ব্যাপার নয়; এটা গণসাধারণের।[২৭]

রাজনীতি আর সংস্কৃতির এমন যুগলবন্ধ ঘোষণা করেই যাকের স্পষ্ট করে জানান, 'সংস্কৃতি-কর্মীদের দলান্ধ রাজনীতির অনুসারী হওয়া তাঁর কাছে খুবই অনভিপ্রেত' ব্যাপার।[২৮] তাঁর চিন্তায়, সংস্কৃতিকর্মীরাই পারে ভুল পথে হাঁটা রাজনীতিকে নির্ভুল দিক-নির্দেশনা দিতে, ঠিক পথ দেখাতে। তাঁর কাছে সোজাসাপ্টাভাবে তাই, সংস্কৃতিচর্চা রাজনীতিচর্চার পূর্বগামী ব্যাপার। যা সাংস্কৃতিক অধিকাঠামোকে অর্থনৈতিক মৌলকাঠামো বদলের পূর্বশত হিসেবে দেখে। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চারণ করেন, 'আমার একটা রাজনীতি অবশ্যই আছে, যা একেবারে আমার নিজস্ব। এর সঙ্গে কোনো-কোনো দলীয় মতবাদের মিল ছিল হয়তো। [...] আমি একজন স্বাধীনচেতা বাঙালি হিসেবে একাত্তরে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। [...] আমাদের জন্মই হয়েছিল রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে এবং জীবন প্রবাহিত হয় ওই ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই।'[২৯] তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো কাজকেই তিনি রাজনৈতিক কাজ মনে করেন। তখন 'রাজনীতি আর শিল্প এক হয়ে যায়' তাঁর কাছে। বলেন, 'শিল্প মানুষের কথা বলে। আর মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে রাজনীতির প্রধান উপজীব্য। [...] গণতন্ত্রের সঠিক প্রবাহ সঠিক উপায়ে প্রতিষ্ঠার দাবি ধরে রাখতে গেলে [...] শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সচেতনতা বোধের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ।'[৩০] দেখা যাবে, এ সর্বব্যাপী রাজনীতিবোধ এমনকি যাকেরের পেশাগত জীবনকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

নিরেট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান 'এশিয়াটিক'-এর হয়ে স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষকে একাত্ম রাখতে, উদ্বুদ্ধ রাখতে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে তাদের তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, একটি সদ্যস্বাধীন দেশের মানুষকে দেশপ্রেমে অটুট রাখার জন্যে জাতীয় দিবসগুলোতে দেশাত্মবোধক বিজ্ঞাপন পত্র-পত্রিকায় দেয়া দরকার; যেন তারা হতোদ্যম হয়ে না পড়ে; দম না হারিয়ে আশায় বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াতে পারে। যাকেরের বয়ানে: ১৯৭২ এর ২১শে ফেব্রুয়ারি এক অসাধারণ বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ইস্ট এশিয়াটিকের পুনর্জন্ম হয়: কোনো একটি রেল স্টেশনে দেখা যাচ্ছিল কলাপাতার উপরে একটি বাচ্চার হাতে খাগের কলমে লেখা 'অ' অক্ষরটি। ক্যাপশন ছিল, 'আহা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা!' শুধু তাই নয়, নিজস্ব জাতীয়তাবোধজাত, নিজস্ব দেশাত্মবোধ জাত, নিজস্ব রাজনীতিবোধজাত বিজ্ঞাপনের ভাষা নিয়ে দীর্ঘচিন্তার বয়ান আছে তাঁর।[৩১] সেখানে আরো এক ছত্র স্পষ্ট হয়, রাজনীতিবোধ ও রাজনীতি সচেতনতাকে কেন তিনি ব্যাপক গণমানুষে ব্যাপ্ত দেখার দাবি জানান। প্রতিটি পেশায়, প্রতিটি সিদ্ধান্তে, প্রতিটি আচারে-প্রয়োগে রাজনীতি সচেতনতা জরুরি বৈকি। তবে, যাকেরের নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের অনুসরণে এ রাজনীতি দলান্ধ-মতান্ধ রাজনীতি থেকে অনেক বেশি শুদ্ধ বা পরিশীলিত।

পরিণতির দিকে যাবার আগে যাকেরের জীবনের সবচেয়ে জরুরি আখ্যানবৃত্ত, তাঁর নেশাজীবনের কেন্দ্রভূমি তথা নাটক বা থিয়েটারে প্রতিফলিত রাজনীতি সচেতনতার রূপ পাঠ করা জরুরি। বরং এখানেই তাঁর রাজনীতি ও সংস্কৃতিবোধের একটি সমন্বিত বা পূর্ণবৃত্ত ফুটে ওঠার কথা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নাটকে পেশাদারি মনোভাব সঞ্চারের প্রসঙ্গটি আবারো টেনে আনা যাক। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে নেতার ভূমিকায় নাটকে-অভিষিক্ত যাকের তাঁর দ্বিতীয় নাটকেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'নিয়মিত মঞ্চায়ন করতে হলে একটানা হল বুকিং দিতে হবে। তাই বৃটিশ কাউন্সিল মঞ্চ পরপর আট রবিবার সকালের জন্যে বুক'[৩২] করে ফেললেন। দর্শনির বিনিময়ে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন: বাকি ইতিহাস, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ – বাংলাদেশের নাগরিক চৌহদ্দিতে একটি জীবন্ত, গণমুখী, সর্বাত্মক শিল্প মাধ্যমের নিরবচ্ছিন্ন চর্চার সূচনা; যার প্রথম দাবি, নাটককে সৌখিনতা

থেকে বের করে আনা।[৩৩] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'বহিপীর'-এর সূত্র ধরে, বৃটিশ প্রবর্তিত প্রমোদ কর বঙ্গবন্ধুর সরাসরি হস্তক্ষেপে রহিত করার উদ্যোগ নেন যাকের। সে সূত্রে শিল্পকলা একাডেমির 'নাটক সেন্সর বোর্ড'-এর একমাত্র নাট্যকর্মী সদস্য' হন। খুবই সংক্ষিপ্ত, নাট্যবান্ধব একটি 'নীতিমালা' প্রণয়ন করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের ভূমিকাকে মুক্ত ও জোরালো করে দেন অনেকটা। আলী যাকেরের এসব নাট্যঘনিষ্ঠ গুরুদায় তাঁর পরিশীলিত রাজনীতি ও সংস্কৃতিবোধের সংশ্লেষ।

যাকের শিল্পকলার রাজনীতিকে তবে ভিন্ন তট থেকে দেখেন। শিল্পকলার রাজনীতিকে প্রথাগত চটুল রাজনীতিতে ফেনায়িত করার ঘোর বিরোধী তিনি। শিল্পকলার রাজনীতিকে তিনি মোটাদাগের স্থূল রাজনৈতিক উপাদানে আচ্ছন্ন হতে দিতে নারাজ। তাঁর নাটক ও রাজনীতি নিয়ে কথামালায় এমন ভাষ্যের দেখা মেলে বারবার। নাটক যদি মোটা দাগের স্থূল রাজনীতিতে আক্রান্ত হতে থাকে, তাহলে, 'নাটকে রাজনীতি আসবে, বিদ্রোহ আসবে; [...] নাটকের শরীরে অপ্রয়োজনীয় রঙের প্রলেপ আসবে; যা চিন্তাশীল, মননশীল দর্শককে, গণমানুষকে ক্রমশ এ শক্তিশালী শিল্প মাধ্যমটা থেকে দূরে সরিয়ে নেবে।[৩৪] শিল্পকলার রাজনীতি তাই সস্তা-চটুল ব্যাপার নয় যাকেরের কাছে। যাকেরের মতে, বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাঁরা কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতিবর্জিত নাটক করার সুযোগ পাননি। আর সে রাজনীতি গভীর জীবনবোধ থেকে উৎসারিত ছিল বলেও মনে করেন না তিনি। তাঁর মতে, আদতে তা ছিল 'রাজনীতির চটুলতা'। খোলাখুলিভাবে বলেন, 'আমাদের বেশিরভাগ জনপ্রিয় নাটক প্রায় সর্বদাই রাজনীতি নিয়ে হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।'[৩৫] অথচ শিল্পকলার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব হবার কথা ভিন্ন। তিনি জানান, প্রচলিত বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস বুকে ধরতে না পারলে শিল্পী বা সংস্কৃতিকর্মীর রাজনীতিবোধ মুখ থুবড়ে পড়ে। সংস্কৃতিকর্মীকে তাই এমনকি নিজের গড়া বিশ্বাসের ফাঁদে আটকে পড়ার ব্যাপারেও জাগর থাকতে হয়। সে ঝুঁকি এড়াতে, নিয়ত জানতে হয় তাকে, অবিরাম পাঠ ও প্রশ্নরাশির ভিতর দিয়ে।[৩৬] যাকেরের রাজনীতি আর সংস্কৃতিবোধের সবচেয়ে পরিণত প্রান্তটি স্পষ্ট হয় এতে।

কথা ছিল, যাকেরের নাট্যসংযোগে তাঁর রাজনীতি ও সংস্কৃতিবোধের রূপসন্ধান করার। নাটলিপিকার ও নাট্যনির্দেশক হিসেবে যাকের সক্রিয় ও নিয়মিত থাকলেও অভিনয় ছিল তাঁর নাট্যযাত্রার প্রাণ। আর তিনি [যেন] জানেনও বাংলা অভিনয়তত্ত্বের সারপাঠ। প্রসঙ্গত, সংস্কৃতজাত বাংলা 'অভিনয়' শব্দটির সংজ্ঞা বা ক্রিয়া-নাম-পরিচয় খোলাসা করা যেতে পারে: সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক নামশব্দ 'অভিনয়' তৈরি হয়েছে উপসর্গ 'অভি' আর ক্রিয়াবাচক 'নয়' যুক্ত হয়ে। 'অভি'র মানে কোনো দিকে বা অভিমুখে; আর 'নয়' ক্রিয়ার মূল 'নী'-এর মানে হলো: পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই 'নী' ক্রিয়ামূলের সাথে নানা প্রত্যয় যোগ হয়ে বাংলাভাষায় তৈরি হওয়া শব্দ অনেক। নীত, নেত্র, নয়ন, নায়ক, নেত্রী, নেতা – এরা সবাই এসেছে 'নী' ক্রিয়ামূল থেকে; আর এদের সবারই কাজ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ সূত্রে 'অভিনয়' হলো, কোনো এক অভিমুখে পথ দেখিয়ে নিয়ে হাজির করানো। বাংলা 'অভিনয়'কে অভিনয়তত্ত্ব হিসেবে নিলে, অভিনয়কর্মীরাও সমাজের নয়ন বা চোখের মতো, অবিনীত নায়কের মতো, সুমার্জিত নেতা বা নেত্রীর মতো। অভিনয়য়ের এ রাজনীতি ও সংস্কৃতিবোধে যাকেরের প্রাজ্ঞতা তাঁর রাজনীতিবোধের পরিণত মাত্রা। অভিনয়ের মাধ্যমে আলী যাকেরের আরাধ্য রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গন্তব্যের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় এতে।

যাকেরের কাছে তাই মনে হবে, সংস্কৃতিকর্মীর কাজ কেবল সমাজ ও গণসমাজকে পথ দেখানো নয়, এমনকি শাসকদেরও পথ দেখানো[৩৭] – অবিনীত সক্রেটিসের মতো, কৌশলী গ্যালিলিওর মতো। কোনো সংস্কৃতিকর্মী বা সাংস্কৃতিক সংগঠন যদি ঘোষণা করে 'আমরা অরাজনৈতিক', সেটা সংস্কৃতির নিজস্ব রাজনীতির বিবেচনায় যাকেরের কাছে একেবারেই যুক্তিহীন। সংস্কৃতিকর্মীর বুদ্ধিবৃত্তিক দায় বা প্রতিনিধিত্ব, যাকে পণ্ডিতি ভাষায় 'রেপ্রিজেন্টেশন অব ইন্টেলেকচুয়াল' বলে, সেই দায় থেকে তিনি বলেন, 'নাটক কেবল রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবেই নয়, জীবন ও জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি হিসেবেও চর্চিত।' আর সেটা মানা যায়নি বলে, 'বাংলায় রচিত বাংলাদেশি নাটকের তিন-চারটিকে বাদ দিলে বাকি সবই কেবল আমাদের ত্বক স্পর্শ করে' গেছে, 'আত্মাকে স্পর্শ করেনি'।[৩৮] অথচ, আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের যাত্রা তো, যাকেরের মতে, শহিদ মুনীর চৌধুরীর অমর রাজনৈতিক নাটক *কবর*-এর মাধ্যমে – যার জন্ম হয়েছিল শাসকের কারাগারে। *কবর*-এর মতো যে মননশীল, পরিশীলিত, দূরদর্শী রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের নাটকের রাজনীতি চেতনা – সে দূরদর্শী, দ্রোহী, দুঃসাহসী বিপ্লবী যাত্রার ফল হিসেবে, নিশ্চিতভাবে, **১৯৭১**-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটক অমন গভীর, চিরায়ত রাজনৈতিক ভাষ্য জন্ম দিতে পারেনি।[৩৯] এমনকি এসময়ে লেখা বেশির ভাগ মৌলিক নাটকের প্রকৃত মৌলিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে এ-ও মনে করেন, সৃজনশীলতার জগতে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত মৌলিক কাজ অত্যন্ত দুরূহ। তাঁর মতে, সে অর্থে 'রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাভাষায় খুব অল্পই মৌলিক নাটক হয়েছে।' মৌলিক বলতে, 'যা নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টি, নতুন দর্শনের জন্ম দিয়েছে।' তাঁর মতে, 'আমাদের নাটকে তেমন কিছু ঘটেনি।'[৪০] বরং নাটকে 'ক্রমবর্ধমান হালকা রসের প্রাধান্য মেধাশূন্য নাট্যকর্মী তৈরি করে দেশের নাট্য-অঙ্গনটিকে বিরক্তিকরভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে' বলে তাঁর মত। তাঁর বয়ানে, 'গভীর আনন্দদায়ক এবং রুচিশীল কর্মকাণ্ডের জায়গা স্থান করে নিয়েছে বর্ণময় আর রিপু আন্দোলনকারী সস্তা বিনোদন।' যা দেশের তরুণ প্রজন্মের রুচিটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।[৪১]

তারই বিষফল হিসেবে বাংলাদেশের আধুনিক সমাজ-অঙ্গনে [ধরা যাক বিশ শতকের প্রথম দু-দশক] দুঃখের সঙ্গে মূল্যবোধের অভাব প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি।[৪২] পঞ্চাশের দশক থেকে **৭১** পর্যন্ত বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচিন্তায় আর জীবনদর্শনে যা প্রতিষ্ঠিত রূপ পেয়েছিল, সময়ের আবর্তনে বাংলাদেশের সময়-সমাজ সেখান থেকে ক্রমশ অধঃপতিতই হয়েছে কেবল। তাঁর স্বীকারোক্তিতে, 'আমরা একটি অশিক্ষিত, অসহনশীল, অনুদার, সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী সমাজে'র জন্ম দিয়েছি।[৪৩] পাকিস্তান ভেঙেছিল একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের তকমা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। আবার ঘুরে-ফিরে সে তকমায় প্রবেশ।

যাকেরের তাই সোজা-সরল প্রশ্ন, তাহলে **৭১**-এ 'এতগুলো মানুষের আত্মাহুতি দেয়ার কী প্রয়োজন ছিল?' তার উত্তর এড়িয়ে তার ফলটা যাচাই হোক যাকেরের বয়ানে, 'নিজেদের নির্লিপ্ততা আর প্রতিপক্ষীয় চক্রান্তের এখানে যারা আসল শিকার, তারা এদেশের 'তরুণ সমাজ'।[৪৪] এটা সম্মিলিতভাবে 'পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়া'র ব্যাপার। তিনি মনে করেন, যে আদর্শে দেশ ও সমাজের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে; সে আদর্শ থেকে 'ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক পরবর্তী প্রজন্মকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম আমরা'। এবং আরো খোলাখুলিভাবে, 'হয় তো যুদ্ধ করেছি এক উত্তেজনার বশে, কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা থেকে সত্যিকারের প্রগতির পথে চলার কথা কখনোই ভেবে দেখিনি।' সে কারণে 'আচার-আচরণে

ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতা কেবল আমাদের ধর্মের মধ্যেই নিহিত তা নয়', এখন তা 'জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই' স্পষ্ট দৃশ্যমান।[৪৫] তিনি বলেন, এমনকি 'আমাদের অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল তরুণ রাজনীতিবিদরাও আজ জনসাধারণকে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প' থেকে বের করে আনতে পারছেন না। সেই পঞ্চাশের দশক থেকে ভাষা আন্দোলন আর নানাবিধ সাংস্কৃতিক জাগরণ, ৬ দফা, গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে, সে আদর্শ থেকে বর্তমান বাংলাদেশ অনেক দূরে সরে এসেছে।[৪৬]

এটা সবার কাছে পরিষ্কার থাকলেও, একে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়নি বা হচ্ছে না কোনো দিক থেকে। তাই হয়তো, এখন, ৭২-এর সংবিধানে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র নামের সংবিধিগুলোকে মূল্যবান অর্জন বলে মনে করানো যাচ্ছে না ব্যাপক গণমানুষের কাছে। যাকেরের স্বীকারোক্তি: তাঁর নিজের প্রজন্মের মানুষদের কৃতকর্মের জন্যে প্রজন্মের সামনে উদাহরণ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের এটা বড়ো আকারের এক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পতন।[৪৭] এ ভাষ্য যৌক্তিক ধরে নিলে; এটা এক সাথে বহু দিক থেকে সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ আর চেতনারই পরাজয়। সে পরাজয় এ দেশে কার-কার হাতে, কী-কারণে, কীভাবে রচিত হয়ে গেছে বা হয়ে চলেছে, সেটা সবার অলক্ষেই পড়ে থাকছে। আর তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরাজয়ের গ্লানির চেয়েও গুরুতর। মুক্তিযুদ্ধের সাধনা থেকে অনেক দূরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্র তাই আলী যাকেরের 'ভালো লাগছিল না', এ বাংলাদেশকে তিনি 'চিনেন না'। এ যেন তাঁর কাছে 'এক ভিন দেশে বাস'।[৪৮] যাকের স্মরণ করেন, 'স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশটাকে একেবারে নিজেদের প্রচেষ্টায় সারিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তখনকার মানুষেরা। 'ওই প্রাণোচ্ছলতাকে যদি ধরে রাখা যেত, ওই বন্যাকে যদি বইয়ে দেয়া যেত দেশের নিষ্ফলা জমির উপর, তাহলে আজ আমরা সোনার ফসল ঘরে তুলতে পারতাম।'[৪৯] স্বাধীনতার সে উদ্দীপনা সে অন্তর্গত উচ্ছ্বাস এই বাংলাদেশে অবশিষ্ট দেখেন না তিনি। নিশ্চিত সিদ্ধান্তে সেটা নিজের প্রজন্মেরই ব্যর্থতা বলে মনে করেন তিনি। এমন স্বীকারোক্তিতে তাঁর দ্বিধা-সংশয় নেই।

আলোচনার সারভাষ্যে যাওয়া যাক যাকেরের তোলা কিছু প্রশ্ন নিয়ে। চিন্তাভাবনায় অপরিণত থাকা একটা স্বাধীন জাতির জীবনে ৫০ বছর খুব কম সময় কি? আমাদের কি তবে সচেষ্ট হওয়া উচিত নয় একটি বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার?[৫০] বিরাজমান পরিবেশে, আলী যাকের সংস্কৃতিকর্মীদেরই যেন স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন, তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক উপলব্ধির মর্মসার – সংস্কৃতিকর্মীরা দলান্ধ-মতান্ধ রাজনীতির অনুসারী হলে বিজ্ঞানমনস্ক, উদার, অসাম্প্রদায়িক একটি সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সকল ত্যাগ আর উৎসর্গ অধঃপতনে যাবে। প্রচলিত বিশ্বাস ও ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস বুকে নিয়ে, দলান্ধ-মতান্ধ রাজনীতির ভুলচুক শুধরে দিয়ে, সংস্কৃতিকর্মীরা যেন পারে, প্রথাগত রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ দিক-নির্দেশনা দিতে, ঠিক পথ দেখাতে – নায়ক, নেতা, নয়নের মতো।

তাহলে, একজন 'আলী যাকের'কে কেন স্মরণ করবো? আলী যাকেরের ব্যক্তিসত্তায় এমন কী-কী গুণ ছিল, যার সমন্বিত রূপ বিশুদ্ধ আর্ট বা শিল্পের মতো অনুকরণ করা হলে, জাতি হিসেবে, অথবা মানুষ হিসেবে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ চলার পথ সুগম ও সমৃদ্ধ হতে পারে? [...] আলী যাকেরের জন্মবিকাশ বেড়ে ওঠা, তার পেশাগত আর নেশাগত জীবনসাধনার বহুতল বহুপ্রান্ত থেকে তুলে এনে, বিচারে, এমন সিদ্ধান্তে আসা যৌক্তিক মনে হয়: আলী যাকের বাঙালির সাংস্কৃতিক দর্শনকে

নিজস্ব ভূমির বাঙ্‌ময় রঙে-রূপে আবিষ্কার করেন, তাকে ধারণ করেন জীবনের প্রতিটা কর্মযোগে, রীতিমতো কৃত্যের সাধনায়। জীবন ও কর্মের বহুতল-বহুপ্রান্ত থেকে সঞ্চয় করা আলী যাকেরের শুদ্ধ সংস্কৃতিবোধ, পরিণামে যা এক পরিশীলিত রাজনৈতিক আদর্শের উপসংহার; যে রাজনীতি গড়ে দিতে পারে কেবল সংস্কৃতিকর্মীরাই। কেননা, সংস্কৃতিকর্মীরাই পথ দেখায় এমনকি পথভ্রষ্ট রাজনীতিকেও; দলান্ধ-মতান্ধ না হয়ে সততা, সাহস আর নিরপেক্ষতা নিয়ে। যে রাজনীতি বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদার, মানবিক, সুষম সামাজ ব্যবস্থার সচেতন দাবির ভিতর। সে দাবিতে আধুনিক, প্রগতিপন্থী, মননশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যটাই বরং এগিয়ে। এখানে দাঁড়িয়েই, আলী যাকেরঃ এক স্বতন্ত্র রাজনীতি-সংস্কৃতির কাল্টপুরুষ – যে 'কালপুরুষ'-এর আলোকচ্ছটায় সমাজ-রাষ্ট্রের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকদিশা ধরা আছে; যা অনুকৃত হতে পারে কৃত্যশাসিত জীবনচর্চায় – সমাজ-রাষ্ট্রের বৃহত্তর প্রয়োজনে।

তথ্যনির্দেশ

১. আতাউর রহমান, [ঢাকা: থিয়েটার, ২০২১], পৃ. ১২০

২. আলী যাকের, *মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ!*, [ঢাকা: জার্নিম্যান বুক্‌স, ২০২০], পৃ. ২৫-২৭

৩. আলী যাকের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬. আলী যাকের, *সেই অরুণোদয় থেকে*, [ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১২], পৃ. ২২১

৭. আলী যাকের, *মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ!*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১০. সারা যাকের তাঁর সহযাত্রীর সবচেয়ে বড়ো গুণটি আবিষ্কার করেন 'মনোবল': *থিয়েটার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

১১. এশিয়াটিক ইএক্সপি প্রকাশিত *আমাদের বাতিঘর* গ্রন্থে তাঁর ঘনিষ্ঠ নাট্যসতীর্থগণ ও বিশেষত পেশাগত কর্মসঙ্গীগণ যাকেরের ব্যক্তিত্বকে নানা গুণবাচক বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। সেসব গুণরাশির নির্বাচিত কিছু গুণ – যেসব গুণ যাকেরের ব্যক্তিস্বভাবকে একাগ্র করে।

১২. আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১৩. আবদুস সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

১৪. আসাদুজ্জামান নূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১৫. আলী যাকের, *মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮২
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৪১. আলী যাকের, *নির্মল জ্যোতির জয়*, [ঢাকা: জার্নিম্যান বুকস, ২০১৯], পৃ. ৬৯
৪২. আলী যাকের, *মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ!*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-২০
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

আবুজাফর শামসুদ্দীনের *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* উপন্যাসে জাতীয় চেতনার স্বরূপ

ড. মো. মাসুদ পারভেজ*

Abstract

The novelist AbuJafar Shamsuddin wrote a novel titled *Bhaoal Gorher Upakhyan* (1963) on the resistance of the Muslims against the Hindu zamindars and the British in the Bhaoal region of East Bengal. *Bhaoal Gorher Upakhyan* is indeed about the Muslim rulers' loss of power in the Indian subcontinent and the Muslim maulavis' movement along with Titumir against the Hindu zamindars and the British in order to regain their power. This article investigates the movement conducted by the Muslim maulavis and their struggle to establish their identity. In this case, the Muslim maulavis developed an anti-British consciousness to establish their own identity, which later became the Muslim nationalist consciousness. This article explores this issue in *Bhaoal Gorher Upakhyan*. As the research methodology, the content analysis method is followed for the research.

চাবিশব্দ : জাতীয় চেতনা, আত্মপরিচয়, উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা, বিভক্ত জাতীয় চেতনা, মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

ইউরোপে ব্যক্তি-বিকাশের ফলস্বরূপ চার্চকেন্দ্রিক প্রথাগত ধর্মীয় অনুশাসন ও 'খবরদারি' প্রবল সংকটের মুখোমুখি হয়। এতে ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাইরে ব্যক্তির আন্তর-সত্তায় নিজস্ব স্বাধীন চেতনাবোধ জন্ম নেয়। এ চেতনা দ্বারা ব্যক্তি 'আত্ম' ও 'অপর' পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখে। ব্যক্তির এই 'আত্ম'-'অপর' নির্ণয়ের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু শর্ত—স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি, ভাষার আধিপত্যবাদ থেকে সাংস্কৃতিক মুক্তি ইত্যাদি যুক্ত হয়। এ সকল শর্তের আলোকে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা, অঞ্চল বা ভূখণ্ডে সম্মিলিত জনসমষ্টির মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনা ক্রিয়া করে। এমন গোষ্ঠীবদ্ধ জনসমষ্টির মধ্যে উপর্যুক্ত শর্তসাপেক্ষে যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় এবং তা বৃহৎ পরিসরে সকলের মনে বিরাজমান থাকে তবে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভ্যুদয় ঘটে। জাতীয় চেতনার ক্রিয়াশীলতার এমন উদাহরণ আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে দেখা গেছে। এই বিষয়গুলো সাহিত্যক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও অবস্থার সাপেক্ষে জাতীয় চেতনার উপস্থিতি-নির্দেশক হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক আবুজাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮৮) *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৩) উপন্যাসে জাতীয় চেতনার রূপ বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* উপন্যাসে জাতীয় চেতনার উপস্থিতি যে-সকল অবস্থার সাপেক্ষে উঠে এসেছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার স্বরূপ তুলে ধরা হবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আবুজাফর শামসুদ্দীন একজন গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে পূর্ববঙ্গীয় জীবনকেন্দ্রিক পটভূমি বিশালত্ব অর্জন করেছে। বিশেষ করে *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৩), *পদ্মা মেঘনা যমুনা* (১৯৭৪) ও *সংকর সংকীর্তন* (১৯৮০) বৃহৎ কলেবরের এই তিনটি উপন্যাসের যোগসূত্র—বাংলা অঞ্চলের মানুষের প্রবহমান জীবনের প্রায় শতাব্দীকালের ঘটনাবলি উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও ঔপন্যাসিক *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান*কে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে উপস্থাপন করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত হলেও এই পুস্তকের সকল চরিত্র কাল্পনিক। ঐতিহাসিক ঘটনার ছিটেফোঁটা মাঝে মাঝে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু ইতিহাস-বিজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করা হয়নি।'[১] এর ফলে বলা যায় যে, *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* উপন্যাসের কাহিনিতে ইতিহাস থেকে উপাদান গৃহীত হলেও তা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। কারণ উপন্যাসে ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র নেই এবং উপন্যাসে বর্ণিত রাজনৈতিক ঘটনাবলি স্থান ও কাল ধরে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলনকে কিছু কাল্পনিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায়, গুলাম নবী বালাকোটের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভাওয়ালের জঙ্গলে কন্যা নূরুন্নাহারসহ আশ্রয় নেয়। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, বালাকোটের যুদ্ধ ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে শিখদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী মৃত্যুবরণ করেন।[২] উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গুলাম নবীর আকাঙ্ক্ষা ইংরেজকে পরাজিত করে পুনরায় ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন কায়েম করা। এই চেতনা থেকে সে যুদ্ধের জন্য ভাওয়ালের গহীন জঙ্গলে গোপন আস্তানা তৈরি করে। তার গোপন আস্তানার সংবাদ জানতে পেরে ইংরেজ সরকার ও হিন্দু জমিদার সৈন্য পাঠায়। গুলাম নবীর পক্ষের লোকজনের সঙ্গে ইংরেজ প্রেরিত সৈন্যগণের 'যুদ্ধ' বাঁধে। তাতে গুলাম নবী মৃত্যুবরণ করে। মুসলমান যুবক

জাহান্দার শাহ্ গুলিবিদ্ধ হয়ে নূরুন্নাহারকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। এর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসে সরাসরি ইংরেজ শাসনকে অস্বীকার ও 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছে গুলাম নবী। বলা যায়, ইংরেজের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানের অপহৃত শাসনকে পুনরুদ্ধারের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া শেষ ব্যক্তিটি হলো গুলাম নবী। সে দিল্লিতে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মাদ্রাসা থেকে দেশ উদ্ধারের দীক্ষা নেয়। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দিল্লির নকশাবন্দিয়া তরিকার প্রধান ছিলেন। তাঁর পিতা দিল্লিতে মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাদ্রাসার প্রধান হন। এই মাদ্রাসায় 'শরিয়তের প্রচার আর হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলিমদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি ইসলাম ধর্মমতের আদি গ্রন্থ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার ধারা শুরু...'[৩] করেন। মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া থেকে দীক্ষা নিয়ে গুলাম নবী পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল গড়ের চুরুলিয়ায় পাঠান আমলে তৈরি একটি কালো মসজিদে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে। ভাওয়ালের এই জঙ্গলে থেকে সে সমগ্র ভারতে মুসলমান শাসনের স্বপ্ন দেখে। যদিও বাস্তব চিত্র ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। কারণ সিপাহি বিদ্রোহের পর কোম্পানির হাত থেকে মহারানী শাসনভার গ্রহণের ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন আরও সুদৃঢ় হয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গুলাম নবী ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তার মতে :

> হিন্দুস্থান দারুল্ হরব্[৪] নয়। দারুল্ ইসলাম এ-দেশ। নাসারার জাত জবরদস্তিতে এ-দেশ দখল করে আছে। তাদের বেদখল ক'রে, দেশে পুনরায় আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা প্রত্যেক মুসলমান আওরত মরদের উপর ফরজ। এরি নাম জেহাদ।[৫]

'দেশে পুনরায় আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা'র প্রসঙ্গে ইংরেজপূর্ব মুসলমান শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে-সময় প্রসঙ্গে গুলাম নবীর খলিফা নূর বখ্শ তার সন্তান কমরুদ্দীনকে বলে :

> কিছুকাল আগেও নামেমাত্র হলেও আমাদের বাদশাহ ছিলেন। বৃদ্ধ শাহিনশাহ, বাহাদুর শাহ দিল্লীর তখ্তে বসে ফারসী কবিতা লিখতেন। কমবখ্ত নাসারার জাত তাঁর নামে দেশ শাসন করতো। তারও এক শ' বছর আগে আমরা ছিলাম পুরোপুরি স্বাধীন। বিদেশী ইংরেজ বাদশাহ-দত্ত সনদের বলে এদেশে বাণিজ্য করতো সম্রাটের দরবারে গোলামের মত কুর্ণিশ করতে করতে প্রবেশ করতো তারা। কোন সম্মানজনক পরিচয় তাদের ছিল না। ভিক্ষা-হাঁ, ভিক্ষা মাগতে এসেছিল তারা এ দেশে![৬]

নূর বখ্শের পরিচয় সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে যে, তার পিতা ইজ্জত বখ্শ দিল্লির শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। 'এ-মাদ্রাসায় কেতাবী বিদ্যাশিক্ষাদান ছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের বীজমন্ত্র তা'লিম দেওয়া হতো।'[৭] সেখানে সে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেল্ভীর মুরিদ ও খলিফা হয়। ইজ্জত বখ্শ নিজ গ্রামে ফিরে এসে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে লোকজনের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ নেয়। তার মাদ্রাসার ছাত্ররা 'গোঁড়া' মুসলমান ও ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে মাদ্রাসাজীবন সমাপ্ত করত। মাদ্রাসায় ছাত্রদের উদ্দেশে ইংরেজ প্রসঙ্গে বলা হতো :

> নাসারা উঁচুগলার শার্ট ও পাতলুন পরে। সুতরাং এ-পোশাক মুসলমানের জন্য হারাম। নাসারা মাথার চুল ছোট-বড় করে ছাটে; সুতরাং ঐ রকম দশ-আনা-ছ'আনা করে চুল কাটা শরিয়তবিরুদ্ধ, বেদাত।
>
> নাসারার ভাষা ইংরেজি; সুতরাং মুসলমানের ইংরেজি শেখা না-জায়েজ। এ-দেশ নাসারার অধিকারে; সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর জেহাদ করা ফরজ।[৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির ইংরেজ বিরোধিতা মূলত মুসলমানের মনে ধর্মকেন্দ্রিক চেতনাকে তুলে ধরতে এবং ইংরেজকে ইসলাম ধর্মের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইংরেজ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়-আশয় ও রীতিকে মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, যেন তারা ইংরেজকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। পিতা ইজ্জত বখ্‌শ প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসায় পরম্পরাক্রমে নূর বখ্‌শ প্রচারকার্য চালায়। তার মতে :

> আঠারো শ' সাতাশ ঈসায়ী সালে সৈয়দ আহমদ যে জেহাদ ঘোষণা করেন, আঠারো শ' সাতান্নোর চরম পরাজয়ের পরেও সে জেহাদের নিবৃত্তি হয় নাই, হতে পার না। যত দিন মুসলমান থাকবে ততদিন জেহাদও চলবে। চলছেও।
>
> জেহাদ চলছে বিদেশী শাসক-শোষক নাসারার বিরুদ্ধে। প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানকে এ-জেহাদে যোগ দিতে হবে।[৯]

মুসলমান শাসকের হাত থেকে ভারতের শাসন-ক্ষমতা চলে যাবার পর তাদের মনে অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত চেতনাকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ের বিস্তার লক্ষ করা যায় উপন্যাসে। এর একদিকে রয়েছে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, অপরদিকে রয়েছে হিন্দু জমিদারের প্রতি ক্ষোভ। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারকে প্রতিপক্ষ ধরে জেহাদের এই আহ্বান মূলত 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'[১০] প্রতিষ্ঠার লড়াই। উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে ইংরেজ প্রদত্ত চাকরিতে যোগ দিতে শুরু করে। এতে মুসলমানের মধ্যে দুটি পক্ষ তৈরি হয়।

> ক. একপক্ষ ইংরেজের পুরোপুরি বিরোধী—যারা মনে করে দেশ পুনরুদ্ধারে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে। 'এরা দেওবন্দ-পন্থী (Deoband School of thought)'[১১] নামে পরিচিত।
>
> খ. আরেকপক্ষ ইংরেজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে এবং ইংরেজ-প্রদত্ত চাকরি ও খেতাব গ্রহণ করে। এরা 'আলিগড়-পন্থী (Aligarh School of thought)'[১২] নামে পরিচিত।

আলিগড়-পন্থী মুসলমান সম্পর্কে উপন্যাসে নিম্নরূপ বলা হয়েছে :

> এতদিন এদেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাই শুধু নাসারার সহায়ক ছিল। তারা ভেবেছে ইংরেজ তাদের মিত্র, মুসলমান শত্রু। তাদের এ মনোভাবের মূলে কি ক্রিয়া করছে, বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আজ যে এক শ্রেণীর মুসলমানও ইংরেজদের সহায়ক হয়ে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে আলেমও যেমন আছে, ইংরেজি জবান রপ্ত করেছে তেমন খেতাবধারী গাদ্দারও আছে।[১৩]

উপন্যাসে হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়, যারা ইংরেজের সহচর তারাই ওয়াহাবিদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মুসলমানের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে তারা। রাজবাড়ির জমিদার সত্যনারায়ণ রায় তেমনই একজন ব্যক্তি যার সঙ্গে নীলকর ইংরেজ ওয়েস্টনের সখ্য এবং দুজনেই সাধারণ কৃষকদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। প্রজার সুন্দরী বউ-ঝি তাদের হাত থেকে রক্ষা পায় না। জমিদার সত্যনারায়ণের অত্যাচার সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> জমি চাষাবাদ হোক বা না হোক, তার জমিদারীতে বাস করলে খাজানা দিতেই হবে, এই তার ফরমান। অনাবাদী জমির জন্যও সে প্রজাদের কাছ থেকে খাজানা আদায় করেছে। ... ফরাজির পোশাক পরা লোক মাত্রই তার শত্রু।[১৪]

সত্যনারায়ণ শুধু মুসলমানকে নির্যাতন করে ব্যাপারটি তেমন নয়। নির্যাতনের ক্ষেত্রে 'তার রাজত্বে হিন্দু-মুসলমান সব এক বরাবর।'[১৫] উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা সেক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায়

থাকে। কারণ তারা জমিদারির বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়। নিম্নশ্রেণির হিন্দুর অবস্থা মুসলমানের মতোই শোচনীয়। এরকম পরিপ্রেক্ষিতে গুলাম নবী নির্দেশ দেয় :

> জোর প্রচার চালাও। প্রচারের ফলে যারা মুসলমান হয় তাদের সাদরে সমাজে গ্রহণ করো। যারা ধর্মত্যাগ না করে তাদের সঙ্গেও মেলা-মেশা করো। এ-কথাটা সকলেই মনে রেখো, হিন্দু এ-দেশেরই মানুষ। এ-দেশের আবহাওয়া এবং জমিতেই সে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। হিন্দু আমাদের শত্রু নয়। তাদের মধ্যে লোকবিশেষ, শ্রেণীবিশেষ আমাদের শত্রু, কিন্তু তারা সাধারণ মানুষেরও শত্রু। তারা হিন্দুরও শত্রু মুসলমানেরও শত্রু। তেমন শত্রু মুসলমানের মধ্যেও আছে। মনে রাখবে নাসারা আমাদের প্রধান ও আসল শত্রু। ওদের তাড়াবার জন্য আ'ম লোকের একজোট হতে হবে। যাতে সে জোট ভেঙ্গে যায়, তেমন কোন কাজই করা যাবে না। করবেও না।[১৬]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে, ইংরেজকে নির্দিষ্টভাবে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) *আনন্দমঠ* (১৮৮২) উপন্যাসে মুসলমানকে হিন্দুর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, ইংরেজকে নয়। তাঁর উপন্যাসে ইংরেজকে মিত্র হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছে। তিনি মনে করতেন, 'হিন্দুদের ওপর অধীনতার জোয়াল ব্রিটিশরা চাপায়নি, চাপিয়েছে মুসলমানরাই।'[১৭] এর বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* উপন্যাসে। দেশকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করতে হলে দেশের হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত হওয়ার আহ্বানের মধ্যে জাতীয় চেতনার সংহতি প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> A nation is therefore a large scale solidarity, constituted by the feeling of sacrifices that one has made in the past and of those one is prepared to make in the future.[১৮]

অর্থাৎ জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য জনগণের মনে সার্বভৌম ভাবনার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। আর এক্ষেত্রে তা ইংরেজ-বিরোধী অর্থাৎ উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা হিসেবে উপন্যাসে উঠে এসেছে।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ঘটনা ঘটে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এ ধরনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উপন্যাসে গুলাম নবীর বক্তব্যে হিন্দু-মুসলমানের একত্রিত হওয়ার বিষয়টিতে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছে—এতে ধর্ম কোনো বাধা হয়নি। এক্ষেত্রে উপন্যাসে 'বাঙ্গালা'র অতীত পরাক্রমশালী স্বাধীন রাজাগণ হয়ে উঠেছে গুলাম নবীর প্রেরণা। সে বলে :

> ... দেখতে পাবে মুলকে বাঙ্গালায় অত্যাচার-অবিচার দীর্ঘ দিন কেউ চালাতে পারে না। বাঙ্গলার মাটিতে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে আছে। কবে সে কোন্ কালে, সুদূর অতীতে মৌর্যযুগেও, বাঙ্গলার হিন্দু রাজা শশাঙ্ক মধ্য-ভারতের হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। পাঠান যুগে দিল্লীর শাহানশাহদের বারবার বাঙ্গলার বিদ্রোহ দমন করতে আসতে হয়েছে। আকবরের মত ঝানু কূটনীতিবিদ শাহানশাহকেও যুদ্ধ করতে হয়েছে বাঙ্গলার মাটিতে। বাঙ্গলা কোন দিন কারো পদানত থাকে নাই—ভবিষ্যতেও থাকবে না।

> ... তিস্তা, গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা আর তাদের শত-সহস্র শাখা-প্রশাখার ঐশ্বর্যবান বাঙ্গলার পলিমাটির মানুষ পরাধীনতা বরদাশ্‌ত করতে পারে না। ... কোচ, কোল, ভীল, সাঁওতাল এবং সাধারণ হিন্দু আর মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত শক্তির মোকাবেলায় নাসারা আর তার সহায় দেশী হিন্দু-মুসলমান গাদ্দারের দল এক ফুৎকারে তৃণের মতো উড়ে যাবে।[১৯]

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত বাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হওয়ার সময়ও স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের একরকম উপনিবেশ ছিল। ঔপন্যাসিকের এই বয়ান উপনিবেশ-বিরোধী বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্বরূপ। একইসঙ্গে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত হওয়ার আহ্বানে জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে জন্মভূমি বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল অর্থাৎ বাংলা অঞ্চল। এ প্রসঙ্গে ওয়ালটার সালজবাখ (Walter Salzbach) বলেন, 'National consciousness grows out of affection for the native soil.'[২০] অর্থাৎ জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ জাতীয় চেতনা উৎসারিত হওয়ার অন্যতম উপাদান। উপন্যাসে জন্মভূমি হিসেবে বাংলা অঞ্চল জাতীয় চেতনার উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে।

ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান উপন্যাসে ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলকে একই চেতনায় উজ্জীবিত করা হয়েছে—তা হলো সবাই 'বাংলার মানুষ'। জমিদার সত্যনারায়ণের মুসলমান বিষয়ক ভাবনা এই ধারণায় বিভাজন ঘটিয়েছে। মুসলমানকে সে শত্রু মনে করে। উপন্যাসে ইংরেজ ওয়েস্টন তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মুসলমান তোমার শত্রু নয়?'[২১] জবাবে সত্যনারায়ণ বলে :

> ... অবশ্যই মুসলমান আমার পরম শত্রু। সাত শ' বছর এ-যবনের জাত আমাদের গোলাম করে রেখেছে : আমাদের মন্দিরের বিগ্রহাদি ভেঙ্গেছে, লুট করেছে সোমনাথের ধনরত্ন; রাজপুত রমণীদের বিয়ে করে হিন্দু জাতির জাত মেরেছে—মুসলমান আমার শত্রু নয় তবে শত্রু আবার কে?[২২]

হিন্দু জমিদার সত্যনারায়ণের চোখে মুসলমান শত্রু, ইংরেজ নয়। জমিদার সত্যনারায়ণের দাদা মুকুট রায় বারো ভুঁইয়ার বংশধর কাজী বাহাউদ্দীনের দেওয়ান ছিলেন। 'মুকুট রায় তাঁর আরাম আয়েশের টাকা যোগাতো, কিন্তু নওয়াবের জমা দিত না।'[২৩] কাজী বাহাউদ্দীনের জমিদারি চলে যায় এবং মুকুট রায় নিজ নামে তা বন্দোবস্ত করে নেয়—যা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। হিন্দু জমিদার সত্যনারায়ণ ও নীলকর ইংরেজ ওয়েস্টন উভয়ের শত্রু মুসলমান। এই শত্রুকে বিতাড়ন করার জন্য তারা জোট বাঁধে। ওয়েস্টন বলে :

> বাঙ্গলা দেশ থেকে ওদের [মুসলমান] নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত বিরাম নাই। এক কলমের খোঁচায় বেটাদের ভাষা হরণ করেছি; জমিদারী, তালুকদারী এবং সরকারী চাকরি-নওকরি থেকে ওদের বিতাড়িত করেছি। তবু যারা পোষ মানে না, মওকা পেলেই বিদ্রোহ করে, মেকিয়াভেলির নীতি অনুযায়ী তাদের পাইকারীভাবে কতল [করতে হবে] ...।[২৪]

'বাঙ্গলা দেশ' থেকে মুসলমানকে চিশ্চিহ্ন করার এই প্রকল্প সাম্প্রদায়িক। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজকে সহযোগিতা করে। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনকে তারা স্বাগত জানিয়েছিল। পক্ষান্তরে তারা মুসলমানকে শত্রুজ্ঞান করে। জমিদার সত্যনারায়ণ ও ইংরেজ ওয়েস্টনের কথায় এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এর বিপরীতে মুসলমান তার হারানো দেশের জন্য জেহাদে নামে। এ প্রসঙ্গে নূর বখ্‌শ বলে :

> ইংরেজ আইন আদালত থেকে ফারসী ভাষা তুলে দিয়েছে। দলিল-দস্তাবেজও এখন বাঙ্গলায় লেখা হয়। ... কিন্তু সেখানেও আক্রমণ চলছে আমাদের উপর। চলতি বাঙ্গলা নাই। তার জায়গায় পণ্ডিতেরা দাঁতভাঙ্গা সব সংস্কৃত লফ্‌জ্‌ আমদানী করছেন। আদর্শলিপি বই! তাও দেবদেবী আর রাজরাজড়ার কথায় ভর্তি।[২৫]

ইংরেজ শাসনের প্রভাবে প্রচলিত ফারসি ভাষার স্থান দখল করে নিয়েছে ইংরেজি ভাষা। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রভাব বিস্তার করেছে সংস্কৃত ভাষা। ইংরেজি ও সংস্কৃত কোনোটাই নূর বখ্‌শের ভাষা নয়। তার মৌখিক বাংলা ভাষায় সে বিদ্যাচর্চার পাঠ্য পায় না, বইপত্রে থাকে হিন্দুত্বের ছাপ। এসব বিষয় বাঙালি মুসলমান হিসেবে নূর বখ্‌শের মনে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করেছে। এ থেকে মুক্তির জন্য সে উপায় খোঁজে। ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি তার আত্মপরিচয়ের সংকটের ক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে উঠে আসে। নূর বখ্‌শের ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উপনিবেশ-বিরোধী[২৬] জাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ। একইসঙ্গে মুসলমান কৃষকদের অত্যাচারী জমিদারের হাত থেকে রক্ষার জন্য অগ্রনায়ক হিসেবে সে অস্ত্রধারণ করতেও পিছপা হয়নি। নিপীড়কের হাত থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য নিপীড়িতরা একত্রিত হলে জাতীয় চেতনা উত্থিত হয়। সেক্ষেত্রে তারা একই চেতনা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অনেক সময় তা জাতীয় মুক্তির রূপ লাভ করে। উপন্যাসে জাহান্দর শাহ অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরের হাত থেকে নির্যাতিতদের উদ্ধার করে। তার পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে :

> বিদেশী শক্তির খুঁটি হিসাবে কর্ণওয়ালিস এদেশে যে নতুন জমিদার, তালুকদার, নীল কুঠিয়াল প্রভৃতি তৈরি করেছিলেন তাদের অত্যাচার, অবিচার ও জুলুমের কাহিনী শুনলে সে [জাহান্দর শাহ] স্থির থাকতে পারতো না। প্রতিকারের জন্য পাগল হয়ে যেতো। ... এজন্য সে নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি উপদল সৃষ্টি করে।
>
> ...
>
> বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ-দেশে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দেখা দেয়, জাহান্দরের দলকে তাদের আদি গুরু বলা চলে।[২৭]

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে জাহান্দর মধুপুরের জঙ্গলে তার উপদলের ঘাঁটি তৈরি করে। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> জালেম কুঠিয়াল জমিদারের বিরুদ্ধে তার অভিযানও অনাচার অবিচারের প্রতিকার-চেষ্টা মাত্র—লোক বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি কোন আক্রোশ বা স্থায়ী বিদ্বেষপ্রসূত নয়। তবে দেশ ও দশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের একটা আদর্শগত সঙ্কল্প তার আছে।[২৮]

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনে আক্রান্ত দেশ—সে উদ্ধার করতে চায়। দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে উপনিবেশ-বিরোধী চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। পক্ষান্তরে জমিদার সত্যনারায়ণ ইংরেজকে তার দোসর ভাবে। মুসলমানকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে জমিদার সত্যনারায়ণের মনে হয়েছে, একসময় মুসলমান প্রজার ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জমিদারবাড়িতে নামকরণের জন্য এসেছে। এখন তারা আর আসে না। প্রজার এধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য সে ওয়াহাবি মুসলমানকে দায়ী করে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষস্বরূপ ক্ষোভ পোষণ করে। সে ভাবে, 'সত্যই ত ইংরেজ তার মিত্র, মুসলমান তার শত্রু।'[২৯] এই শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশে একত্রিত হয় ইংরেজ ও জমিদারের কুঠিয়াল বাহিনী। তবে সব মুসলমান যে ইংরেজ কিংবা জমিদারের শত্রু নয়, এ প্রসঙ্গে ওয়েস্টন বলে :

> জাহান্দরের দলকে দমন করতে যেয়ে যেন মুসলমান তালুকদারদের অপমান করো না। শাসনের সুবিধার জন্যে আমরা বহু মুসলমানকে সিকিমি স্বত্ব দিয়েছি এবং এখনও দিচ্ছি। ... তারা আমাদের কেল্লার নীচের খুঁটি।[৩০]

অর্থাৎ মুসলমানের মধ্যে যারা ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করে তারাই জমিদার ও ইংরেজের শত্রু। এই ঘরানাপন্থী মুসলমানেরা নীলকর ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদারের চোখে 'ফরায়েজি' হিসেবে পরিচিত। এদের প্রসঙ্গে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *পলাশি থেকে পার্টিশন* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বারাসতে তিতুমীরের অনুগামীরা নীলকরদের হঠাৎ আচমকা ভীষণভাবে জীবননাশের জীবনের ভয় ধরিয়ে দেয়। প্রায় একই সময় দুদুমিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় ফরাজী আন্দোলনকারীরাও তাদের আক্রমণের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নীলকরদের বেছে নিয়েছিল।[৩১]

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন, ১৭৬৫ তে লর্ড ক্লাইভের বাংলার দেওয়ানি সনদ লাভ, বাৎসরিক বন্দোবস্তের ফলে জায়গির জমিদারি হারানো, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সর্বস্বান্ত হওয়ার মতো বিষয় মুসলমানের জীবনকে গভীর সংকটে আবর্তিত করে। এ থেকে বের হওয়ার জন্য তারা নিজেদের হারানো গৌরবকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়। তারা মনে করে, ইংরেজ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে, পুনরায় ইংরেজকে পরাজিত করে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রজা-নিপীড়ক হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধেও লড়াই করে কৃষককে মুক্ত করতে হবে।

> ... আশায় বুক বেঁধেছে নূর বখ্‌শ—তার মত লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্তানবাসী। জেহাদ! হ্যাঁ জেহাদ করে ফিরে পেতে হবে লুপ্ত মানবসম্ভ্রম আর হারানো আজাদী।
>
> কি হয়েছে সিরাজ গেছে বলে! কি হয়েছে টিপু নাই তাতে! এখনও জেন্দা আছে কোটি কোটি হিন্দুস্তানবাসী।[৩২]

যদিও তারা ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র হিসেবে ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে তবে 'হিন্দুস্তানবাসী' হিসেবে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো থেকে ছাত্ররা ইংরেজ-বিরোধী চেতনা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। জমিদারের হাতে নির্যাতিত নিম্নশ্রেণির হিন্দু নমশূদ্ররাও এই আন্দোলনে সায় দেয়। এটা শুধু মুসলমানের মধ্যে আবদ্ধ না-থেকে সাধারণ নিম্নবর্গের চেতনাতেও সঞ্চারিত হয়। যা শাসক বনাম শোষিতের লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় চেতনার রূপ পায়। তাদের মধ্যে এই চেতনার মূল আকাঙ্ক্ষা হলো : 'হিন্দুস্তানকে নাসারার কব্জা থেকে মুক্ত'[৩৩] করা। যদিও এর সম্ভাব্যতা নিয়ে গুলাম নবীর মনে সংশয় কাজ করে। কারণ হিসেবে সে বলে :

> সত্যনারায়ণ, ওয়েস্টন, বলাই এবং তাদের অধীন শত শত সিকিমি মিরাশি তালুকদারেরা এ-দেশে ইংরেজ শাসনের মূল ভিত্তি। এরা মীর জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকদের উত্তরাধিকারী, পাপাত্মা হেস্টিংস, কর্নওয়ালিসের সৃষ্টি। তাদের গায়ে আঘাত লাগলে সে আঘাত নাসারা রাজশক্তির গায়েও গিয়ে বিঁধবে। তখন তারা বিচলিত হয়ে সাহায্যার্থে আসবেই। কিন্তু উপায়ও নাই। কতকাল জালেমের জুলুম সহ্য করবে?[৩৪]

উদ্ধৃতিতে 'জালেমের জুলুম' শব্দদ্বয়ের দ্বারা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রসঙ্গ অতিক্রম করে তা সাধারণের মুক্তির প্রসঙ্গবার্তা হয়ে উঠেছে। যারা জুলুম করেছে তাদের

সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'আজাদি' আনাই তাদের লক্ষ্য। তবে এই আজাদি যে সহসাই ঘটবে না এ বিষয়ে গুলাম নবী বলে :

> হয়ত এ-জীবনে আজাদী দেখে যেতে পারবো না—হয়ত পরবর্তী পুরুষও পারবে না। নাসারার কপালের সেতারা এখন জ্যোতিষ্মান। তিন পুরুষ চলবে এমনি—পারিবারিক ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়, ইবনে খলদুনেরও এই মত। তিন পুরুষই উন্নতির কাল। চতুর্থ পুরুষে ক্ষয় হতে শুরু হবে ইংরেজের শক্তি—হয়ত নিবেই যাবে তার কপালের সে তারকা। দেশ আবার আজাদ হবে।[৩৫]

দেশকে ইংরেজ শাসন থেকে রক্ষা করাই হলো এই আজাদি। তবে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাদের শাসন পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত না-থাকলেও উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা স্পষ্ট থাকে। দেশকে মুক্ত করার জন্য নূর বখ্শ বলে :

> —দেশ আজাদ করার জন্য জেহাদ করা ফরজ। সে-জেহাদ চলছে। তাতে জান ও মাল দিয়ে শরিক হও।
>
> —দারুর হর্‌ব থেকে হিন্দুস্তানকে আবার দারুল ইসলামে ফিরিয়ে আনো।
>
> —জালেমের অত্যচার সহ্য করো না, কোমর বেঁধে দাঁড়াও। যারা জালেম শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না তারা নিজেরাও জালেম।[৩৬]

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, কোম্পানির শাসন-আমলে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জেহাদের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না এবং ভারত দার উল-হরব্ কি না এ বিষয়ে সংশয় ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে আলীগড়পন্থী বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক ভারতে জেহাদ বিষয়টি অর্থহীন।[৩৭]

নূর বখ্শের জেহাদের আহ্বান সাধারণের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগতভাবে খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধও লক্ষ করা যায়। ফলে কৃষক শাকের মামুদ নীল চাষে অস্বীকৃতি জানানোয় ইংরেজ ওয়েস্টন তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করতে ঔদ্ধত্য হলে সে প্রচণ্ড ঘুষি দেয় এবং বেপরোয়া আক্রমণ করে :

> ওয়েস্টনের বুকের উপর থেকে শাকের মামুদ নেমে যায় এবং তাকে দু'হাত ধরে টেনে তুলে পাছায় সজোরে একটা লাথি মেরে বলে : যা হারামজাদা কুত্তার বাচ্চা জাহান্নামে যা; কিন্তু খবরদার বলে দিচ্চি বাঙ্গালীর সঙ্গে আর কখনো পালোয়ানী দেখাতে আসিস্ না।[৩৮]

উপন্যাসে নিম্নবর্গের এধরনের প্রতিরোধ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে রয়ে যায়। সঠিক নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যর্থ হতে হয়। একইসঙ্গে দেশীয় জমিদারের অত্যাচারের ফলে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। নূর বখ্শ ও নসু প্রধানকে বন্দি করে জমিদার তার গুমঘরে আটকে রাখে। এক্ষেত্রে 'জমিদার নিজেই—ফরিয়াদি, নিজেই বিচারক, নিজেই উকিল। জেলখানাও জমিদারেরই। তার নাম গুমঘর।'[৩৯] কৃষকদের মধ্যে দেশকে ইংরেজ মুক্ত করার চেতনা থাকলেও বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। এদেশীয় জমিদারেরা ইংরেজ শাসনের পক্ষে থাকায় ইংরেজ-বিরোধী কৃষক-চেতনা প্রতিহত হয়েছে।

সিপাহি-বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা মুসলমানের প্রতি নানা কায়দায় নিপীড়ন চালায়। ওয়াহাবি, ফরায়েজি এরা ছিল ইংরেজের চক্ষুশূল। এই পন্থীরা ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হতে

লড়াইয়ে নেমেছিল যদিও তাদের প্রতিরোধ স্পৃহাতে ইসলাম ধর্মপ্রসঙ্গ যুক্ত ছিল। উপন্যাসে এ বার্তা জাহান্দরের ভাবনায় এসেছে এভাবে :

> হোক না শেষ পর্যন্ত পরাজয়—তবু জেহাদী মনোভাব জীইয়ে রাখতে হবে আ'ম লোকের মধ্যে। আজ না হোক, ভবিষ্যতে একদিন না একদিন জয় হবেই।
>
> কিন্তু একবার যদি জেহাদী মনোভাব মুছে গিয়ে গোলামীর মনোভাব জনমনে সংক্রমিত হয় তবে শত বছরেও নাসারার শাসন থেকে হিন্দুস্তান মুক্তি পাবে না।
>
> দেশ ও জাতির জীবন ব্যক্তির জীবনের চাইতে অনেক দীর্ঘ।
>
> ...
>
> সুবে বাঙ্গলার তাহজিব জেহাদী তাহজিব। ইসা খাঁ, হুসেন শাহর রুহ্ এর আকশে বাতাসে।
>
> সেই প্রাচীন ঐতিহ্য বিলুপ্ত হতে দেবে না সে। বংশ-পরম্পরাক্রমে বাঁচিয়ে রাখবে তা' বাঙ্গলার বুকে।
>
> জালেম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বাঙ্গলার মাটির বৈশিষ্ট্য।[৪০]

উদ্ধৃতিসূত্রে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত রাখার চেতনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পাকিস্তান শাসনামলে পরাধীনতা থেকে বাংলার মুক্তির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এজন্য 'আ'ম লোকের' মনে মুক্তির চেতনা জারি রাখার কথা বলা হয়েছে। কারণ 'আ'ম' বা সাধারণ লোকেরাই নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাদের মধ্য থেকে প্রতিরোধ নিম্নবর্গীয় চেতনা থেকে উৎসারিত হয়— যা ধর্ম, গোত্র, সম্প্রদায় এসবের ভেদাভেদ না-করে শোষিত হিসেবে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে। উপন্যাসে এ বিষয়টি লক্ষ করা যায় ব্রাহ্মণ বলাইকে মুলুকচাঁদ কর্তৃক অপহরণের ঘটনা দিয়ে। বলাই তাকে বলে : '—হিঁদু হয়ে তুমি... আমি... মানে আমাকে... ব্রাহ্মণকে ধরে আনলে? ... অমন করে আছাড় মারলে?'[৪১] এর জবাবে মুলুকচাঁদ বলে, '—আমরা ছোট লোক। ছোট লোকের আবার হিঁদু-মুসলমান কি! সব সমান।' তা'ছাড়া তুমি হিঁদু নও, বামুন নও—তুমি দেশের ও দশের শত্রু।'[৪২] লক্ষণীয় যে, মুলুকচাঁদের নিম্নবর্গীয় চেতনা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। সহজেই সে তার শোষিত আত্মপরিচয় ঠিক করতে পেরেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলাই মুলুকচাঁদকে উল্‌টো কথা বলে :

> ... মুসলমান হচ্ছে হিঁদুর জাত-শত্রু। কয়েক শ' বছর পরে ইংরেজের সহায়তায় মুসলমানের অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু তারা আবার এ-দেশ তাদের অধিকারে আনতে চায়। ... ফরাজিরা হিন্দুস্তানকে আবার মুসলিম-ভূমিতে পরিণত করতে চায়।[৪৩]

ব্রাহ্মণ বলাই শাসক শ্রেণির প্রতিভূ আর ধর্মভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে সে দেশের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতাসীনদের কাছাকাছি থাকতে চায়। এর বিপরীত চিত্র মুলুকচাঁদের মন্তব্যে উঠে এসেছে, 'মুসলমান রাজা এ-দেশের ধন বিলাত নিয়ে যেতো না—এ-দেশেই খরচ করতো—আর তোর মনিবরা [ইংরেজ] দেশের সব কিছু লুটেপুটে সাগর পার করে দিচ্ছে।'[৪৪] মুসলমান শাসকেরা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বানিয়েছে কিন্তু ইংরেজ তা করেনি। শোষক ইংরেজের হাত থেকে দেশ রক্ষা করাকে গুলাম নবী, নূর বখ্শ, জাহান্দর ঈমানি দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। এতে নূর বখ্শ তার একমাত্র পুত্র কমরউদ্দীনকে বলে, '... তুমি আমার একমাত্র পুত্রসন্তান হলেও তোমাকে আমি দেশ ও জাতির মুক্তির রাহে উৎসর্গ করেছি।'[৪৫] স্বদেশ রক্ষার জন্য নূর বখ্শের এই ত্যাগ

স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে উৎসারিত—যা উপনিবেশ-বিরোধী চেতনার প্রতিফলন। এর বিপরীতে স্বদেশপ্রেমের চেতনাকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়ে উপনিবেশক ইংরেজ ওয়েস্টন বলে :

> হেস্টিংস সূর্যাস্ত আইন জারি করে মুসলমানের জায়গীর জমিদারী সব গ্রাস করে নেন। কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়ার সময়ে সে-গ্রাস করার উপর চিরস্থায়ীত্বের সীলমোহর বসিয়ে দেন। বেন্টিঙ্ক ফারসী ভাষা তুলে দিয়ে রাতারাতি মুসলমানদের সরকারী চাকরি থেকে বঞ্চিত করেন। সুতরাং অতি সামান্য কাজ বাকী আছে। এখনও মুসলমানদের মধ্যে যে সব আরবী ফারসী জানা শিক্ষিত ও স্বাধীনতাকামী লোক আছে তাদের ছলে বলে কৌশলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এ-কাজেই আমাদের হাত দিতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে যারা ইংরেজি শিখছে তাদের সম্বন্ধে কোন ভয় নাই। তারা খান্দানী লোক নয়। তারা নতুনের মোহে পুরানো কথা ভুলে যাবে এবং আমাদের গোলামী করাকেই শরাফতী মনে করবে কেননা এরা মুসলিম আমলেও শোষিত ছিল—উচ্চ শ্রেণীতে এদের স্থান ছিল না।[৪৬]

ইংরেজের মিত্র হিসেবে বর্ণহিন্দুকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে : হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সদরে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলছে, গ্রামাঞ্চলে পাঠশালা করা হয়েছে। এসব জায়গায় বর্ণ হিন্দু সমাজের আধিপত্য। 'তারাই ইংরেজের রাজশক্তির ভিত্তি। শাসন-যন্ত্রে দলে দলে তাদের লোক প্রবেশ করে হিন্দুস্থানে বিদেশি রাজশক্তির সামাজিক সমর্থনের ভিত সুদৃঢ় করছে।'[৪৭] এর বিপরীতে ওয়াহাবি মুসলমানকে ইংরেজের শত্রু হিসেবে বলা হয়েছে :

> যত নষ্টের গোড়া ঐ মুসলমান আলেম সমাজ। তারা আ'ম মুসলমানের মধ্যে তখনও জেহাদের বাণী ছড়াচ্ছে। জানাচ্ছে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার আহ্বান। মুসলমানসৃষ্ট মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদিতে সরকারী সাহায্য বন্ধ। তাদের বড় বড় ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির আয়ও সরকারী খাজাঞ্চিখানায়; কিন্তু তবু মুসলমান যুবকেরা ইংরেজি শিখতে আসে না।
>
> ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি আদব-কায়দা লেহাজ তমিজের সঙ্গে সমস্ত প্রকার সহযোগিতা বর্জন করার উস্কানী দিচ্ছে মুসলমান মৌলভীর দল।[৪৮]

লক্ষণীয় যে, ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু ও ওয়াহাবি মুসলমান বিপরীত চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বর্ণহিন্দুরা ইংরেজের শাসন কাঠামোতে সহযোগী হিসেবে হাজির হয়েছে আর ওয়াহাবি মুসলমানেরা সরাসরি ইংরেজকে প্রত্যাখ্যান করে লড়াইয়ে নেমেছে। এক্ষেত্রে ওয়াহাবি মুসলমানের ইংরেজের বিরোধিতা করে জেহাদ যদি উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় চেতনা থেকে উত্থিত হয় তবে বর্ণহিন্দুর ইংরেজের সহযোগিতা করা সে জাতীয় চেতনার বিভক্তিস্বরূপ বলে ধারণা করা সম্ভব।

ইংরেজ শাসন পোক্ত হওয়ার পরেও সৈয়দ আহমদের জেহাদের আহ্বান মুসলমান কৃষকের চৈতন্যে ক্রিয়াশীল থাকে। এদের ধ্বংস করার জন্য ইংরেজ ছোটোলাট বৈঠক ডাকেন। সেখানে আলোচনা সাপেক্ষে একজন ইংরেজ বলে :

> মুসলমানের সমর্থন আমাদের দরকার নাই। ... স্পেনের মত এদেশ থেকেও মুসলমানদের তাড়িয়ে দিতে পারলে হিন্দুরা খুশি হবে। আমাদের ডিপুটি বঙ্কিমচন্দ্র তার বইতে লিখেছে : ইংরেজ হিন্দুর বন্ধু। মুসলমান হিন্দুর শত্রু। সুতরাং ভাগ করো আর শাসন করো—এ নীতির চাইতে উত্তম নীতি রাজনীতিশাস্ত্রে আর নাই।[৪৯]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে ইংরেজের বিভাজন নীতি (ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি) উঠে এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান দমন করতে কয়েক দফা[৫০] সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. এদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ ব্যবধান সৃষ্টি করা;

খ. হানাফি, ওয়াহাবি, শিয়া, সুন্নি এদের মধ্যে বাহাসের মাধ্যমে সংঘর্ষ বাঁধানো;

গ. মুসলমানের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটানো যাতে হিন্দুর বিপক্ষে কাজে লাগানো যায় এবং

ঘ. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহে ইংরেজের পক্ষে কাজ করা মুসলমানদের মহান নেতা হিসেবে পদ পদবীতে ভূষিত করা এবং পাঠ্যবইয়ে তাদের বীর হিসেবে তুলে ধরা।

এ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ইংরেজ বাহিনী ও তাদের 'ভাড়াটিয়া' সৈন্য গুলাম নবীর চুরুলিয়ার আস্তানা ঘিরে ফেলে। গুলাম নবী গুলিতে নিহত হয় এবং জাহান্দর ও নূরুন্নাহার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। দেশ শান্ত হয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানের উনিশ শতকের মুক্তিসংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে এবং 'ইংরেজ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।'[৫১] এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসকের শৃঙ্খল থেকে ভারতীয়দের মুক্তি ঘটে না।

ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান উপন্যাসে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানের মুক্তিসংগ্রাম উপনিবেশ-বিরোধী চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে। ইংরেজ শাসন-আমলে মুসলমানের হারানো রাজ্যক্ষমতা, অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিন্দুস্থানকে 'দারুল ইসলাম' করার স্বপ্ন ও সংগ্রাম। এর মধ্য দিয়ে ওয়াহাবি ও ফরায়েজিপন্থীরা 'আত্মপরিচয়' নির্মাণের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের পরিচালিত সংগ্রাম উপন্যাসে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের রূপ পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বসবাস করে আসছে। কিন্তু উপন্যাসে হিন্দুস্থানকে 'দারুল ইসলাম' করার লক্ষ্যে মুসলমানদের একটি অংশ যখন ইংরেজ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে তাদের ইংরেজ-বিরোধী চেতনা মূলত ধর্মীয় চেতনা থেকে উৎসারিত হওয়ার রূপ পেয়েছে। এই চেতনা ধর্মীয় সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘুর ভিত্তিতে জাগ্রত না হয়ে মূলত মুসলমান শাসকের ধর্মকেন্দ্রিক উপাদানকে উপজীব্য করেছে। বলা যায়, উপন্যাসে মুসলমানের ইংরেজ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করার মনোবাসনা প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে তারা হিন্দুস্থানকে দারুল ইসলাম হিসেবে আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে চেয়েছে। এর ফলে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমানের দারুল ইসলাম থেকে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যদিও উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান সবাই এদেশীয়, কিন্তু যখন হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম হয়ে যায় তখন তার আত্মপরিচয়ও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে দারুল ইসলাম আত্মপরিচয় শুধু ইসলাম ধর্ম-অনুসারীরা ব্যতীত অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি করে। ফলে *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* উপন্যাসে মুসলমানের ইংরেজ-বিরোধী চেতনা যেমন উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় চেতনাকে নির্দেশ করেছে, পাশাপাশি দারুল ইসলামের আকাঙ্ক্ষা জাতীয় চেতনার বিভক্তিকে তুলে ধরেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুজাফর শামসুদ্দীন, *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ভূমিকা

২. গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান*, (কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৯৯৪), পৃ. ২৪১

৩. তদেব, পৃ. ২৩৮-২৪০

৪. 'শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র আব্দুল আজিজ নিজস্ব ফতোয়ায় হিন্দুস্থানকে দারুল হরব্ বলে ঘোষণা করেন। তবে তিনি সরাসরি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেননি।' উদ্ধৃতি, তদেব, পৃ. ২৪০

৫. আবুজাফর শামসুদ্দীন, *আবুজাফর শামসুদ্দীন রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ২৬০

৬. তদেব, পৃ. ২৪৪

৭. তদেব, পৃ. ২৫৫

৮. তদেব, পৃ. ২৫৬

৯. তদেব, পৃ. ২৫৭

১০. 'দ্বিজাতি তত্ত্বের ঔপনিবেশিক যুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ একটা পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেছিল, এবং কেউ কেউ বলেছিলেন এই ধরনের একটা রাষ্ট্র পুনর্গঠিত ইসলামীয় দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।' উদ্ধৃতি, রোমিলা থাপার, "প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ", অসীম চট্টোপাধ্যায় (অনূদিত), *প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ*, রোমিলা থাপার ও এ.জি. নুরানি ও সদানন্দ মেনন, (কলকাতা : সেতু প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ. ৩৬

১১. 'মাওলানা মোহাম্মদ কাসেমের নেতৃত্বে এঁদের সংগ্রামী অংশটি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওবন্দ মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং ইংরেজ-বিরোধিতাকে তাঁদের সংগ্রামের একটা অংশে রূপান্তরিত করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা আধুনিক ব্যবস্থা বর্জন করে সনাতন পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা তো দূরের কথা ইংরেজের সাহায্য নেওয়াকে পর্যন্ত না জায়েয (অসিদ্ধ) মনে করতেন।' উদ্ধৃতি, রশীদ আল ফারুকী, "মুসলিম-মানস : ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ত্রিবেনীসঙ্গম", অর্জুন গোস্বামী (সম্পাদিত), *দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, (কলকাতা : গাঙচিল, ২০২১), পৃ. ৭৮

১২. '[এঁরা] স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর নেতৃত্বে ... ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে মনোনিবেশ করেন এবং মুসলিম জাতির স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাঁদেরই অনুসারীরা বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে ভারতীয় মুসলিম লিগ [লীগ] গঠন করেন এবং মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি দাবি করেন।' উদ্ধৃতি, তদেব, পৃ. ৭৯

১৩. আবুজাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭

১৪. তদেব, পৃ. ২৮৪

১৫. তদেব, পৃ. ২৮৫

১৬. তদেব, পৃ. ২৮৫

১৭. 'বন্দে মাতরম্ : দ্বন্দ্বদীর্ণ এক রণধ্বনি', *দেশ*, কলকাতা, ১৭ জুন, ২০১৯, পৃ. ১৮

১৮. Geoff Eley & Ronald Grigor Suny, *Becoming National*, (New York: Oxford University press, 1996), p-53

১৯. আবুজাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬-৮৭

২০. Walter Salzbach, *National Consciousness*, (Washington D.C.: American Council on Public Affairs, 1943), p-51

২১. আবুজাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

২২. তদেব, পৃ. ৩০৭

২৩. তদেব, পৃ. ২৮৫

২৪. তদেব, পৃ. ৩০৮

২৫. তদেব, পৃ. ৩২৩

২৬. 'উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং কৃষকসমাজের কাছে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পাবনা এবং দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা এবং মারাঠা জাতীয়তাবাদের যুগে, বিকল্প পথের নতুন সম্ভাবনাকে খুলে দিয়েছিল।' উদ্ধৃতি, বরুণ দে, "জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্র, ঔপনিবেশিকতা", গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *ইতিহাস চর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৫), পৃ. ৩৪

২৭. তদেব, পৃ. ৩৪৩

২৮. তদেব, পৃ. ৩৫৭

২৯. তদেব, পৃ. ৩৭১

৩০. তদেব, পৃ. ৩৭৩

৩১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশন : আধুনিক ভারতের ইতিহাস*, অনুবাদ : কৃষ্ণেন্দু রায়, (কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৯), পৃ. ২৩৪

৩২. তদেব, পৃ. ৩৯০

৩৩. তদেব, পৃ. ৩৯৩

৩৪. তদেব, পৃ. ৩৯৮

৩৫. তদেব, পৃ. ৩৯৮

৩৬. তদেব, পৃ. ৪১৮

৩৭. গৌতম ভদ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬

৩৮. আবুজাফর শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০

৩৯. তদেব, পৃ. ৪৩৭

৪০. তদেব, পৃ. ৪৫৯

৪১. তদেব, পৃ. ৪৬৫

৪২. তদেব, পৃ. ৪৬৫

৪৩. তদেব, পৃ. ৪৬৫

৪৪. তদেব, পৃ. ৪৬৬

৪৫. তদেব, পৃ. ৪৭৩

৪৬. তদেব, পৃ. ৪৭৬

৪৭. তদেব, পৃ. ৪৮২

৪৮. তদেব, পৃ. ৪৮২

৪৯. তদেব, পৃ. ৪৮৪

৫০. তদেব, পৃ. ৪৮৫-৮৬

৫১. তদেব, পৃ. ৫০৭

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধ : বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও ইসলামি নির্দেশনার আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ নুরুল আমিন*
সাইয়্যেদ মোঃ মাহবুব জাবিরী*

Abstract

Food hoarding is a significant issue in Bangladesh. Although various laws exist to prevent food hoarding, most food traders in this Muslim-majority country are also Muslim. In addition to the existing legal framework, if Islamic principles are effectively emphasized, the issue of food hoarding may be reduced due to the deep-rooted passion and commitment of the Muslim community toward Islam. This research aims to analyze the existing laws related to food hoarding and compare them with Islamic rules and regulations. As part of a qualitative study, the Document Analysis Method has been used to identify laws related to food hoarding, while the Comparative Research Method has been applied to review these laws in light of Islamic teachings. Overall, the study provides a comparative analysis of Islamic guidelines and existing laws in Bangladesh to combat food hoarding. The findings reveal that nearly all provisions of the current legal framework align with Islamic law. Therefore, if awareness is raised by incorporating Islamic teachings alongside existing regulations, public consciousness regarding food hoarding can be enhanced. Furthermore, since food hoarding is considered a crime in Islamic teachings, there is a strong possibility that individuals will be discouraged from engaging in such practices.

চাবিশব্দ : খাদ্যপণ্য, মজুদদারি, মুনাফাখোরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইন।

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

* সহকারী অধ্যাপক (আরবি), হায়দরগঞ্জ তাহেরিয়া আর.এম কামিল মাদ্রাসা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি অধিক জনবহুল দেশ। এদেশের খাদ্য চাহিদা দেশীয় উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জনবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী চলাকালে দেশের সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন স্বাভাবিক ছিলো এবং কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন আশানুরূপ। কিন্তু বিভিন্ন সময় দেশীয় ব্যবসায়ীরা খাদ্য মজুদ করে অধিক মুনাফা লাভের অপচেষ্টা চালায়, যা বর্তমান করোনা মহামারিউত্তর অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে আমদানি নির্ভর খাদ্যপণ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করে। এ সুযোগে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী মজুদদারি করছে। বাংলাদেশে খাদ্যমজুদদারি প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন প্রচলিত। এ সকল আইনের কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধনের সুপারিশ থাকলেও বেশিরভাগ আইনের ধারা ইসলামি আইনের সাথে সমর্থিত। তাই এ বিষয়টি মুসলমান ব্যবসায়ীদের মাঝে ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ এবং এর দুনিয়াবি ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করা হলে মজুদদারি বন্ধে ব্যবসায়ীদের ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোপরি, এ গবেষণায় মজুদদারি প্রতিরোধে সরকারি নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে করণীয়, আইনী সংস্কার ও জনসচেতনতা তৈরিতে সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এ গবেষণা কর্মটি নিম্নোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে।

১. খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

২. খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের সাথে ইসলামি আইনের সামঞ্জস্য পর্যালোচনা করা।

গবেষণা প্রশ্ন

এ গবেষণা কর্মটি নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলির আলোকে পরিচালিত হয়েছে।

১. খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনগুলো কী কী?

২. খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহ অনুসরণে ইসলামি নির্দেশনা কী?

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে (Qualitative Research) সম্পন্ন করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে Document Analysis Method (পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি) প্রয়োগ করে খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্যমান আইনসমূহ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনায় তুলনামূলক বা অনুবন্ধ গবেষণা পদ্ধতি (Correlational research method) প্রয়োগ করা হয়েছে। তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি হলো এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যার লক্ষ্য কোনো ধরনের প্রভাব ছাড়া দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা।[১] বর্তমান গবেষণায় তুলনামূলক গবেষণায় দুটি চলক হলো-

১. খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহ
২. খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে ইসলামি নির্দেশনা

সাহিত্য পর্যালোচনা

'খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধ : বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও ইসলামি নির্দেশনার আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণার সাথে সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনাপূর্বক গবেষণার পরিধি ও যৌক্তিকতা নিরূপণ করা হলো। প্রথমত, Manual Literature Review পদ্ধতিতে এ সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে গবেষণা ঘাটতি (Research Gap) তুলে ধরা হলো।

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থে মজুদদারি সম্পর্কিত ইসলামি নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। যা এ গবেষণার অন্যতম উপাদান।

ড. নূরুল ইসলাম, *ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরি, মজুদদারি ও পণ্যে ভেজাল*। হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মজুদদারি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ড. আনু মাহ্‌মুদ, *ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশের অর্থনীতি*। এশিয়া পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থে বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার লংঘনের বিভিন্ন চিত্র এবং এর করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন*। বাংলাদেশ ইসলামি ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থে মজুদদারি সম্পর্কে ইসলামি বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রবন্ধ পর্যালোচনায় Systematic Literature Review পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা ঘাটতি (Research Gap) তুলে ধরা হয়েছে। এ লক্ষ্যে google scholar থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Food hoarding act in Bangladesh শব্দমালা দিয়ে সার্চ করলে ১৭০০ প্রবন্ধ প্রদর্শিত হয়; কিন্তু ২০০০ থেকে ২০২৪ সাল নির্ধারণ করে দিলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৫৭তে। পরবর্তীতে Food hoarding act in Bangladesh and Islam শব্দমালা দিয়ে Review articles অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায় ২৪৩টি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোর সারসংক্ষেপ পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলো প্রাথমিকভাবে বর্তমান গবেষণা সংশ্লিষ্ট হিসেবে প্রতীয়মান হয়-

- Rehman Sobhan, "Politics of food and famine in Bangladesh" *Economic and Political Weekly*, Vol. 14, No. 48 (Dec. 1, 1979), pp. 1973-1980 (8 pages)
- Md Rakib Sikder and Shariful Islam, "Right to Food and Food Security in Bangladesh: An Overview" *Asian Journal of Social Sciences and Legal Studies*, voll-5(5), September 2023, pp.125-134
- Saidul Islam, "Macroeconomic determinants of the demand for international reserves in Bangladesh" *SN Business & Economics, Springer*, vol. 1(2), 2021, pages 1-29

- Abdul Kader Mohiuddin, "An Extensive Review of Health and Economy of Bangladesh Amid Covid-19 Pandemic". *IJHCM (International Journal of Human Capital Management),* voll-5 (1), 2021, pp. 12-27
- Motamed-Jahromi, Mohadeseh et al. "Factors Affecting Panic Buying during COVID-19 Outbreak and Strategies: A Scoping Review." *Iranian journal of public health,* vol. 50(12), 2021, pp. 2473-2485
- Roumeen Islam, *Sharing the Benefits of Innovation-Digitization: A Summary of Market Processes and Policy Suggestions. Policy Research Working Paper* (Washington, DC.: World Bank, 2018)

চিহ্নিত প্রবন্ধগুলো পর্যালোচনায় খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশি আইন সম্পর্কে কোনো তথ্যের পর্যালোচনা পাওয়া যায়নি। একইসাথে বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবেচনায় খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হয়নি।

সর্বোপরি, সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় কোনো গবেষণা না হওয়ায় বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়।

সংজ্ঞায়ন

খাদ্য মজুদদারি : আভিধানিক অর্থে 'খাদ্য মজুদদারি' ইংরেজি Food Stockpiling ও Food hoarding এর পরিভাষা। 'মজুদদারি' শব্দটির আরবি পরিভাষা হলো اَلْإِحْتِكَارُ (আল-ইহতিকার)। মজুদদারির সংজ্ঞায়নে অর্থনীতিবিদ Seyed Kazem Sadr বলেন, Hoarding means withholding the supply of goods by producers or distributors in order to create an artificial gap between current supply and demand in the market, with intention to derive up prices.[২] অর্থাৎ, "মজুতদারির অর্থ হল বাজারে বর্তমান সরবরাহ এবং চাহিদার মধ্যে একটি কৃত্রিম ব্যবধান তৈরি করার জন্য উৎপাদক বা পরিবেশকদের দ্বারা পণ্যের সরবরাহ আটকে রাখা, যার উদ্দেশ্যে হলো পণ্যের দাম বাড়ানো।"

ইমাম আওযায়ি বলেন, "মওজুদকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বাজরের (স্বাভাবিক) কারবারে (অন্যায়ভাবে) হস্তক্ষেপ করে।"[৩] মজুদদারির একটি বৈশিষ্ট্য হলো বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা। এ বিষয়টি তুলে মজুদদারির সংজ্ঞায়ন করে আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া বলেন, "অধিক লাভের প্রত্যাশায় পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে গুদামজাত করে রেখে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করাকে বলে মজুদদারি। মজুদকৃত পণ্য সংকটকালে অধিক লাভে পশ্চাৎদ্বারে বিক্রি করাকে বলে কালোবাজারী।"[৪]

সর্বোপরি, যখন মজুদকৃত পণ্য খাদ্যসামগ্রী হয়, তখন তাকে খাদ্য মজুদদারি বলে। এককথায়, খাদ্য মজুদদারি বলতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্য যেকোনো খাদ্য পণ্য সঞ্চিত করা এবং সরবরাহ এমনভাবে হ্রাস করা, যার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায়; ফলশ্রুতিতে পণ্য মজুদকারী অধিকমূল্যে সঞ্চিত পণ্য বিক্রি করে।

খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে প্রচলিত আইন : বাংলাদেশে খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন ও বিধি রয়েছে। আইনগুলোর মধ্যে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুত বিরোধী) আইন ১৯৫৩', 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬', 'বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ

রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩', 'অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৮১', ১৯৬৪ সালের কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ও ১৯৮৫ সালের কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ (সংশোধিত) অধ্যাদেশের ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা মতে কৃষিজাত ও ভোগ্যপণ্যের ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য ও মজুদ পরিস্থিতি তদারকির ক্ষমতা রয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের। তবে এ আইনটির প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। পরবর্তীতে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ ২০১১' এর মাধ্যমে মজুদবিরোধী আইনের ধারাগুলো আরো কঠোর করা হয়। এছাড়া মজুদদারি নিয়ন্ত্রণে অপেক্ষাকৃত নতুন আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে- 'ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯', 'প্রতিযোগিতা আইন ২০১২', 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২০' ও 'খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩'। এছাড়াও বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪-এর কতিপয় ধারায় খাদ্যমজুদদারি প্রতিরোধে শাস্তিমূলক বিধান রয়েছে। ভোগ্যপণ্য নিয়ন্ত্রণে দেশে এসব আইন ছাড়াও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বাজার ব্যবস্থাপনা, তদারকির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের দ্রব্যমূল্য মনিটরিং সেল, খাদ্য অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে।[৫] এসকল আইন, বিধি এবং অধ্যাদেশ বর্তমান গবেষণায় খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের সাথে ইসলামি আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। এ সকল আইনে খাদ্য মজুদদারি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় এজন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। কিন্তু শাস্তি প্রদানই আইনের উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রতিকারই হলো শাস্তি প্রদানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। তাই খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে শাস্তির বিধানাবলির পাশাপাশি এ সকল আইনে খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে করণীয় নির্দেশনা রয়েছে।

খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে প্রচলিত আইনসমূহে নির্দেশিত বিষয়াদি

খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বাংলাদেশে গৃহীত ১১টি আইন ও বিধি পর্যালোচনা করে বিদ্যমান বিষয়াদি একটি সংক্ষিপ্ত সারণিতে নিচে তুলে ধরা হলো।

ক্রম	বিষয়বস্তু	আইন/বিধিমালা/নীতি
১.	খাদ্য মজুদের অনুমোদিত পরিমাণ	অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৫); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৬-এর ৩ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস. আর. ও. নং ১১৩-আইন/২০১১
২.	খাদ্য মজুদের অনুমোদিত সময়সীমা	বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-৩); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৬-এর ৩ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস. আর. ও. নং ১১৩-আইন/২০১১

৩.	মজুদদারি প্রতিরোধে বাজার তদারকি	অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৬ ও ৯); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৩.২.গ); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৩.১); বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-১৪); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ (ধারা-১২.৫, ১৩-২১); প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-৫-৮); নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩
৪.	ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ নিষিদ্ধ	প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-১৫)
৫.	মনোপলি বা পূর্ণ একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি নিষিদ্ধ	প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-১৫)
৬.	ওলিগপলি নিষিদ্ধ	প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-১৫)
৭.	জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ	প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-২১)
৮.	কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিষিদ্ধ	প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-১৬)
৯.	সরকার কর্তৃক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ	অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৩ ও ৪); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৩.২.খ); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৩.২.ক); অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ (ধারা-১২.৬)
১০.	ব্যবসা পরিচালনায় পরিবেশক নিয়োগ	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১
১১.	অনুসন্ধান ও তল্লাশি	অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-১০); বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-১৫); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-২৬); নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ (ধারা-৫২.১.ঙ); খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-১০)

১২.	মিথ্যা তথ্য প্রদান/বিভ্রান্তি সৃষ্টি	অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৯); খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-৭)
১৩.	মজুদদারির শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড	বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (ধারা-২৫.১)
১৪.	মজুদদারির শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড	অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৬.১); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৬); বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (ধারা-২৫.১); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-৪৫); খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-৪)
১৫.	মজুদদারির শাস্তি হিসেবে জরিমানা	অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৬.১) ; অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৬); বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (ধারা-২৫.১); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-৪৫) ; খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-৪)
১৬.	মজুদকৃত পণ্য বিক্রির আদেশ, প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা বা মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ	অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৮); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৩.২.ঘ); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৬.১); বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-১৭); বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (ধারা-২৫.২); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-২৭, ৩২-৩৫); খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-১১); ২৪. মজুদদারি শাস্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা ও মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ
১৭.	দ্রুত বিচার সম্পন্ন	মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসিলে বর্ণিত আইনের ক্রমিক নং-৮৫ ও ১২৬; ভোক্তা অধিকার আইনের ৫৭ থেকে ৬৪

প্রচলিত আইনসমূহে নির্দেশিত বিষয়াদি ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা

মজুদদারি প্রতিরোধে প্রচলিত আইনে নির্দেশিত বিষয়াদি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো-

১. খাদ্য মজুদের অনুমোদিত পরিমাণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে খাদ্য মজুদের অনুমোদিত পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৫) এবং অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৬-এর ৩ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস. আর. ও. নং ১১৩-আইন/২০১১ দ্বারা সরকার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মজুদের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে চাল/ধান পাইকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৩০০ মে.টন এবং খুচরা পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১৫ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে মজুদের সাধারণ নিয়ম হলো, এক বছরের প্রয়োজন পূরণের অতিরিক্ত পরিমাণ মজুদ করা নিষিদ্ধ। হাদিসে এক বছরের খাদ্য মজুদের দৃষ্টান্ত থেকে এ বিষয়টি অনুমিত। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ-

ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.) বনু নাযিরের খেজুর বিক্রি করতেন এবং তার পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জোগাড় করে রাখতেন।[৬]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনু দাকিকুল ঈদ (রহ.) বলেছেন,

فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الِادِّخَارِ لِلْأَهْلِ قُوتَ سَنَةٍ-

এ হাদিসে পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।[৭]

সুতরাং কোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মানুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অধিক মজুদ করা হারাম। যদিও এ বিষয়টি স্থান-কাল বিবেচনায় নির্ধারিত, কারণ মজুদদারি হারাম হওয়ার মূল কারণ হলো ভোক্তাদের অসুবিধা ও মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের প্রতি জুলুম করা। তাই যে পরিমাণ মজুদদারির ফলে ভোক্তাদের প্রতি জুলুমের সৃষ্টি করবে, সে পরিমাণ খাদ্য মজুদই হারাম হবে।

২. খাদ্য মজুদের অনুমোদিত সময়সীমা

বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে খাদ্য মজুদের অনুমোদিত সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-৩) এবং অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৬-এর ৩ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস. আর. ও. নং ১১৩-আইন/২০১১ দ্বারা সরকার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মজুদের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে চাল/ধান সর্বোচ্চ ৩০ দিন মজুদের বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে মজুদদারি হারাম হওয়ার কারণ হলো দীর্ঘ সময় পণ্য মজুদ রাখা। কিন্তু কতদিন গুদামে রাখা হলে তা মজুদদারি বলে গণ্য হবে তা নিয়ে ফকিহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন চল্লিশ দিন, তাদের দলিল,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখবে, আল্লাহ থেকে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন না।[৮]

মালেকি মাযহাবের আলেম আবুল আব্বাস বলেন,

(إِنْ رَصَدَ) رَبُّهُ (بِهِ) أَيْ بِالْعَرْضِ الْمَذْكُورِ (الْأَسْوَاقَ) أَيْ ارْتِفَاعَ الْأَثْمَانِ

উচ্চমূল্য হওয়ার অপেক্ষায় ব্যবসায়ী বাজার ও হাট পর্যবেক্ষণ করতে থাকা, ততদিন খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখা।[৯]

সুতরাং ইসলামি দৃষ্টিকোণে কতদিন পর্যন্ত পণ্য মজুদ রাখা যাবে, তার নির্ধারিত সীমা নেই; বরং ভোক্তাদের ক্ষতি হয় এবং ব্যবসায়ীর উচ্চমূল্য হওয়া পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি না করে বিক্রি করাই মজুদদারির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩. মজুদদারি প্রতিরোধে বাজার তদারকি

অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৬ ও ৯); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৩.২.গ); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৩.১); বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-১৪); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ (ধারা-১২.৫, ১৩-২১); প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-৫-৮); নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩-এ খাদ্যদ্রব্য মজুদ রেখে ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্স প্রদান, মজুদ গুদামের নিবন্ধন ইত্যাদিসহ মজুদদারি প্রতিরোধে বাজার তদারকির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেননা আইনের যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া আইনের কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না। মজুদদারি প্রতিরোধের জন্য সর্বাগ্রে সরকারিভাবে মজুদদারিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে এবং এ বিধান বাস্তবায়নে বাজার তদারকি করবে। উমর ফারূক (রা.) তাঁর খেলাফতকালে ব্যবসায়ীদেরকে বলেছিলেন, "আমাদের বাজারে কেউ মজুদদারি করবে না। যাদের হাতে অতিরিক্ত মুদ্রা আছে, তারা যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা সমূহ হতে কোন জীবিকা (খাদ্যশস্য) ক্রয় করে আমাদের উপর মজুদদারি করার ইচ্ছা না করে। তবে যে ব্যক্তি প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মকালে নিজের পিঠে বোঝা বহন করে (খাদ্যশস্য) আনবে সে উমরের মেহমান। আল্লাহর ইচ্ছায় সে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করুক এবং যেভাবে ইচ্ছা মজুদ করুক।"[১০]

ইসলাম মজুদদারিসহ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে সকল অনৈতিকতা প্রতিরোধে বাজার তদারকির নির্দেশনা দেয়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তথা উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য 'আল-হিসবাহ'[১১] ব্যবস্থাপনার আওতায় মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মহানবি (সা.) বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুনাফাখোরি ও মজুদদারিসহ রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক দুর্নীতি রোধে এ বিভাগ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ড. শাওকী আব্দুহু আস-সামী এ বিভাগের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, "এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (মুহতাসিব) যেমন রাষ্ট্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন, তেমনি তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও তদারকি করবেন। তিনি মজুদদারি, ধোঁকাবাজি, পণ্যে ভেজাল প্রদান ও সুদি কারবারসহ রাষ্ট্রের যাবতীয় অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। পাশাপাশি হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য হক ফিরিয়ে দিবেন।"[১২] রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনো কখনো নিজেই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন।[১৩] সুতরাং ইসলামি দৃষ্টিকোণে বাজার ব্যবস্থা তদারকির জন্য রাষ্ট্র বাজার-প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে এবং বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য কর্মচারী নিয়োগ করবে।

৪. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ নিষিদ্ধ

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ (ধারা-১৫) দ্বারা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মজুদদারি প্রতিরোধে এটি একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। কারণ ব্যবসায়ী শ্রেণির যোগসাজশের মাধ্যমেই পণ্য মজুদ ও অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি হয়ে থাকে। ইসলামে যেকোনো ষয়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ নিষিদ্ধ। যেমন- কৃত্রিমভাবে বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশে পণ্যের প্রকৃত মূল্য থেকে হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় নিষিদ্ধ করে হাদিসের বাণী,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ اَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِمَّا اَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَاِمَّا اَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) (একবার বাজারে) হাতিব ইবন আবি বালতা (রা.)-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি বাজারে তার কিশমিশ বিক্রয় (বাজার দর হতে সস্তা মূল্যে- মুনাক্কা) করছিলেন। উমর (রা.) তাকে বললেন, হয়তো মূল্য বাড়িয়ে (ন্যায্য মূল্যে) বিক্রয় করুন, নচেৎ আমাদের বাজার হতে পণ্য গুটিয়ে নিন।[১৪]

ইসলাম চুক্তি রক্ষা করতে উৎসাহ দেয়, কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে চুক্তি করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেকোনো চুক্তি অবৈধ হবার বড় কারণ غرر বা ধোঁকা। আর ধোঁকা দেয়া শরী'আহর দৃষ্টিতে হারাম। যেহেতু এখানে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য থাকে ক্রেতাদেরকে প্রতারিত করা। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে প্রতারণা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ব্যবসায়ীদের সাথে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশে একজন ক্রেতা সেজে অধিক মূল্যে দরদাম করে প্রকৃত ক্রেতাদেরকে প্রতারিত করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামে এ ধরনের যোগসাজশ নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا، .

আবু হুরায়রাহ (রা.) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে দালালি করার উদ্দেশে) দাম বাড়িয়ে বলবে না।[১৫]

৫. মনোপলি বা পূর্ণ একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি নিষিদ্ধ

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা-১৫ দ্বারা মনোপলি বা পূর্ণ একচেটিয়া বাজার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মজুদদারি প্রতিরোধে এটি একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। কারণ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এ পদ্ধতির সুযোগ থাকলে মজুদদারির সুযোগ তৈরি হয়। মনোপলির বিধান সম্পর্কে চার মাযহাবের ইমামদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। মালেকি মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো বাজারে দামবৃদ্ধির প্রভাবে কোনো ব্যক্তির পণ্য মজুদ করা, তবে খাদ্যপণ্য এর অর্ন্তভুক্ত নয়। হানাফী মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো বাজার হতে কোনো খাদ্যপণ্য ক্রয়করে দামবৃদ্ধি পর্যন্ত ৪০ দিনের অধিক সময় পর্যন্ত মজুদ করা। শাফেয়ি মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো বাজারের সকল পণ্য ক্রয় করে ভোক্তাদের প্রয়োজনের সময় বেশি মূল্যে তা বিক্রি করা। হাম্বলি মাযহাবের মতানুসারে মনোপলি হলো নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্য কিনে নেয়া, যার ফলে ভোক্তারা সমস্যার মুখোমুখি হয়।[১৬]

চার মাযহাবের বক্তব্যের আলোকে মনোপলির মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে- ১. এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো সকল পণ্য একজনের হাতে কুক্ষিগত করা, ২. এর ফলে ভোক্তারা তাদের

প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য গুণাগুণ বিবেচনায় অধিক মূল্যে ক্রয় ব্যতীত অন্য আর কোনো মাধ্যম থাকে না, ৩. বাজারে পণ্যের সংকট সৃষ্টি করে।[১৭] মনোপলি নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে (المصالح) মাসালেহ, সাদ্দুয যারায়ে (سد الذرائع) ও মাকাসেদুস শরিয়াহ (مقاصد الشرعية) ইত্যাদি প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মাসালেহ হলো কোনো বিধানের ঐ কল্যাণচিন্তা যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শরিয়াত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা আসেনি এবং যা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও কোনো শারয়ি দলিল বিধৃত হয়নি।[১৮] মনোপলি নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মাসালেহ-এর তিনটি প্রকারই প্রয়োগযোগ্য- ১. সকল ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য المصالح المعتبرة তথা বিবেচ্য কল্যাণ, ২. বাজারে পণ্যের সংকট সৃষ্টি রোধ করার জন্য المصالح الملغة তথা পরিত্যাজ্য কল্যাণ, ৩. ক্রেতা-বিক্রেতা এবং সরকার সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে المصالح المرسلة তথা সাধারণ কল্যাণ, কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশেষ সহায়তার জন্য নয়।

সাদ্দুয যারায়ে হলো এমন বৈধ উপকরণ রুদ্ধ করা, যার দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই অধিক প্রাধান্য পায়।[১৯] সাদ্দুয যারায়ের মূলনীতির আলোকে মনোপলি নিষিদ্ধ, কারণ মনোপলিতে দৃশ্যমান এক ব্যক্তি দ্বারা পণ্য ক্রয় বৈধ হলেও বাজারের সকল পণ্য ক্রয় বৈধ ব্যবসাকে অবৈধ মজুদদারির দিকে ধাবিত করে। একই সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন বৈধ হলেও মনোপলির মাধ্যমে অধিক মূল্যে ক্রেতারা পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি, জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণের পথে বাধা হওয়ায় সাদ্দুয যারায়ের আলোকে মনোপলি নিষিদ্ধ।[২০]

মাকাসিদুশ শরিয়ার মূলনীতির আলোকেও মনোপলি নিষিদ্ধ। ইমাম আল-গাযালি মাকাসিদুশ শরিয়ার ভিত্তিতে বিধান প্রণয়নে তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন- ১. কল্যাণ অত্যাবশ্যক হওয়া, ২. কল্যাণের পরিধি সার্বজনীন হওয়া, ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ ধর্তব্য নয়, ৩. কল্যাণ বাস্তবসম্মত হওয়া, ধারণাপ্রসূত না হওয়া।[২১] ইমাম গাযালির তিনটির শর্তের উপযোগিতা থাকায় মনোপলি নিষিদ্ধ। মাকাসিদুশ শরীয়ার পাঁচটি বিষয়ের সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষার্থেও মনোপলি নিষিদ্ধ।[২২]

৬. ওলিগপলি নিষিদ্ধ

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা-১৫ দ্বারা ওলিগপলির নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এ পদ্ধতির সুযোগ থাকলে মজুদদারির সুযোগ তৈরি হয়। মজুদদারি প্রতিরোধে একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওলিগপলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও তার সহচরগণ ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা যখন ঐক্যবদ্ধ হবে আর সাধারণ মানুষ তাদের পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা এর মূল্য বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং বিক্রেতারা যারা তাদের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া পণ্য বিক্রি করবে না বলে সিন্ডিকেট করেছে, তাদের প্রতিহত করাই শ্রেয়।[২৩] এছাড়াও মনোপলি যে সকল কারণে নিষিদ্ধ, ওলিগপলিতেও সে সকল কারণ বিদ্যমান থাকায় ওলিগপলি নিষিদ্ধ।

৭. জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা-২১ দ্বারা জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এ পদ্ধতির সুযোগ থাকলে মজুদদারির সুযোগ তৈরি হয়। মজুদদারি প্রতিরোধে একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতিতেও দাম

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন,

قد صرح الفقهاء بانه لا تترك التجار يشتركون فيما بينهم لتحكم الاسعار

ফিকাহবিদরা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার দেয়া যায় না।[২৪]

জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ কেননা এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদেরকে উচ্চদামে পণ্য কিনতে বাধ্য করে, যা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার সামিল। ইবনুল কাইয়িম এ সম্পর্কে বলেন, কোনো এক এলাকার লোক বা এক গোত্রের লোক কোনো খাদ্যশস্য বা অন্য কোনো বস্তু বিক্রি করবে, অন্য কোনো লোক তা বিক্রি করবে না, সমাজে এমন নিয়ম চালু করাই হচ্ছে শ্রেণি নির্ধারণে একচেটিয়াকরণ। তাদের কাছেই এসব বিক্রি করা হবে, তারপর তারা তাদের খুশিমতো তা বিক্রি করবে। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর জমিনে এক অন্যায় ও অপরাধ, বাড়াবাড়ি ও বিশৃঙ্খলা।[২৫]

৮. কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিষিদ্ধ

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা-১৬ দ্বারা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এ পদ্ধতির সুযোগ থাকলে মজুদদারির সুযোগ তৈরি হয়। মজুদদারি প্রতিরোধে একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্তৃত্বময় অবস্থানের সুযোগ নিয়ে শহরবাসী কর্তৃক গ্রামবাসীর কাছ থেকে মাল ক্রয় করে নেওয়াও কর্তৃত্বময় (Dominant) অবস্থানের অপব্যবহারের উদাহরণ। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে تَلَقِّى الْجَلَب বলে। এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা তার পণ্য নিয়ে বাজারে প্রবেশের পূর্বেই তার নিকট থেকে দালালরা ক্রয় করে। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, লাইস ইবন সাদ, এবং মালেকি মাযহাবের কতিপয় আলেমের মতে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই।[২৬] তাদের দলীল হলো-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْاَسْوَاقَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে পণ্য সামগ্রী বাজারে প্রবেশের পূর্বে ঐগুলো লুফে নেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।[২৭]

ইমাম আওযায়ি, সুফিয়ান সাওরি, আবু হানিফা, শাফেয়ি, মালেক, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার (রহ.)-এর মতে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা যদি শহরবাসী অথবা গ্রামবাসী অর্থাৎ ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবে মাকরূহ। আর যদি গ্রামবাসী অথবা শহরবাসী কেউই ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তবে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং বাজারে পৌঁছা পর্যন্ত বিক্রেতার خِيَار (খিয়ার) থাকবে।[২৮] এ সম্পর্ক হাদিসের বাণী,

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَاِذَا اَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ

ইবনে সিরিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই নবি করিম (সা.) বলেছেন, তোমরা অগ্রসর হয়ে কোনো বিক্রেতার সাথে মিলিত হয়ো না। যে ব্যক্তি কোনো কিছু ক্রয় করার জন্য তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তবে বাজারে পৌঁছার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার খিয়ার থাকবে।[২৯]

উপরোক্ত দুটি বর্ণনার সমন্বয় সাধন করে ইমাম ত্বহাবি বলেন,

> لَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى غَيْرِ الْمُتَلَقِّينَ الْمُقِيمِينَ فِي الْأَسْوَاقِ. وَيَكُونُ مَا أُبِيحَ مِنَ التَّلَقِّي , هُوَ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَسْوَاقِ.
>
> সুতরাং শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য যে ক্ষেত্রে تَلَقِّى الْجَلَب ক্ষতিকর হবে, সে ক্ষেত্রে তো তা নিষিদ্ধ হবে। আর যে ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে না সে ক্ষেত্রে জায়িয হবে।[৩০]

৯. সরকার কর্তৃক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ

মজুদদারি প্রতিরোধে সরকার অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৩); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৩.২.খ); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৩.২.ক) ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ (ধারা-১২.৬) ইত্যাদি আইন ও বিধি দ্বারা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। একইসাথে অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৪) দ্বারা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছে। মূলত মজুদদারি ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে কৃত্রিম সংকট করে অধিক মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করে থাকে। তাই সরকার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম মজুদদারি বন্ধে পণ্যের মূল্য নির্ধারণকে একটি প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ইসলামি আইনে মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বোঝায় যাতে লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী গোষ্ঠীর যেন ক্রয় করতে কষ্ট না হয়। বিক্রেতা তার উৎপাদন খরচের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে লভ্যাংশসহ পণ্য বিক্রয় করে। ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চললে পণ্যের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেননি।[৩১]

শাফেয়ি ও হাম্বলি ফকিহগণ মনে করেন, দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হারাম।[৩২] তবে এ সম্পর্কে ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, "উপরোক্ত হাদিসের অর্থ এ নয় যে, সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। জুলুম করে যদি জনসাধারণের উপর এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় তবে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ হবে হারাম। একইসাথে জনগণের মাঝে ন্যায় বিচার কার্যকর করার জন্যে যদি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন, প্রচলিত দামে বিক্রয় করতে বিক্রেতাকে বাধ্য করা অথবা প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি নেয়া থেকে বাধা দেয়া হয় তবে তা শুধু জায়েয-ই নয়; বরং ওয়াজিবও বটে।[৩৩]

সর্বোপরি, মুসলিম সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ (মাসলাহা) বিবেচনায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মত হলো, শাসক বেশি মূল্যে অথবা কম মূল্যে বিক্রয় নিষিদ্ধ করার অধিকার রাখেন।[৩৪] শাসকের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ হলেও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ হবে না। ফকিহগণ মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম তথা সরকারি কর্মকর্তার কর্তব্য হবে উক্ত (নির্দিষ্ট) পণ্যের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করা এবং অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে তিনি মূল্য নির্ধারণ করবেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিভাবে পণ্য ক্রয় করে এবং কিভাবে বিক্রি করতে চায়? এভাবে তাদের দাবির বিষয়টি নিয়ে

তাদের সাথে আলোচনা করবেন আর দ্রব্যমূল্য জনগণের উপযোগী করার চেষ্টা করবেন যেন ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকলে সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।[৩৫]

১০. ব্যবসা পরিচালনায় পরিবেশক নিয়োগ

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ দ্বারা দীর্ঘদিনের ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) প্রথা বাতিল করা হয়। ডিও প্রথার মাধ্যমে আমদানিকৃত কিংবা যেকোনো ভোগ্যপণ্য বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তৃণমূল পর্যায়ে সরবরাহ হতো। ডিও স্লিপের কারবারিতে মুষ্টিমেয় বড় ব্যবসায়ী জড়িত থাকায় হাতবদলের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায় কিংবা ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছতে পণ্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যেত। কিন্তু পরিবেশক নিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায় থেকে স্থানীয় বড় ব্যবসায়ীরা পরিবেশক হওয়া এবং নির্ধারিত এলকায় সম্ভাব্য বিক্রয়যোগ্য পরিমাণের অধিক পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থেকে ছাড় না পাওয়ায় মজুদদারির সুযোগ সংকোচিত হয়। কিন্তু বর্তমানেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের পরিচিতি অথবা নামে বেনামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে পরিবেশক নিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পণ্য মজুদ করা হচ্ছে। তবে যদিও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১-এর ধারা-৫ দ্বারা প্রতারণামূলক প্ররিবেশক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বোপরি, পরিবেশক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা মজুদদারি বন্ধে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক ব্যবসা পরিচালনায় পরিবেশক একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। পরিবেশক হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় চুক্তিবদ্ধ কোম্পানি উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচনাকারী প্রতিষ্ঠান। বিশেষত, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদিত পণ্য বৃহৎ ব্যবসা এলাকায় বৃহৎ সংখ্যক ভোক্তার নিকট খুচরা পর্যায়ে পণ্য পৌঁছে দিতে পরিবেশক মূল উৎপাদকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবসায়িক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরিবেশক উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্যের সরবরাহ পায় এবং তা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। তবে পরিবেশক নিয়োগ ও এর কার্যাবলির ভিন্নতার জন্য অনেকক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত 'বায় সালাম' ও 'বায় মুয়াজ্জাল' কোনটির সাথেই প্রচলিত পরিবেশক নিয়োগ ও ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার মিল থাকে না। পরিবেশকের কার্যাবলির কোনো নির্ধারিত রূপ নেই, ফলে কোম্পানিগুলো নিজেদের সুবিধামতো পরিবেশকের সাথে চুক্তি করে থাকে। তবে বেশিরভাহ পরিবেশক নিম্নোক্তভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে-

১. চুক্তি অনুযায়ী মূল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ও মজুদকরণ।

২. চুক্তি অনুযায়ী পরিবেশক নির্ধারিত পণ্য প্রচলিত বাজারদরের থেকে কম মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ পায়।

৩. পরিবেশক স্থানীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য মজুদ করেন এবং নির্ধারিত এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রি করেন।

৪. মজুদকৃত পণ্যের দায়-ভার পরিবেশকের উপর বর্তায়।

পরিবেশকের কার্যাবলি পর্যালোচনায় ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে পরিবেশক উৎপাদকের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকবে। চুক্তি রক্ষার্থে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ হচ্ছে,

ۚ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

অর্থ- হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।[৩৬]

পরিবেশক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে এমন ক্ষেত্রে উৎপাদক কেবল নিজ স্বার্থ বিবেচনা করে পণ্য পরিবেশককে দিবে না; বরং সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে পরিবেশককে অবহিত করবে, সতর্ক করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ اَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর, পরে যদি তা দুর্যোগ কবলিত হয়, তবে তোমার জন্য বৈধ হবে না যে, তুমি তার নিকট হতে মূল্য আদায় করবে। তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে কিসের বিনিময়ে তুমি মূল্য গ্রহণ করবে?[৩৭]

১১. অনুসন্ধান ও তল্লাশি

অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-১০); বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-১৫); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-২৬); নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ (ধারা-৫২.১.ঙ) এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-১০) দ্বারা মজুদদারি প্রতিরোধে অনুসন্ধান ও তল্লাশি চালানোর ক্ষমতা রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। ইসলামি দৃষ্টিকোণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাদ্য মজুদদারি সংশ্লিষ্ট অপরাধ তদন্তে অনুসন্ধান ও তল্লাশি চালাতে পারে প্রশাসন। হযরত উমর (রা.) নিজেই খাদ্য মজুদদারি বিষয়ে বাজারে অনুসন্ধান চালাতেন।[৩৮] তবে অনুসন্ধান ও তল্লাশি করার সময় বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন নিরাপরাধ ব্যক্তি হয়রানির শিকার না হয় এবং অযাচিতভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন না হয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "ওমর ফারুক (রা.) খলিফা থাকা অবস্থায় রাতে এক ব্যক্তির ঘরে ঢুকে দেখেন, তার সামনে মদ ও গায়িকা। শক্ত আচরণ করতে যেতেই লোকটা বলে বসল, ওমর আমার ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকেছেন, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় 'অনুসন্ধান' করছেন, এটা তো নিষিদ্ধ। ওমর (রা.) বিষয়টা বুঝতে পেরে কাপড় ধরে অনুতপ্তের মতো কান্না করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। নিজেকেই বললেন, এটা কি করলে ওমর, আল্লাহ যদি তোমাকে ক্ষমা না করেন? ঐ লোক কিছুদিন ওমরের মজলিস এড়িয়ে যেতে থাকেন। একদিন পেছনে এসে বসলে ওমর তাঁকে ডাকলেন এবং অনুচ্চস্বরে বললেন, আপনার কথা আমি কাউকে বলিনি। আমার সাথে ঐদিন ইবনে মাসউদ ছিল তাকেও বলিনি। ঐ লোক এবার কসম খেয়ে বলল, আমি এমন কাজ আর করিনি।"[৩৯]

১২. মিথ্যা তথ্য প্রদান অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি

অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৯) ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-৭) দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যক্তির নিকট মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিভ্রান্ত করা অথবা পণ্যের মজুদ পরিমাণ বা

সময়সীমা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা নিষিদ্ধ। আল্লাহর রাসুল (সা.) ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যা বলা পরিহার করার নির্দেশ দেন। শপথ করে পণ্য বিক্রি করার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

> عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
>
> আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কোনো ধরনের কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন- যে তার ব্যবসায়িক পণ্যকে মিথ্যা কসম খেয়ে বিক্রি করে।[৪০]

১৩. মজুদদারির শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড

বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ ধারা-২৫.১-এ মজুদদারি শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। মজুদদারির ফলে সাধারণত কারো মৃত্যুর ঘটনা ঘটে না, তবে খাদ্য না পেয়ে কারো মৃত্যু হলেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামি দৃষ্টিকোণে এ ধরনের হত্যাকে 'কারণবশত হত্যা' বলে। এটি এমন এক ধরনের হত্যা যাতে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়। এ ধরনের হত্যায় অপরাধীর হত্যা করার ইচ্ছা থাকে না; বরং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছে। এই প্রকার হত্যায় ইসলামি শাস্তি হলো, এ প্রকারের হত্যায় মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে 'দিয়াত' ওয়াজিব হবে।[৪১] হত্যাকারীর পরিবার নিহতের পরিবারকে একশ উট বা এক হাজার দিনার অথবা দশ হাজার দিরহাম পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

> وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
>
> জীবনহানিতে দিয়াত হলো ১০০ উট।[৪২]

তবে উপরিউক্ত শাস্তির বিধানে নিহতের পরিবার ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর পরিবারকে (অর্থ জরিমান নিয়ে অথবা অর্থ জরিমানা ছাড়া) ক্ষমা করে দিতে পারে।

১৪. মজুদদারির শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড

অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৬.১); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৬); বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (ধারা-২৫.১); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-৪৫) এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-৪) দ্বারা মজুদদারির শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ডের বিধান দেয়া হয়েছে। মজুদদারির শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে ইসলামি নির্দেশনা হলো, মজুদদারির ব্যাপারে ইসলামের 'হুদুদ'[৪৩] তথা নির্ধারিত শাস্তি নেই, তবে 'তা'যিরি'[৪৪] শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কেননা মজুদদারি ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, ইসলামি বিধি-বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটনের শাস্তি হিসেবে 'তা'যিরি' শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ আইনবিদ একমত পোষণ করেছেন।[৪৫] সুতরাং 'তা'যিরি' শাস্তির আওতায় কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়া ছাড়াও বিচারক নির্বাসন, বয়কট, বেত্রাঘাতসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন। এ

সম্পর্কে ড. আহমদ আলী বলেন, 'তা'যীর' হিসেবে অপরাধীদেরকে প্রয়োজনে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম বা বিনা শ্রমে কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কখনো পরিস্থিতি এরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, অপরাধীকে বন্দী করে রাখা না হলে তার কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলে তাকে যেমন তার কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে, তেমনি সে সাথে এ আশাও করা যেতে পারে, কারাগার থেকে মুক্তির পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে কোনো অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে।"[৪৬]

১৫. মজুদদারির শাস্তি হিসেবে জরিমানা ও জরিমানার অংশ অভিযোগকারীকে প্রদান

অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৬.১) ; অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী আইন, ১৯৫৭ (ধারা-৬); বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (ধারা-২৫.১); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-৪৫) ; খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-৪) এবং নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ (ধারা-৬২) দ্বারা মজুদদারির শাস্তি হিসেবে জরিমানা ও জরিমানার অংশ অভিযোগকারীকে প্রদান করার নির্দেশনা রয়েছে। প্রচলিত আইনে মজুদদারির শাস্তি হিসেবে জনগণের অধিকার বিনষ্টকারীর কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়ার বিধান দিয়েছে। ইসলামি আইনে অর্থদণ্ডের শাস্তি দেয়ার বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, তা'যির হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়, কেননা এ বিষয়ে শরিয়তের নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) ও অধিকাংশ মালিকি মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয, যদি তাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে।[৪৭] ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।[৪৮] এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

> مَنْ اَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ
>
> অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোনো উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয়নি, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোনো জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।[৪৯]

তাছাড়া খুলাফা রাশিদুন যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন।[৫০] এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়। সর্বোপরি সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'তা'যিরি' শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারে। তবে আরোপিত অর্থ অভিযোগকারীকে দেয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট শরয়ি নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

১৬. মজুদকৃত পণ্য বিক্রির আদেশ, প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা বা মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ

অত্যাবশ্যক পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মওজুদ নিরোধ) আইন, ১৯৫৩ (ধারা-৮); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৩.২.ঘ); অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ (ধারা-৬.১); বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী (মওজুদ রাখা ও বিলি-বন্দেজ) আদেশ, ১৯৭৩ (ধারা-১৭); বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (ধারা-২৫.২); ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-৩২-৩৫); খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (ধারা-১১) এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (ধারা-২৭) দ্বারা মজুদদারি শাস্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা বা মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের নির্দেশনা রয়েছে। মজুদদারিকে মজুদকৃত পণ্য বিক্রির আদেশ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা বা মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের ব্যাপারে ইসলামি নির্দেশনা হলো- এ কথায় সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত, বিচারক বা প্রশাসন মজুদদারকে মজুদকৃত বস্তু উন্মুক্ত বাজারে বিক্রির জন্যে নির্দেশ দেবে। কিন্তু সে যদি সে নির্দেশ পালন না করে তাহলে তাকে কি বিক্রয় করতে বাধ্য করা হবে? তার ওপর কি বল প্রয়োগ করা হবে? এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত হচ্ছে, যেহেতু সাধারণ লোকের কষ্ট হচ্ছে না, তাই মজুদদারকে পণ্য বিক্রি করতে তারা বাধ্য করবে না। তবে যদি বিক্রি করা হতে বিরত থাকে তবে তারা তাকে শাস্তি দেবে। যারা বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী তাদের মধ্যে কারো কারো অভিমত হচ্ছে, প্রথমেই মজুদদারের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে। অপর দলের কথা হচ্ছে, প্রথমে মজুদদারির ক্ষতি সম্পর্কে বোঝানো হবে, ভীতি প্রদর্শন করা হবে, সবশেষে বল প্রয়োগ করা হবে। ফকীহদের মতামত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, মজুদদারি রোধ করার বিষয়টি জনকল্যাণ ও জন স্বার্থসংশ্লিষ্ট। তাই এটি শরিয়তসম্মত শাসননীতির আওতায় রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।[৫১]

মজুদদারকে বিচারক নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করার আদেশ দিবেন। কিন্তু নির্ধারিত মূল্য অমান্য করে যদি মজুদদারি অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে সেক্ষেত্রে মালেকি মাযহাবে ফকিহদের মতে, কেউ যদি মূল্য বাড়িয়ে দেয় অথবা কমিয়ে দেয় তাহলে বাজারমূল্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তাকে আদেশ করা হবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তাকে বাজার থেকে বের করে দেওয়া হবে।[৫২] উমর (রা.) খাদ্য মজুদকারীদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।[৫৩] উমাইয়া বিন ইয়াযিদ আল-আসাদী ও মুযায়না গোত্রের জনৈক আযাদকৃত দাস মদিনায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করত। ওমর (রা.) তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হিসাব রক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়, আর কোনো কোনো ব্যবসায়ী সীমা অতিক্রম করে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে, তবে কি এ জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে? তিনি উত্তর দিলেন, যদি কোনো ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাচারিতা করে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে তবে এ অপরাধে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তির পরিমাণ, শাস্তির ধরন কী হবে, তা বিচারক বা তার প্রতিনিধি সাব্যস্ত করবেন। হয়তো আটক করা হবে বা বেত্রাঘাত করা হবে অথবা আর্থিক শাস্তি অথবা বাজার থেকে বহিষ্কার করা (ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা) ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হবে।[৫৪]

১৭. দ্রুত বিচার

মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসিলে বর্ণিত আইনের ক্রমিক নং-৮৫ ও ১২৬ দ্বারা মজুদদারি প্রতিরোধ সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পর যথাশীঘ্র অভিযোগ আরোপ এবং দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করা সমর্থন করে। কেননা এতে অত্যাচারের শিকার ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রতীক্ষার অবসান ঘটে এবং অত্যাচারীর ত্বরিত শাস্তি হয় এবং অত্যাচারও বন্ধ হয়। কিন্তু ত্বরিতগতি অবলম্বন অর্থ শুনানি, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন, সাক্ষ্যগ্রহণ ইত্যাদি সীমিত করা বা এড়িয়ে যাওয়া নয়; বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার শর্তে বিচারক কোনো প্রকার গড়িমসি না করে যত দ্রুত বিচারকার্য শেষ করা যায় এটিই দ্রুত বিচার। শরিয়াহ আইনের দৃষ্টিতে বিচার দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করাই স্বাভাবিক অবস্থা বা সাধারণ নীতি। মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে লিখিত পত্রে ওমর (রা.) বলেন, “যার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি (অভিযুক্ত), তার ব্যাপারটি দ্রুত দেখবে। কেননা তার বন্দিত্ব দীর্ঘায়িত হলে সে অধিকার বঞ্চিত হবে।”[৫৫] দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইয্যুদ্দীন ইব্‌ন আব্দুস সালাম বলেন, “বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং প্রকৃত হকদারকে তার অধিকার পৌঁছে দেয়া। তাই যত দ্রুত সম্ভব বিচারকার্য সম্পন্ন করা ও ত্বরিৎ পন্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক, যাতে প্রকৃত হকদারকে অধিকার প্রদান এবং জালিম ও অধিকার খর্বকারীর জুলুমের অবসান করা যায়।”[৫৬]

সুপারিশমালা

খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো-

ক. বিভিন্ন আইনে নির্দেশিত কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা

বিভিন্ন আইনের নির্দেশনা অনুসারে কমিটিসমূহ গঠন, নিয়মিত সভা আহবান এবং আইনে বর্ণিত কমিটির কার্যাবলি সম্পন্ন করা। খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধের সাথে বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন কমিটি গঠনের নির্দেশনা থাকলেও সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয় না। যেমন, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, জাতীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি, জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি, উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অধীন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল। এ সকল কমিটি যথাযথভাবে গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনার উপর মনোনিবেশ করতে হবে, কেননা বাজার তদারকিতে আইনে নির্দেশিত কমিটিসমূহ গঠন অন্যতম একটি পূর্বশর্ত।

খ. আইনের বিষয়াদি তদারকি ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন

আইনের বিভিন্ন ধারায় পারস্পরিক বিরোধ যেমন, বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ এর ২৫.১ ধারায় মজুদদারির জন্য মৃত্যুদণ্ড থাকলেও ২০০৯ সালের আইনে কেবল কারাদণ্ড বা জরিমানার বিধান রয়েছে, মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর ৮.১ ধারা- “এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে দণ্ডই নির্ধারিত থাকুক না কেন, দুই বছর এর অধিক কারাদণ্ড এই আইনের অধীন আরোপ করা যাইবে না।” ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর যে আইনের অধীনে পরিচালিত তাতে মজুদদারি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে ৭টি বিভাগী কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয় থেকে পরিচালিত এ সংস্থার নজরদারী

থেকে মজুদদারি বিষয়টি অনেক সময় অবহেলিত হয়। একই সাথে মজুদদারি প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের সুষ্ঠু এবং কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। রাজনৈতিক বা অন্য কোনো বিবেচনায় কোনো অপরাধীকে ছাড় দেয়া যাবে না। মজুদদারি প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিভিন্ন মামলার দীর্ঘসূত্রিতা দূর করে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

গ. বিদ্যমান আইনের সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশমালা

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬০ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এই আইনের অধীন অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অন্যথায় অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। অভিযোগ দায়েরের সময়সীমা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, কেননা ইসলামি দৃষ্টিকোণে সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে যেকোন সময়ই প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে ভোক্তার। ভোক্তা অধিকার আইনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের অধিকার সংযোজন করা প্রয়োজন।

উপসংহার

খাদ্যদ্রব্যের মজুদদারি বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনার অস্থিরতার বড় একটি কারণ। মজুদদারি এদেশের বাজারে একটি সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনায় মজুদদারি প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন যুগোপযোগী এবং কার্যকর বলেই বিবেচিত। আইনে পণ্যের সর্বোচ্চ মজুদের হার এবং সর্বোচ্চ মজুদের সময়সীমা নির্ধারণ, মজুদদারির শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ, লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। আইনগত সংস্কার এবং প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং বাজার তদারকিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হলে মজুদদারি প্রতিরোধ কার্যক্রম তরান্বিত হবে। ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে মজুদদারিদের পরকালীন কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি এবং 'তা'যিরি' শাস্তির আওতায় দুনিয়াবি শাস্তির নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিদ্যমান আইনসমূহের বিষয়াদি ইসলামি দৃষ্টিকোণে সচেতন করা এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে গবেষণায় নির্দেশিত পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন খাদ্য মজুদদারি প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Correlational research method is a research method that aims to determine the relationship between two or more variables without any attempt to influence them. [J. Fraenkel, N. Wallen & H. Hyun, *How to Design and Evaluate Research in Educations* (Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2012), p. 311]

২. Seyed Kazem Sadr, "Chapter 26: Hoarding of Goods, Money and Financial Assets", *Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance* (Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020), p. 526-543

৩. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ৯৫

৪. আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন* (ঢাকাঃ কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ১৪৯

৫. মো. রেজাউর রহিম, আইন আছে প্রয়োগ নেই, *ভোরের আকাশ* (ঢাকা : বীর মুক্তিযোদ্ধা মনোরঞ্জন ঘোষাল সম্পাদিত ও এসএম আব্দুল্যাহ নুরুজ্জামান প্রকাশিত, ২৯ মে, ২০২২), পৃ. ১

৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারি, *আস সহিহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং : ৫৩৫৭

৭. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১ হি.), খ. ৯, পৃ. ৬২৪

৮. আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, *আল মুসনাদ* (মিশর : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১), হাদীস নং : ৪৮৮০

৯. আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ খুলুতী, *শারহে সগীর* (বৈরুত : দারুল মাআরিফা, তা.বি), খ. ১, পৃ. ৬৩৯

১০. মালেক বিন মালেক বিন আনাস বিন আমের মাদানী, *আল মুয়াত্তা* (বৈরুত : মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, তাবি), হাদিস নং : ১৩৪৮

১১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিমিত্ত শরি'আহ আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে শরি'আহভিত্তিক জীবন-যাপনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে আল-হিসবাহ বলে। [মোঃ জাফর আলী, 'উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা', *ইসলামি আইন ও বিচার*, ভলিউম-১৮, সংখ্যা- ৬৯ ও ৭০, পৃ. ৪৩]

১২. ড. নূরুল ইসলাম, *ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরি, মজুদদারি ও পণ্যে ভেজাল* (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০২০), পৃ. ৫১

১৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আন্ নিসাপুরী, *আস সহিহ* (বৈরুত : দারু ইহইয়া আত্ তুরাছ আল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং : ১০২

১৪. ইমাম মালেক, *পূর্বোক্ত*, হাদিস নং : ২৩৯৯

১৫. ইমাম মুসলিম, *পূর্বোক্ত*, হাদিস নং : ১৪১৩

১৬. N. Alotaibi Musaed, *Does the Saudi Competition Law Guarantee Protection to Fair Competition? A Critical Assessment* (Thesis, Doctor of Philosophy Degree). (Lancashire(UK): University of Central Lancashire, 2010), p. 37-38

১৭. *ibid*, p. 38

১৮. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামী আইনের উৎস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩), পৃ. ১৫০

১৯. মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সাঈদ শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়ুম আজজাওযিয়্যাহ, *আততুরুকুল হুকমিয়্যা ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যা* (মিসরঃ মাকাতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১০৮

২০. Johan Arvie, 'Monopoly Prohibition According to Islamic Law: A Law and Economics Approach', *Mimbar Hukum*, 2015, Vol-27, No-1, p. 170

২১. আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদআল গাযালি, *আল মুস্তাফা ফী ইলমিল উসুল* (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলামিয়াহ, ১৪১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ২৯৬

২২. Johan Arvie, *op.cit*, p. 170

২৩. ইবনে তাইমিয়া, *আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম* (বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ১৭

২৪. আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪০

২৫. মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সাঈদ শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়ুম আজজাওযিয়্যাহ, *আততুরুকুল হুকমিয়্যা ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যা* (মিসরঃ মাকাতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২৪৫; উদ্ধৃত, সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ (ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ) ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন (তৃতীয় খণ্ড)* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৭), পৃ. ৫৫৫

২৬. আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ বিন আব্দুল মালেক আত তাহাবী, *শরহে আমানিউল আছার* (সৌদি আরব : আলামুল কুতুব, ১৪১৪ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫৮

২৭. ইমাম আহমদ, *পূর্বোক্ত*, হাদিস নং : ৪৭৩৮

২৮. ইমাম তাহাবী, *পূর্বোক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫৫৮

২৯. ইমাম মুসলিম, *পূর্বোক্ত*, হাদিস নং : ১৫১৯

৩০. ইমাম তাহাবী, *পূর্বোক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৮

৩১. আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানি, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), হাদিস নং : ৩৪৫১

৩২. আবু মুহাম্মদ মুফিকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনুল কুদামা, *আল মুগনী* (কাহেরা : মাকতাবাতুল কাহেরা, ১৯৬৮), খ. ৩, পৃ. ১৬৪

৩৩. ইউসুফ আল- আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ২৮৬-২৮৭

৩৪. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ (ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ) ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন (প্রথম খণ্ড)* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৫), পৃ. ৭৩

৩৫. মুহাম্মদ আমিন বিন আমর বিন আব্দুল আযীয আবেদীন আদদামেশী আলহানাফী (ইবনে আবেদীন), *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররুল মুখতার* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১২ হি.), খ. ৫, পৃ. ২৫৬

৩৬. *আল কুরআন*, ৪ : ২৯

৩৭. আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শুআইব আন নাসাঈ, *আস সুনান* (হালব : মাকতাবুল মাতবাআতুল ইসলামি, ১৯৮৬), হাদিস নং : ৪৫২৮

৩৮. ইমাম আহমদ, *পূর্বোক্ত*, হাদীস নং : ১৩৫

৩৯. আলা উদ্দিন আলী বিন হাসিমুদ্দিন ইবনু কাযী খান, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওল আফআল* (বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালা, ১৯৮১), হাদিস নং : ৮৪৮৫

৪০. ইমাম মুসলিম, *পূর্বোক্ত*, হাদীস নং ১০৬/১৭১

৪১. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫), পৃ. ২৩৪

৪২. মুহাম্মদ বিন হিব্বান আহমদ বিন হিব্বান বিন মাআয বিন মা'বাদ, *আস সহীহ* (বৈরূত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৮), খ. ১৪, পৃ. ৫০৭, হাদীস নং : ৬৫৫৯

৪৩. 'হুদুদ' হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। আবু বকর মুহাম্মদ আস সারাখসী বলেন, 'হুদূদ' হলো কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।" [শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ আস সারাখসী, *উসূল আল সারাখসী* (হায়দারাবাদ, তাবি), খ. ৯, পৃ. ৩৬]

৪৪. 'তা'যির' শব্দের অর্থ হলো বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা। শরিয়তের পরিভাষায় তাযির হলো- আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরিয়ত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযির বলে। [ইমাম ইবনে হুমাম, *শারহু ফাতহিল ক্বাদির* (বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত তুরাসিল আরবি), খ. ৪, পৃ. ৪১২]

৪৫. ড. আহমদ আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৩

৪৬. *তদের*, পৃ. ৩১৭

৪৭. মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ তাবি), খ. ৪, পৃ. ৬১

৪৮. ইবনে তাইমিয়া, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ. তাবি), খ. ৪, পৃ. ২১১-২১২

৪৯. ইমাম আবু দাউদ, *পূর্বোক্ত*, হাদিস নং : ৪৩৯০

৫০. ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৭

৫১. *তদেব*, পৃ. ২৪৩ ও ২৬২

৫২. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ (ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ) ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন (প্রথম খণ্ড)*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৯

৫৩. গালিব আব্দুল কাফী আল-কুরাশী, *আওয়ালিয়্যাতুল ফারূক আস-সিয়াসিয়্যাহ* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৩), পৃ. ৩৯৬

৫৪. *তদের*, পৃ. ২৮০

৫৫. মুহাম্মদ রাওয়াস কালআজী, *মাওসূআতু ফিকহি উমার ইবনিল খাত্তাব* (বৈরূত : দারুন নাফাইস, ১৯৮৯), পৃ. ৭২৬

৫৬. ইযযুদ্দীন ইব্‌ন অব্দুস সালাম, *কাওয়াইদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম* (বৈরূত : দারুন মাআরিফ, ১৯০০), খ. ২, পৃ. ৩৫

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

গৌরকিশোর ঘোষের ছোটগল্প : রাজনৈতিক অনুষঙ্গ

তাসনুমা জামান*

Abstract

Gourkishore Ghosh is a majestic story-writer of Bangla literature. He is an amazing novelist also. In his novels and short-stories, he presents various aspects of the history, politics and social infrastructure of independence and its aftermath. Political tensions, the nature of Hindu-Muslim relations, the rise and fall of the Communist Party, the true nature of trade unions, the refugee problem as well as the social and emotional conflicts of people are depicted in his fiction. Gourkishore Ghosh's fiction matures in the experiences of individual life and society, state and environment. His fiction, especially in short-stories, explores the multifaceted forms of political affiliation which are discussed in this article.

চাবিশব্দঃ নয়া মানবতাবাদ, কালোবাজারি, মন্বন্তর, কমিউনিস্ট পার্টি, রেলকর্মী ইউনিয়ন, দাঙ্গা, দেশভাগ, ষাট-সত্তর দশকের রাজনীতি।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরস্পরের পরিপূরক। রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবন আবর্তিত হয়। আর রাজনীতি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিচালিত হয় রাষ্ট্র। সংঘবদ্ধ মানুষের মধ্য হতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোনো গোষ্ঠী যখন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটাই রাজনীতি, অর্থাৎ রাজনীতি হলো রাষ্ট্রশাসনবিধি। এই রাজনীতি কখনও সাধারণ মানুষের জন্য আশীর্বাদের হতে পারে, কখনও আবার নঞর্থক শাসনের মাধ্যমে জনগণের যাপিত জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই সচেতন শিল্পীর অনুভবে রাজনীতি সুগভীর অনুরণন সৃষ্টি করে আর তা প্রকাশিত হয় শিল্পীর সৃষ্টির মাধ্যমে। গৌরকিশোর ঘোষের চেতনাতেও তৎকালীন রাজনীতি আলোড়ন তুলেছিল যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাস ও গল্পে।

গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। জীবনের রূঢ় পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করার কারণে তিনি এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। পিতার ঔদাসীন্যের দায় মেটাতে মাত্র আঠারো বছর বয়সে পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁর জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। ছোটো-বড়ো নানা ধরনের কাজ করতে করতে একসময় তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, কখনও দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থাকে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে স্বতন্ত্র এক রাজনৈতিক সংবেদন দিয়েছে।

গৌরকিশোর ঘোষ মাত্র পনেরো বছর বয়সে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রশাখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রমিক আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সরাসরি অবলোকনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একসময় তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। কিন্তু রাজনীতি-সচেতন মননের অধিকারী হওয়ায় জনগণ ও তাদের অধিকার তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। ব্যক্তি মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ায় পার্টিতন্ত্রকেই তাঁর কাছে দোষী মনে হয়। একাধারে তিনি যেমন কমিউনিজমের বিরোধিতা করেন তেমনি আবার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও তাঁর ঘৃণা লক্ষ করা যায়। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি খোলা চিঠিতে তাঁর ফ্যাসিবাদবিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে: 'ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা আমার বীতস্রোত স্তিমিত জীবনে আজও তরঙ্গ তোলে! কেননা ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের আমিও একজন ভেটারান সৈনিক। আর ফ্যাসিবাদকে আজও আমি সভ্যতার শত্রু মনে করি'।[১]

গৌরকিশোর ঘোষের রাজনৈতিক -মনোভূমি গঠনে জীবনের প্রথমার্ধের নবদ্বীপের স্কুলজীবনের শিক্ষক গৌরীপ্রসাদ বসু, পরবর্তীকালে র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট মানবেন্দ্র রায় ও তাঁর চেতনাপন্থী শিবনারায়ণ রায়, গৌরী আইয়ুব, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর প্রভাব ছিল অসামান্য। মানবেন্দ্র নাথের পার্টিতে যোগ দেওয়ার কারণে যুদ্ধের সময় একাধিকবার তিনি চাকরিচ্যুত হন। ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের সাহায্যে দেশ স্বাধীনের যে পরিকল্পনা বিপ্লবীরা নিয়েছিল তার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। ইতোমধ্যে আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জার্মানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেফতার করা শুরু হলে তিনি আমেরিকায় যান এবং সেখানেই তিনি র‍্যাডিক্যালদের সংস্পর্শে আসেন। ফলে মার্ক্সবাদী হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৩০ সালে ভারতে ফিরে এলে পরের বছর তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৬ সালে মুক্তি

পাওয়ার পর সম্মানিত অতিথি হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গোঁড়া আচরণ মেনে নিতে না পেরে সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে মতভেদের কারণে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে তিনি 'র‌্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পিপল্স পার্টি' সংক্ষেপে 'র‌্যাডিক্যাল পার্টি' গঠন করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা, গ্রামে-মহল্লায়, কল-কারখানায় আঞ্চলিক জনসমিতির ভিত্তিতে লোকায়ত গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ, সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন, ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দল এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ইত্যাদি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নতুন মতবাদ অর্থাৎ নয়া মানবতাবাদের মূল বিষয়।[২]

মানুষকে ভালোবাসার বিরল গুণ নিয়ে গৌরকিশোর জন্মেছিলেন বলেই হয়তো নয়া মানবতাবাদের ইশতেহার তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। রাজনীতির যে কাঠামোতেই জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে তিনি সেখানেই ঝুঁকেছেন। তাই শেষ অবধি গণতন্ত্রেই তিনি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। ছেলের কাছে পাঠানো চিঠিতে তারই সত্যতা মেলে:

> সভ্যতা আমাদের সহনশীল করেছে। সহাবস্থানে বিশ্বাসী করে তুলেছে। গণতান্ত্রিক আচার আমি একেই বলি। গণতান্ত্রিক সহনশীলতা আমাদের সভ্যতার দান। ডিক্টেটরি বা একনায়কত্ব আধুনিক পোশাকে মোড়া আদিম হিংস্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কারণেই ডিক্টেটরি টিকিয়ে রাখতে কেবলই বল প্রয়োগের দরকার হয়। গণতন্ত্রে বিরোধিতাকে সম্মান দেওয়া হয় বলেই এখানে পরিবর্তন সহজে হয়। [...] বারবার ঘুরেফিরে তোমাকে যে গণতন্ত্রের সুবিধাগুলো দেখাচ্ছি, এতেই বুঝতে পারবে, গণতন্ত্র আমার কতটা প্রিয়। মানুষের মর্যাদা গণতন্ত্রে যেমনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, এমনটি আর কোনও ব্যবস্থাতেই পায়নি।[৩]

গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন নির্ভীক, সৎ এবং মুক্তবুদ্ধির একজন স্বাধীন মানুষ। ফলে গণতন্ত্র তাঁর কাছে অধিক প্রিয় হলেও যখন তিনি অনুভব করেছেন গণতান্ত্রিক পরিবেশ অদূরদর্শী শাসকগোষ্ঠীর কারণে আবিল হয়ে উঠেছে, জনসাধারণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে তখনই তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা আইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে যখন খর্ব করা হলো তখন তিনি মাথা মুণ্ডন করে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলে পরিচিত মানুষজনের সহানুভূতিমূলক প্রশ্নে, 'আপনার কোন নিকট আত্মীয় গত হয়েছেন বুঝি, কে?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ অতি নিকট আত্মীয়, গণতন্ত্র'।[৪] জরুরি অবস্থা প্রবর্তন করা গণতান্ত্রিক সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের পুরোভাগে ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বহমান রাখার নিমিত্তে নিরন্তর সংগ্রামের কারণে ১৯৭৫ সালে MISA-য় (অভ্যন্তরীণ জননিরাপত্তা আইন) তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং এক বছরের কারাবাসের কালেও তিনি লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে ভুলেননি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মত প্রকাশের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া মানে ব্যক্তিকেই অস্বীকার করা, ব্যক্তির অস্তিত্বকে হত্যা করা:

> আমি মনে করি আমার লেখার অধিকার, আমার মত প্রকাশের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অর্থ আমার অস্তিত্বকে হত্যা করা। এই কারণে আমি বর্তমান সেন্সর ব্যবস্থাকে মানবিক ন্যায়-নীতিবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করি। বরাবর আমি মানবিক ন্যায়-নীতির পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে এবং স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রাম করে এসেছি।[৫]

'মানবিক ন্যায়-নীতি'র পক্ষে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় থাকার কারণে ষাটের দশকের নকশাল আন্দোলনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরকে সদা সক্রিয় রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস

করতেন, 'হিংসা আর হিংস্রতা মানুষের স্বাধীনতা আনে না। বড়ো জোর এক স্বৈরাচারের শৃঙ্খল থেকে তাকে আরেক স্বৈরাচারের শৃঙ্খলে নিয়ে আবদ্ধ করে'।[৬] সত্যের উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশের স্বাধীনতায় তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিলো বলেই মানবিকতাবর্জিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তাঁর চেতনায় আশ্রয় নিতে পারেনি। নকশাল আন্দোলনের নৃশংস রূপের বিরুদ্ধে তিনি যেমন সরব হয়েছিলেন তেমনি এই আন্দোলন প্রতিহত করার নামে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি অবস্থান নিয়েছিলেন। এক ধরনের সহজ সাম্যবোধ আর ইহবাদী মানবতন্ত্র তাঁর দার্শনিকতার ভিত্তিভূমি ছিল আর সেই কারণেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অসার আচরণের বিপ্রতীপে তিনি অবস্থান নিয়েছিলেন, লেখনির মাধ্যমে এই বোধকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, যেমন:

> আসুন, আমরা মিথ্যাকে উন্মোচন করি এবং সত্যকে প্রকাশ করি। আসুন, আমরা নিগ্রহ ভোগের দ্বারা প্রসন্ন চিত্তে সন্ত্রাসকে পরাভূত করি। আসুন, আমরা স্বৈরাচারী প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করি। আসুন, আমাদের সব ভালোবাসা স্বাধীনতায় অর্পণ করি। আসুন, অহিংসায় দীক্ষিত হই, কারণ অহিংসাই গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার শক্তি রাখে। স্বৈরাচার নয়, গণতন্ত্র। জয় হোক গণতন্ত্রের। জয় হোক প্রেমের। জয় হোক মানুষের।[৭]

গৌরকিশোর ঘোষের এই রাজনৈতিক মতাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষ করে ছোটোগল্পে। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীকালের বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাকে অবলম্বন করে গৌরকিশোর ঘোষ উপন্যাস ও গল্পে সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন। চল্লিশের দশকের উত্তাল পরিস্থিতি, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বামপন্থী আন্দোলনের ভাঙা-গড়ার খেলায় জন্ম নেয়া সিপিআই, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল প্রভৃতি গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ লড়াই ইত্যাদি বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাঙালির আশা-হতাশা, সংকট-উল্লঙ্ঘনের নানারূপ তাঁর ছোটগল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি বাংলা ছোটগল্পে রাজনৈতিক প্রবণতার উপস্থিতির কারণ তুলে ধরেছেন নিজের বয়ানে:

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন বিশ্বের রাজনৈতিক চেতনা তিনটি সুস্পষ্ট দর্শনের দ্বারা বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে উদার নৈতিক গণতন্ত্র আর একদিকে জঙ্গি ফ্যাসিবাদ আর তৃতীয় কোণে অতুল সম্ভাবনাময় সাম্যবাদ। (অবশ্য পরের দিকে অনেক লেখকই সাম্যবাদী দর্শনে আস্থা হারিয়েছেন)। দার্শনিক চিন্তার এই ত্রিমুখী ধারার সংঘাত বিশ শতকের চার দশকি বুদ্ধিজীবী চেতনাকে পরিশিলীত করে তুলেছে। চিন্তা রাজ্যের এই ত্রিমুখী স্রোতের আবর্ত বাংলার সচেতন মানসকেও নাড়া দিয়েছে। ভাবুক বাংলা নিষ্ক্রিয় স্থাবর আশ্রয় ছেড়ে পৌঁছতে চাইছে সক্রিয়তার সন্ধানে। তাই, দেখতে পাই, এ যুগের লেখকরা পূর্বসূরিদের চাইতে অধিকমাত্রায় রাজনীতি সচেতন।[৮]

লেখকের গল্পে রাজনীতির উপস্থিতির কারণ তাঁর উল্লিখিত বক্তব্য থেকেই অনুধাবন করা যায়।

বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক থেকে গৌরকিশোর ঘোষ গল্প রচনা শুরু করেন। তাঁর গল্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে লেখকের অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক বিন্যাস সংযোজিত হয়েছে এখানে। যেমন: *এই কলকাতায়* গল্পটিতে ১৯৪৮-১৯৪৯ সালের কলকাতার নকশা দেখা যায়। তবে কলকাতার রেখাচিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি লেখক রাজনৈতিক অনুষঙ্গ বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে কলকাতার রূপকে উপস্থাপন করেছেন। অনেক সমালোচক গল্পটিকে আত্মজৈবনিক আখ্যা দিলেও রাজনীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও তার ফলাফল কলকাতার রেখাচিত্রের মতো উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার না হলেও প্রতিটি রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলোর ভাগ্য ছিল যুদ্ধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর এই কারণেই যুদ্ধের নির্মম ঘটনায় ভারতকে সম্পৃক্ত হতে হয়েছে। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তৎকালীন বড় লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতকে 'যুদ্ধরত' বলে ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে ভারতের কোনো স্বার্থ না থাকলেও যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করার জন্য ভারতের মতো একটি সম্পদশালী উপনিবেশের সংযুক্তিকরণের প্রয়োজন ছিল যাতে করে ইংরেজদের নিজস্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ইতিহাসকারের দৃষ্টিতে, 'যুদ্ধের এই সংকটময় মুহূর্তে ভারতের লোকবল, অর্থনৈতিক সম্পদ, ভারতের সামরিক সাহায্য ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ জয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে'।[৯] যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে যুদ্ধের জন্য সৈনিক নিয়োগ শুরু করে, খাদ্য ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সর্বোপরি ব্ল্যাকআউটের কারণে উপনিবেশ ভারতের অবস্থা জটিল রূপ ধারণ করে।

ভারতের বিশেষত বাংলার জনজীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার রক্তাক্ত অভিঘাত এঁকেছিল দুটি দিক থেকে, একটি আর্থ-সামাজিক চোরাপথ, যার বাহক হয়ে এসেছিল মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ চেতনার অপমৃত্যু এবং শাসকশ্রেণিসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। আর অন্যটি রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভাসে– ব্রিটিশ বিরোধী নানা গণআন্দোলনে, সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিস্তৃতিতে।[১০] দশটি নামবিহীন ছোটো ছোটো কাহিনির সম্মিলনে সৃষ্ট *এই কলকাতায়* গল্পটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলার সমাজ ও সমাজমনের ক্ষুব্ধ অবস্থাকে আত্মীকরণ করে জীবনযন্ত্রণার সার্থক দলিল হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে লেখকের তরুণ বয়সের নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরার পাশাপাশি জীবিকা অর্জনের জন্য যে নানারকম কাজ তাঁকে করতে হয়েছে তার সরল বর্ণনাও এখানে পাওয়া যায়।[১১] লেখক জীবিকার তাগিদে নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় এসে 'বোরা-ছেঁড়া আলুর মত' ছড়িয়ে পড়েছিলেন কলকাতার প্লাটফর্মে। কলকাতায় পা দিয়েই তিনি বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন যা তিনি উপস্থাপন করেন হাস্য-রসের মাধ্যমে:

> সময়টা আবার এমন, শক্ত করে হাল ধরতে না পারলে ঘূর্ণির চক্করে বিনি পয়সায় ঘোল খেয়ে নিতে হয়। যুদ্ধের শুরুর কথাই বলছি। তামাম দুনিয়ার মানুষ যেন আর মানুষ নেই। কোনও এক রূপকথার দৈত্যের ফুসমন্তরে দুটো লড়ুয়ে মুরগি বনে একে ঠোকরাতে শুরু করেছে, দূর বিদেশের লোক, কোনওদিন চর্মচাক্ষুষ না করলেও আমাদের চেনা দরিয়ার কূলে কূলে বা'চ খেলে বেড়াচ্ছে। চেম্বারলেন, চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি, তেজো অপরিচয়ে চেগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আর গলা খাঁকরি দেয় না। সকল আগল ঠেলে অপরিচয়ের অন্দরমহলে হুট করে প্রবেশ করে মাসি-পিসির, দেওর-ভাসুরের মতোই।[১২]

উল্লিখিত অনুচ্ছেদে 'দুটো লড়ুয়ে মুরগি' বলতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জার্মান-ইতালি-জাপান আর বিপরীতে মিত্রশক্তিকে বুঝিয়েছেন এবং উপনিবেশিত ভারতবর্ষকে নিজেদের রসদ সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে কত সহজেই যে ব্যবহার করেছে সেই বিষয়টি আলোচ্য গল্পে লেখক ব্যক্ত করেছেন।

এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নগর কলকাতায় মানুষের ঢল নামতে শুরু করে। যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার জন্য দেশি সৈন্য সংগ্রহের নিমিত্তে কৃত্রিমভাবে খাদ্য ও বস্ত্র সংকট সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক শাসককুল। পাশাপাশি ১৯৪২ সালে সাইক্লোনের তাণ্ডব, ১৯৪৩ সালে প্রথম অনাবৃষ্টি পরে বন্যার কারণে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে সমগ্র বাংলা বিশেষ করে কলকাতাসহ

প্রধান প্রধান নগরগুলোতে অভুক্ত জনসাধারণের স্রোত ভেঙে পড়ে। এই প্রসঙ্গে *শনিবারের চিঠি* জানায়:

> যুদ্ধের দরুণ আমাদের বাংলাদেশে নিদারুণ অন্ন সমস্যা দেখা দিতেছে। [...] ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভারতবাসী অন্তত কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। এই সকল দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ পথই বাংলাদেশ, যুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র নতুন লোকেরও আমদানি এখানে হইয়াছে, ফলে অন্ন সমস্যা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।[১৩]

মন্বন্তরের এই রূঢ় অবস্থা গৌরকিশোর ঘোষ দেখেছিলেন সংবাদ সংগ্রহের সুবাদে। কলকাতার রাস্তায় খেতে না পাওয়া মানুষের জন্য খোলা হয়েছিল নানা ধরনের ত্রাণ শিবির। ঔপনিবেশিক কলোনিগুলোকে যুদ্ধের জন্য মাশুল গুণতে হলেও বিশ্বযুদ্ধের দামামা কিন্তু থেমে ছিল না। বরং বিপুল বিক্রমে আন্তর্জাতিকভাবে চলছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। লেখক আলোচ্য গল্পটিতে এ বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছেন এইভাবে:

> তখন সিঙ্গাপুরে বোমা পড়ছে, রেঙ্গুন ছাতু ছাতু। বর্ষার জাপানিরা ঢুকে পড়েছে। ওসব অঞ্চলে দারুণ লড়াই হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। লড়াই সম্বন্ধে ব্যারাকে বসে নানারকম আলোচনা হয়, শুনি।[১৪]

এছাড়া যুদ্ধের বীভৎসতার চিত্রও 'এই কলকাতায়' গল্পে বর্ণিত হয়েছে:

> দুটো জাহাজ ভর্তি আহতের ভিড়। বৃদ্ধ যুবক শিশু পুরুষ নারী। কেউই রেহাই পায়নি। কারো হাত নেই, কারও পা নেই, মাথা ফাটা, চোখ খুবলানো। বিকলাঙ্গ মানুষের ভিড় এমনভাবে আর নিবিড় করে দেখিনি। অনভ্যস্ত স্নায়ু ঠিক থাকতে পারল না। পুঁজ রক্তের পচা গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। [...] রেঙ্গুনের একেবারে বারোটা বেজে গেছে। সেখানে যারা ছিল, হয় বোমার ঘায়ে মোগলাই খিচুড়ি বনেছে, নয় জাপানিদের বন্দি হয়েছে, আর না হয় পায়দলে হিন্দুস্তানমুখো রওয়ানা দিয়েছে।[১৫]

আলোচ্য গল্পগ্রন্থে গৌরকিশোর সরস প্রকাশভঙ্গিতে কলকাতাকেন্দ্রিক নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে যেমন উপস্থাপন করেছেন তেমনি বিশ্ব রাজনীতির ক্ষমতাকেন্দ্রিকরণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত মহাযুদ্ধের প্রভাবে সমাজদেহের ক্ষতচিহ্নকেও চিত্রিত করেছেন।

ঔপনিবেশিকতায় শাসিত ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান-মানস ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিল। ইংরেজ শাসক তাদের এই জাত্যাভিমানের গোড়ায় সযত্নে জল দিয়েছে রাজশক্তির সুবিধার খাতিরেই। কারণ ১৭৫৭ সালে পরাজয়ের ফলে রাজা থেকে সাধারণ মানুষের কাতারে যুক্ত হওয়ার অভিমান থেকে জ্বালা এবং তা থেকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ঘটেছে এই উপমহাদেশে বারবার। ইংরেজরাও অতি সূক্ষ্মভাবে হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়েছে।[১৬] পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা ও ঘৃণার যে বীজ ইংরেজরা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মনোভূমিতে রোপণ করেছিল সেটাই সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে ভ্রাতৃহত্যার রক্তে বাংলার মাটিকে সিক্ত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যখন বুঝল আর বেশিদিন ভারতবর্ষকে শাসন করা যাবে না, আজাদি তাদের দিতেই হবে, তখন তারা এমন এক ছক কষল যেন ভারত স্বাধীন হলেও অশান্তির বাতাবরণ সবসময়ই এখানে বিরাজিত থাকে। আর এরই ফলে কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার এবং পাঞ্জাবের রক্তস্নাত দাঙ্গা পেরিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশে স্বাধীনতা আসে এবং সৃষ্টি হয় স্বাধীন ভারতবর্ষ ও স্বাধীন পাকিস্তান।

স্বাধীনতা আনয়নের জন্য হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশভাগকে আশু সমাধান মনে করেছিলেন। তাই ১৯৪৭ সালের ২ জুন সর্বদলীয় সভায় মাউন্টব্যাটেনের দেশভাগের প্রস্তাবে সবদলই সম্মতি জানায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ৩ জুন 'অ্যাটলি হাউজ অব কমন্স'– এ ভারতভাগের সিদ্ধান্ত জানান এবং মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের ঘোষণা প্রদান করেন। দেশভাগের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার নিমিত্তে সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে 'সীমানা কমিশন' গঠিত হলে ভারতের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তুতি শুরু হয়। র‍্যাডক্লিফ বাংলা-পাঞ্জাব মিলিয়ে আট কোটি আশি লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব নিয়ে ভারতে উপস্থিত হলে মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু, জিন্নাহ কাজটি দ্রুত সম্পাদনের জন্য তাকে বারংবার অনুরোধ করেন এবং মাউন্টব্যাটেনের বেঁধে দেওয়া সময় পাঁচ মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই ভারতের অঙ্গচ্ছেদের দলিলটি তৈরি হয়। বাংলার জন্য রোয়েদাদ তৈরি হয়ে যায় নয় আগস্ট, পাঞ্জাবেরটা এগারোই আগস্ট।[১৭] একই দিনে দুই রাষ্ট্রে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয় বলে মাউন্টব্যাটেন ১৪ আগস্ট পাকিস্তানে আর ১৫ আগস্ট ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরই মধ্য দিয়ে খণ্ডিত হয় বাংলা, ভারত রাষ্ট্রের অধীনে রয়ে যায় পশ্চিম বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান যুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। কলমের এক আঁচড়ে নিজভূমে পরবাসী হয় পূর্ববাংলার হিন্দু আর পশ্চিম বাংলার মুসলমান।[১৮]

স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত কালে খণ্ডিত বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয়ে দেশত্যাগ করতে শুরু করে। পশ্চিম বাংলার মুসলমান পূর্ব বাংলায় আর পূর্ব বাংলার হিন্দুরা পশ্চিম বাংলায় আসা আরম্ভ করে। বিখণ্ডনের খাঁড়ায় পাওয়া স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত হয় ট্র্যাজেডি রূপে। ভিটা-মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবন-যাপনের মাধ্যমে স্বাধীনতার অমৃত স্বাদ গরলে পরিণত হয়। সমালোচকের বক্তব্যে:

> ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১১ লক্ষ, ১৯৫১-তে তা পৌঁছায় ৩৫ লক্ষে। [...] ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল মানুষ দলে দলে সীমান্ত পেরিয়ে ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ স্টেশনে নামতে লাগল। কিন্তু তারপর আর কিছু নেই। আপাততঃ যাত্রা শেষ। সমুদ্রের মত কলকাতা শহর। সন্ত্রস্ত সর্বহারা মানুষগুলি এই শহর দেখে ভয় পেল। [...] মলিন নোংরা বে-আব্রু মানুষগুলির দেহমন থেকে সভ্যতার সব আবরণ খসে পড়েছে। সাপ্তাহিক মাথা পিছু দু'টাকা ও শুকনো চিঁড়ে গুড়ের বরাদ্দের জন্য এদের কাড়াকাড়ি, কল থেকে জল আনার জন্য মারামারি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাহীনতা, রোগশোক প্রতিমুহূর্তের শ্বাসরোধকারী হাহাকার। ট্রেন থেকে নেমে আসা নিত্যযাত্রীদের ভিড়ের চাপে অন্তঃসত্ত্বা উদ্বাস্তু মহিলার সন্তান প্রসবের উদাহরণ আছে।[১৯]

রাজনৈতিক কূটচালে দ্বিখণ্ডিত বাংলার মর্মান্তিক পরিস্থিতি অনুভববেদ্য সাহিত্যিকের মনে নাড়া দিয়েছিল তীব্রভাবে। তাইতো বাংলা ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, উপন্যাসে দেশভাগের কারণ ও রূঢ় প্রতিবেশ ঘুরেফিরে এসেছে। সাংবাদিকতার কারণে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গৌরকিশোর ঘোষকে দাঙ্গা-আক্রান্ত এলাকাগুলোতে যেতে হয়েছে, সেখানে তিনি দেখেছেন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জনসাধারণের বলি, উপলব্ধি করেছেন স্বাধীনতার নামে শিকড়-উপড়ানো মানবের হাহাকার, উদ্বাস্তুদের যাপিত জীবনের নারকীয় যন্ত্রণা। জীবনের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'শিকার', 'ম্যানেজার' ও 'জবানবন্দি' গল্পত্রয়ে। ধর্মের উপর ভিত্তি করে পাওয়া স্বাধীনতা বাংলার মানুষকে শান্তি দিতে পারেনি বরং নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তাদের পালিয়ে আসতে এবং যেতে হয়েছে। এই মানুষেরাই 'শিকার' গল্পের চরিত্র। প্রাণের ভয়ে ঘরের মেয়ে-বউয়ের মান-সম্মান বাঁচাতে বাস্তুত্যাগের যন্ত্রণা, প্রায় সহায়সম্বলহীন অবস্থায় জমি বিক্রির অল্প কিছু টাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে অজানা-অচেনার দিকে যাত্রার বিড়ম্বনা, অসুখ-মৃত্যু-

ছলনায় আক্রান্ত উদ্বাস্তু মানুষের রূঢ়-কঠিন বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। প্রাণের ভয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

> মরি মরবো শ্বশুরের ভিটেতেই মরবো, যাবো না আর কুথাও [...] মাতব্বর প্রধান যারা, যারা শক্তি মন্ত তারাই থাকতে সাহস করলো না। থাকবে। পালাল হুড়মুড় করে, পাকিস্তানে শুধু নাকি মুসলমানরাই হিন্দুদের নাকি স্থান নেই সেখানে, মাতব্বরদের কাছেও ছুটছিল তারা। [...] পাকিস্তান কি, হিন্দুস্তান কি, এই গাঁয়ের মাটি তাদের। সেই ভরসাতেই তো ছিল এতদিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে সবাই পালাল বাড়ি-ঘর খালি করে।[২০]

বাস্তুত্যাগের নির্মম ছবি এই গল্পে লেখক চিত্রিত করেছেন সেই সঙ্গে এমন এক সময়ের বাণীকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে রাজনীতির বিষাক্ত ছোবলে দেশভাগের যন্ত্রণাকে বহন করে মানুষ মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়েছে, সম্ভ্রমের সঙ্গে বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে বাতিল করে শুধুমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে বাস্তুহারা মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।

মন্বন্তর বলতে দুর্ভিক্ষ বা আকালকে বোঝায় যা প্রাকৃতিক কারণে ঘটে, আবার কখনও মানুষের দ্বারাও সৃষ্টি হতে পারে। যুদ্ধের সময়ে মজুতদারদের কৌশলেও দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়, যা আসলে মানুষের তৈরি। এখানে শাসক-সরকার এবং শোষক-ব্যবসায়ীর যৌথ উদ্যোগে মন্বন্তরের উদ্ভাবন ঘটে। ব্রিটিশ শাসনামলে সমগ্র ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল ১৭৭০, ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৯২ এবং ১৯৪৩ সালে। এগুলোর মধ্যে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং ১৯৪৩ (বাংলা ১৩৫০) বা পঞ্চাশের মন্বন্তর সমগ্র বাংলায় সংহারক রূপে উপস্থিত হয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর মনুষ্যসৃষ্ট এবং তার রূপ ছিল ভয়ঙ্কর। এই দুর্ভিক্ষের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে ব্রিটিশ শাসন এবং দ্বিতীয় মহাসমরের অভিঘাত। ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে যে জমিদারশ্রেণি তৈরি হয় তারা ছিল একদিকে ইংরেজ পদলেহনকারী অপরদিকে প্রচণ্ডভাবে অর্থলিপ্সু। তাদের লোভের গোলা পূর্ণ করতে গ্রাম-বাংলার কৃষককে হতে হয়েছে ঋণের দায়ে জর্জরিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বেআইনি মজুদ প্রবণতা, সরকারের মমত্বহীন আচরণে সৃষ্ট পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের মূল বিষয় ছিল প্রথমে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা, সবশেষে মৃত্যু। এই আকালে শুধু বাংলাতেই মৃতের সংখ্যা ছিল আনুমানিক একুশ লক্ষ। খাদ্যের অভাবে নগরগুলোতে অনাহারী মানুষের ঢল নামে, এই আগমনের পথে তারা হারায় সম্ভ্রম ও মূল্যবোধ, বেঁচে থাকার তাগিদে ত্যাগ করে প্রিয়জনদের, স্ত্রী স্থান পায় গণিকালয়ে, সমাধিস্থ করে মায়া-মমতা, ভক্তি আর বাৎসল্যকে। অনাহারের সঙ্গে যুক্ত হয় ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা যা মহামারীর আকার ধারণ করে। লঙ্গরখানার খাদ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ক্ষুধার লেলিহান শিখাকে নির্বাপিত করতে অসমর্থ হয়। বাঁচার তাগিদে তাই তারা কেড়ে খেতে চায়, হাঙ্গামা বাঁধায়। অন্নপূর্ণার দেশে অন্নের জন্য হাহাকারে বাংলার শহর-বন্দর-গ্রাম আঁতকে ওঠে। সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলা মনুষ্যসৃষ্ট আকালে যে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, সেই প্রেতপুরীর কথকতা বাণীরূপ পেয়েছে গৌরকিশোর ঘোষের সাহিত্যে। তিনি রাজনৈতিক অপশক্তির ষড়যন্ত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে জন্ম নেওয়া আকালের রুদ্ররূপকে সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে 'ম্যানেজার' গল্পে তুলে ধরেছেন।

'ম্যানেজার' গল্পের পটভূমি যুদ্ধ-মন্বন্তর-দেশবিভাগের সময়ের নবদ্বীপ। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত নবদ্বীপে থাকার কারণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গল্পের বুননে গৌরকিশোর ঘোষ উপস্থাপন করেছেন। সেই

সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র শাখার সদস্য হওয়ায় ফুড ও রিলিফ কমিটিতে যুক্ত ছিলেন, কাজ করেছেন বিস্তর। আর এই কাজ করার সুবাদে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের প্রতিচ্ছবি তাঁর গল্পে এসেছে:

> কী আকাল যে দেশে এল, কি আকাল। চাল নেই, ধান নেই। ভিক্ষে বন্ধ হল। মেলে না। [...] এই তো আমার চোখের সামনেই কতজন মারা গেল। গ্রাম থেকে ধুকতে ধুঁকতে শহরে এসেছিল, ছটফট করে সরল ক্ষিধের জ্বালায়। আমাদের সঙ্গে পড়ত হরকেষ্ট বৈরাগী, তার জ্যাঠা গলায় দড়ি দিলেন। বিপিন স্যাকরার বউ বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যা হয়ে গেল। সারা শহর ভরে উঠল মানুষের তীব্র ক্ষিধের দূষিত গন্ধে।[২১]

এই গল্পের ম্যানেজার একজন ভিক্ষোপজীবী। মাধুকরী করেই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি চলে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্য কম পড়ায় মধ্যবিত্ত ঘরেও দেখা দেয় অনটন, ম্যানেজার যত সহজে চাইতে পারে মধ্যবিত্তের পক্ষে সেটা প্রায় অসম্ভব, তারা না পারে হাত পাততে, না পারে লঙ্গরখানায় খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়াতে। কাঞ্চন ও তার পরিবারের মাধ্যমে মন্বন্তরে মধ্যবিত্তের সংকটকে লেখক উপস্থাপন করেছেন:

> বুড়ি মা আর কাঞ্চন, আর কেউ নেই ওদের। ক' দিন খায়নি কিছু। [...] ম্যানেজার বলল, ভদ্দরলোকের মেয়ে লাইন দিয়ে খিচুড়ি তো খাতি পারবে না, তাই নিয়ে আলাম। [...] কাঞ্চন বলল, আপনার অনেক জানাশোনা, একটা ব্যবস্থা করতে পারবেনই। কাঞ্চনের কথা শুনে মনে হল, বেচারা ডুবোজলে গিয়ে পড়েছে।[২২]

পঞ্চাশের মন্বন্তর হওয়ার অন্যতম প্রভাবক মজুদদারির বিষয়টিও লেখক আলোচ্য গল্পে মাখন সা'র মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন। মাখন সা সেই ব্যক্তি যে যুদ্ধের বাজারে খাদ্য-বস্ত্র মজুদ ও কালোবাজারি করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। খাদ্যের অভাবে যখন নির্বিচারে অগণিত মানুষ মরছে, লঙ্গরখানায় তিন হাতা খিচুড়ির জন্য লড়াই করছে, কাপড়ের অভাবে মৃতের সৎকার করা যাচ্ছে না, বস্ত্রাভাবে কি-নারী কি-পুরুষ তার আব্রু রক্ষা করতে পারছে না তখন মাখন সা'র গুদামে হাজার হাজার মন চাল, শত শত কাপড়ের গাঁট নির্দ্বিধায় পড়ে রয়েছে,

> এই মাখন সা আমাদের দু'ক্লাস উপরে পড়ত। ফেল করে পড়া ছেড়ে ব্যবসা ধরল। ব্ল্যাক মার্কেটের রাজা হয়ে উঠল। তিন বছরের মধ্যে মাখন সা'র কত পয়সা হল। ওর লুকানো গুদামে হাজার হাজার মণ চাল। শত শত গাঁট কাপড়। আরও এত ঘটা করে সত্য নারায়ণের সিন্নি বিলোচ্ছে।[২৩]

শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যে, যুদ্ধের উত্তাল পরিস্থিতির সুযোগে মানবতাকে পায়ে দলে চোরাকারবার আর কালোবাজারের এক নির্মম দলিল আলোচ্য গল্পে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। লঙ্গরখানার রূঢ় বাস্তব চিত্র, বেঁচে থাকার তাগিদে নারীর বাধ্য হয়ে রক্ষিতার জীবন বেছে নেওয়ার ইতিহাস, যুদ্ধ, মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারির প্রেক্ষাপট 'ম্যানেজার' গল্পটিতে বিবৃত হয়েছে।

উদ্বাস্তু শিবিরে নারীর যাপিত জীবনের মানবেতর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'জবানবন্দি' গল্পে। ভবেশবাবু, মেনকা ও সুরেশের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের স্বরূপ উন্মোচনে মেনকার পূর্ব জীবনের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে লেখক দেশ-খণ্ডনের কুফল উদ্বাস্তু সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। ভবেশ বাবুর কাছে আশ্রয় পাওয়ার আগে মেনকা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। দাঙ্গায় মা, বাবা, ভাই হারিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে নিরাশ্রয় হয়ে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু হিসেবে এসেছিল, সেই সময়ের নির্মম কাহিনি ফুটে উঠেছে মেনকার বক্তব্যে:

> মানুষ বলতে যদি হাড় মাংস দিয়ে গড়া একটা জীবিত অবয়ব বোঝায়, তবে তখনও আমি মানুষ ছিলাম। [...] পাঁচ ছয় বছর আগেও আমার সব ছিল। বাড়ি, ঘর আশা-ভবিষ্যৎ সব। কিন্তু যে রাত্রে আমাদের বাড়ি লুঠ হল, বাবা খুন হলেন, ভাইয়েরা পালালো, আমার কুমারী দেহটা বার কয়েক ধর্ষিত হল দুর্বৃত্তের হাতে, সেদিন থেকে আমার সব গেছে।[২৪]

রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা আর ছিন্ন স্বাধীনতায় সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা একদিকে যেমন উভয় অংশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলেছিল তেমনি বাঙালি নারীর জীবনকেও করেছিল শঙ্কাযুক্ত। দেশভাগ বাংলার উদ্বাস্তু নারী সমাজকে এক গভীর সংকটের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতাপ বজায় রাখতে মেয়েদের ওপরে আক্রমণ হয়েছে দুই দিকের নবনির্মিত রাষ্ট্রযন্ত্রে। নারীদের প্রতিদিন, প্রতিরাতের অসহনীয় দুঃখ-লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করে উভয় রাষ্ট্রই পুরুষকেন্দ্রিক মতাদর্শের দিকে ঝুঁকেছিল। তাই উদ্বাস্তু নারীদের অধিকাংশের চোখে দেশভাগ হল ধর্ষণ, অপহরণ কিংবা বলপূর্বক বিবাহের নামান্তর।[২৫] গৌরকিশোর ঘোষ সত্যসন্ধানী মন নিয়ে রাজনৈতিক চাতুর্যে সৃষ্ট দেশভাগের ফলে বাস্তুহারা অসহায় নিঃসঙ্গ নারীর দুর্ভোগকে 'ম্যানেজার' গল্পের কাঞ্চন ও 'জবানবন্দি' গল্পের মেনকা চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন।

গৌরকিশোর ঘোষ মাত্র পনেরো বছর বয়সে নবদ্বীপে থাকাকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কলকাতায় এলে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগ দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন: আসাম, দার্জিলিং, লালমনিরহাট প্রভৃতি স্থানে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার জন্য সংগঠক হিসেবে তিনি কাজ করেন এবং রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সমর্থ হন। বাম রাজনীতির পূর্বলব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে তিনি ছয়টি গল্প রচনা করেন এবং *সাগিনা মাহাতো* গল্পগ্রন্থে গল্পগুলো গ্রন্থিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলোর নাম চরিত্রের প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আর গল্পকথক তথা 'আমি'র অভিজ্ঞতার বাণীতে পাঠকের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। বামধারার রাজনীতির ভাষ্যকে বাংলা কথাসাহিত্যে চিত্রিত করার উদাহরণ বিস্তর রয়েছে, কিন্তু *সাগিনা মাহাতো* গ্রন্থের ছয়টি গল্প যথা: 'বসন্দা, 'দিন্দা' 'করবীদি', 'শরৎদা', 'কমরেড নির্মলা সেন' ও 'সাগিনা মাহাতো'তে লেখক পার্টি-রাজনীতির নঞর্থক দিকটি তুলে ধরেছেন। দলীয়-বার্তা প্রচারের একপাক্ষিক নিনাদ সৃষ্টি না করে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাকে এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ, আদর্শবাদী, সহজ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, অপরদিকে সেই মানুষকেই দল আর ক্ষমতার কূটচালে বলিদানের আখ্যান সৃষ্টি হয়েছে আলোচ্য গল্পগ্রন্থে।[২৬] রাজনীতির সঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষের সরাসরি যোগাযোগ থাকায় পার্টি-রাজনীতির বীভৎস পচন আর নোংরামি দৃষ্টিগোচরের কারণে সত্য-পূজারি গৌরকিশোর ভীষণভাবে আহত হয়ে রূঢ় বাস্তবকে এখানে তুলে ধরেছেন। সমালোচকের বক্তব্যে তা সুস্পষ্ট:

> অত্যন্ত কম বয়সে–তখনকার বাম রাজনৈতিক উজানে ভেসে খানিকটা এগিয়ে যেতে যেতে অনুভব করেছিল নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই, এই যে নয়া আদর্শ যা একটি সুন্দর স্বপ্নের নেশা জাগিয়ে তোলে তার পথটি বড় আঁকাবাঁকা। মানুষের সরলতা, সততা, কোমলতা, ভালবাসা, নিষ্ঠা, সত্যবোধকে 'পার্টি' নামক যন্ত্রটি অধিকাংশ সময়ে মূল্যহীন করে তোলে।[২৭]

সাগিনা মাহাতো গ্রন্থের 'বসন্দা', 'দিন্দা', 'করবীদি', 'শরৎদা' আলাদা নামাঙ্কনের গল্পগুলোর সূত্র একই। বসন্দা এমন এক চরিত্র যে মনে করে বিপ্লব সার্থক হতে পারে শুধুমাত্র গায়ের জোরে, কিন্তু রাজনীতিতে গায়ের জোর অপেক্ষা বলশালী বুদ্ধির জোর। আর বুদ্ধির জোর প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম গলার জোর। আহত চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য দরকার মুখের তেজ যেটাতে বসন্দা

একেবারেই আনাড়ি, তাই পার্টিতে বসন্দার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কথকের ভাষায়: 'যে বসন্দা হাতে ধরে ধরে এক একজনকে রিক্রুট করেছেন, আজ তারাই প্রধান, বসন্দা একেপেশে। আজকের পার্টিতে বসন্দার মূল্য ছেঁড়া মাদুরের মত'।[২৮] *'দিন্দা'* গল্পের মূল চরিত্র দিন্দার পরিবার ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা ভীষণভাবে নির্যাতনের কারণে তার মায়ের ইংরেজ বিতাড়নের আবেদনে দিন্দা পার্টিতে যোগ দেয়। প্রথম দিকে দিন্দার ধ্যানজ্ঞান ছিল ইংরেজ শক্তিকে উৎপাটন, 'যারা আমার বাবাকে মেরেছে, আমার মাকে মেরেছে, আমার দেশকে পদানত করেছে, তাদেরকে সেদিন দেশছাড়া করব, চুপ সেইদিন করব'।[২৯] এহেন চিন্তার অধিকারী দিন্দার বিপ্লব-স্ফুলিঙ্গ উল্টো খাতে বইতে শুরু করে যখন সামাজিক ভ্রষ্টাচারে তার বোন আত্মহত্যা করে। এর ফলে দিন্দা তার সকল কোমলতাকে বিসর্জন দিয়ে উগ্র বিপ্লবীতে পরিণত হন। তার আচরণে অনেকেই তাকে স্বার্থপর মনে করলেও লেখকের কাছে মনে হয়, 'রাষ্ট্রশক্তি যাকে আশ্রয় দেয় না, সমাজ যার উপর অন্যায় করে, তার বিপ্লবী হওয়া ছাড়া আর কি গতি'?[৩০]

'করবীদি' আর 'শরৎদা' গল্পেও কথক দলের স্বার্থান্বেষী হানাহানির চিত্র অঙ্কন করেছেন আগস্ট আন্দোলন আর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থে লেখক যতগুলো রাজনৈতিক চরিত্র এনছেন তার মধ্যে সবচেয়ে খাঁটি ছিলেন শরৎদা। স্বার্থহীনভাবে তিনি রাজনীতিতে নিমগ্ন ছিলেন। করবীদিকেও রাজনীতিতে এনেছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে যে করবীদির কাছে তিনি ছিলেন গুরু, শ্রদ্ধার পাত্র, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করবীদিই তাঁকেই তহবিল তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। কারণ করবীদির কাছে বিপ্লবী হওয়ার চাইতে পার্টিকে হাতে মুঠোয় রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তাই পার্টির কূট স্বার্থকে সফল করার জন্য শরৎদাকে সরানোর প্রয়োজনে করবীদি শুধু অভিনয় করেছে। প্রিয় পার্টি, প্রিয় মানুষ, আস্থাভাজন কমরেডসদের কাছ থেকে পাওয়া মিথ্যে অপবাদ মাথায় নিয়ে শরৎদা নিজেকে গৃহবন্দী করেছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়েছিলেন। শরৎদা তাই এখন ভগ্ন বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলেন, 'নোংরা, নোংরা, বাইরে বড় নোংরামি। ওই দরজার কোণে লাইজল রাখা আছে, হাত ধুয়ে ঢোকো। তোমরা তো রাজনীতি কর, তোমাদের হাত বড় নোংরা থাকে'।[৩১] আর শরৎদার প্রতি এই নির্মম আচরণে পার্টি পলিটিক্সের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের প্রতি চিরায়ত প্রশ্ন রেখেছেন গৌরকিশোর ঘোষ, 'কেন, পার্টি পলিটিক্সের মধ্যে কি এমন রহস্য আছে, যা মানুষকে মানুষ রাখে না, আজ্ঞাবহ পুতুল করে তোলে'?[৩২]

শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভূলুণ্ঠিত আদর্শের করুণ কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে *কমরেড নির্মলা সেন'* গল্পে। পার্টি অন্তঃপ্রাণ হৃষিকেশ বসুর যৌবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে জেলে। তার কাছে টাকা-পয়সা, পদ-পদবি কিছুই নয়, তার একটাই আকাঙ্ক্ষা পার্টি ইতিহাসে তার নামটুকু যেন থাকে, এমন নেতা দলের অনুজ সদস্যদের কাছে ছিল আদর্শ। আসলে হৃষিকেশ বসুর এ মনোভাব ছিল ভাণ। তিনি গ্রাম থেকে পার্টিতে যোগ দেওয়া নিতান্তই সাধারণ নারী নির্মলা সেনকে তালিম দিয়ে কমরেডে রূপান্তর করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভোগের পাশাপাশি পদ হারানোর ভয়ে নির্মলাকেই দল থেকে বহিষ্কার করেন। আর এই ঘটনার মাধ্যমে তার মিথ্যাচার ধরা পড়ে। কথকের আদর্শ নেতার মুখোশ উন্মোচিত হয় নিরুদি আর হৃষিকেশ বসুর কথোপকথন শ্রবণকালে, যখন হৃষিকেশ বসু সত্যের মুখোমুখি হয়ে নিরুদিকে বলে, 'চোপ চোপ, নচ্ছার মাগী'![৩৩] দলীয় নেতাদের নীতি-আদর্শের বাণীর আড়ালে যে নারী, অর্থ আর ক্ষমতা লোলুপ বীভৎস মুখাবয়ব

লুকিয়ে থাকে সেই রূঢ় সত্যকে লেখক আলোচ্য গল্পে উপস্থাপন করেছেন যা বর্তমান কালেও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গল্প 'সাগিনা মাহাতো'। লেখকের লালমনিরহাটে পার্টির সংগঠক হিসেবে রেলকর্মী ইউনিয়নে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক বাতাবরণে নানা ধরনের অস্থিরতা বিরাজমান ছিল, বিশেষ করে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাতেও শ্রমিক আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। সেই সময় বাংলার রাজনীতিতে তিন মতবাদের ধারা অর্থাৎ গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদের প্রভাব থাকলেও শ্রমিক ইউনিয়নে প্রভাব বিস্তার করেছিল সাম্যবাদ বা বামধারার রাজনীতি। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সাহায্যকারী হিসেবে সরকারি নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সমর্থক সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪৫ সালে ষোলো দফার একটি সনদ সরকারের কাছে পেশ করা হলেও সরকারের উদাসীনতায় ১৯৪৬ সালে রেল-শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘট আহ্বান করলে সরকার কিছু শর্ত মেনে নিলে রেল শ্রমিকদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, যদিও ইউনিয়নের বামধারার অংশ ধর্মঘট চালিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিল এবং এর ফলে ১৯৪৫-৪৬ সালে রেল-শ্রমিক আন্দোলন এক নতুনতর মাত্রা লাভ করে।[৩৪] এই সময়ের শ্রমিকভিত্তিক রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল 'সাগিনা মাহাতো', সাগিনা কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয় বরং লেখকের চেনাজানা জগতেরই বাসিন্দা। লেখকের উক্তিতে, 'তিনবছর ধরে, চেষ্টা করেছি সাগিনার কাহিনি বলবার কিন্তু কিছুতেই মনের মতো করে বলতে পারছিনে। অথচ সাগিনাকে বাদ দিলে চেনামুখের উজ্জ্বল মুখটাই বাদ পড়ে যায়। সাগিনার কথা মনে হলেই ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের সেই হাড়কাঁপানো সকালটার কথা আমার মনে পড়ে'।[৩৫] উল্লেখ্য যে, *সাগিনা মাহাতো* গল্পগ্রন্থের পূর্বনাম ছিল *চেনামুখ*।

দার্জিলিং ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের রেল-শ্রমিকরা যখন বিদেশি মালিকের শোষণ, মধ্যবিত্ত বাঙালি কেরানির অবহেলা, গোরা কর্মকর্তাদের নির্যাতনে জেরবার তখন সাগিনার আগমন স্বঘোষিত নেতারূপে। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেয়েও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত নেতৃত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত সাগিনার সংগঠনের গুণাবলি ছিল অনন্য। মমত্ব আর বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণের কারণে দুই বছরের মধ্যে সকল মজদুর সাগিনার সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করে, যা মালিক পক্ষের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকারী বাম রাজনৈতিক দলের সহায়তায় সাগিনার কোম্পানি তাকে পদানত করে এবং এক সময় পৃথিবী থেকেই সাগিনাকে সরিয়ে দেয়। আলোচ্য গল্পে সাগিনার ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে গৌরকিশোর ঘোষ পার্টি রাজনীতির স্বার্থপর, হীন, কপট রূপের উদ্‌ঘাটন করেছেন। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলনে 'ট্রেড ইউনিয়ন অব দ্য প্রিভিলেজড' নামক এক বিশেষ মধ্যবিত্তশ্রেণি ছিল যারা উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকশ্রেণির উপর চেপে বসে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়ে চতুর পদ্ধতিতে তাদের এক কোণে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে এবং এই বিশেষ গোষ্ঠীর কারণে শ্রমিক আন্দোলনের পতন তরান্বিত হয়। গৌরকিশোর ঘোষের বোধগম্যতায় বিষয়টি ধরা দিয়েছিল বলেই তিনি বলেছেন:

> আমরা এদেশের যতই শ্রমিকের নেতৃত্ব বলে চেঁচাই না কেন, বারবার দেখেছি নেতৃত্বটি মধ্যজীবিদেরই হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আর মজদুর ভাইরা কলে কারখানায় যেমন মণিবাবুর হুকুম তামিল করে, তেমনি ইউনিয়নে তামিল করে কমরেড বাবুদের হুকুম। কিন্তু লেবার ফ্রন্টে কাজ করতে এসে দেখি নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে শুধু মধ্যবিত্তের। যে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আস্থা না

> রাখবারই তামিল পেয়ে এসেছি পার্টি সাহিত্যে, [...] বিপ্লবকালে এরাই দলত্যাগ করে মালিকের পা-চাটা গোলাম বনে যায়–যাদেরকে ঘৃণা করতে শিখেছি, এখন দেখি লেবার মুভমেন্টের তাবৎ লিডার তারাই।[৩৬]

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের দুলালের মতো 'সাগিনা মাহাতো'র সাগিনাকে হত্যার মাধ্যমে লেখক শাসক, পার্টি ও তাদের মধ্যস্থতাকারীদের হিংস্রতার চিত্র আলোচ্য গল্পে উপস্থাপন করেছেন। পার্টি-রাজনীতির উচ্চতর পর্যায়ের ক্ষমতায়নকে পুষ্ট করার নিমিত্তে আদর্শবাদী ব্যক্তিকে ছলে-বলে-কৌশলে বলিদানের দৃশ্য গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে তুলে এনেছেন। তাই শরৎদার মত মানুষ পার্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, সাগিনার ক্ষেত্রে আরও ভয়ঙ্করভাবে বিষয়টি ঘটে, তাকে চিরতরে সরিয়ে ফেলা হয়। কাজিমনের বক্তব্যে সেই সত্যতা ধরা পড়ে, 'কমরেড দত্ত বললেন, সাগিনা নয়, ওখানে থাকবে পার্টি, সেইটেই গড়ে তুলুন'।[৩৭] আরও উল্লেখ্য যে, যথার্থ কর্মীকে ষড়যন্ত্রে ফাঁসানোর ক্ষেত্রে পার্টি-রাজনীতি বা ট্রেড ইউনিয়নের নীতি-নির্ধারকগণ নারীত্বকেও অস্ত্র হিসেবে হামেশাই ব্যবহার করেছেন, করবী, বিশাখা দত্ত তারই সাক্ষ্য বহন করে।

গৌরকিশোর ঘোষ আপসহীন ছিলেন সাংবাদিকতায়, সাহিত্যেও। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতির গরল-অভিজ্ঞতা 'আমি'র সহায়তায় *সাগিনা মাহাতো* গল্পগ্রন্থের ছয়টি গল্পে তুলে ধরে তাঁর রাজনীতি থেকে সরে আসার গোপন সূত্রটিও সন্তর্পণে প্রকাশ করেছেন। এতগুলো চেনামুখের দুঃসহ অবস্থা মানবতাবাদী গৌরকিশোরকে নিঃসন্দেহে আলোড়িত করেছিল বলেই প্রিয় বামধারার রাজনীতি ত্যাগ করে তিনি শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রে আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

যে স্বস্তি ও শান্তির প্রত্যাশায় দেশত্যাগকে মেনে নিয়ে স্বাধীনতা এল, সে প্রাপ্ত স্বাধীনতায় কিন্তু বাংলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ হলো না। বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-পরবর্তী বিশেষ করে ষাট-সত্তরের দশকে অস্থিরতা বিরাজিত হলো তীব্রভাবে। এই সময়ে রাজনীতির ভ্রান্তরূপ, নকশালবাড়ি আন্দোলনের হিংস্রতা, নোংরা রাজনীতির পাশাখেলায় ছাত্রদের ব্যবহারে বাংলার সমাজ ও পরিবেশে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে রাজনীতির ছায়াতলে থেকে ছাত্রদের বেপরোয়া ও আক্রমণাত্মক আচরণ সামগ্রিক শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করেছিল। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে বাংলা বিভক্তির সমান্তরালে ভাঙনের যে সুর বেজেছিল তা প্রথমাবস্থায় ছিল অন্তঃসলিলা, কালের প্রবহমানতায় ষাটের দশকে তা-ই বহুধাবিভক্ত রূপ লাভ করে। সেই সময়ে বামদল সরকার চালানোর ক্ষমতা লাভ করে গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, বিপ্লবের নামে মানুষকে পদানত করতে থাকে এবং ক্ষমতা ভোগ দখলের জন্য ভোটের লড়াইয়ে ছাত্রদের ব্যবহার শুরু করে। ফলে ছাত্র সমাজের অধোপতন শুরু হয়। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংকটাপন্ন হলে নির্বাচিতের প্রতিনিধি হিসেবে ছাত্ররা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং হিংসাত্মক প্রতিবেশের সৃষ্টি হয়। সমালোচকের বক্তব্যে:

> ১৯৭০ সালের ১ মে সি.পি.আই (এম.এল) এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রায় পনেরো হাজার যুব ছাত্রের একটি মিছিল ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ থেকে বের হয়েছিল। [...] তারপর শুরু হল স্কুল–কলেজ এবং লাইব্রেরিতে আগুন দেওয়ার অভিযান। উনিশ শতকের বিখ্যাত বাঙালি মনীষী এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের মূর্তি ও ভাঙা হয়েছিল। যুব ছাত্র আন্দোলনে তত্ত্বের বদলে এসে হাজির হয়েছিল সেই 'ঘটনা' ঘটবার পুরোনো রাজনীতি। এই রাজনীতির মূলধন হল বাহুবল এবং দুঃসাহস। [...] আন্দোলনে এসে ঢুকে পড়ল শত শত 'লুম্পেন', সমাজবিরোধী, ছদ্মবেশী পুলিশ এবং কংগ্রেসিরা, তাদের সঙ্গে এল বে-আইনি

> অস্ত্র, বোমার মশলা। ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্র সংগঠন এবং বামদলগুলির সঙ্গে হাতাহাতি, কাটাকাটি লেগে গেল। হাজার কয়েক তরুণের রক্তে ভিজে গেল পশ্চিমবঙ্গের মাটি।[৩৮]

১৯৬৯-১৯৭০ সালের অস্থির রাজনীতি, সময় ও সমাজককে ধারণ করে গৌরকিশোর ঘোষ রচনা করেছেন 'বাঘবন্দি' গল্পটি যা *আমরা যেখানে* গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত সময়ের ছাত্র রাজনীতি ও লড়াইয়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে লেখক তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে। তারক, ছোটকোন, গুপি, হরু, ভব, শৈল, শঙ্কর–চরিত্রগুলো সেই সময়ের ছাত্রদেরই নেতৃত্ব দিয়েছে যারা ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহলের ঘুঁটিতে পরিণত হয়ে জীবনের বিনিময়ে তার মাশুল দিয়েছে। ১৯৭০ সালের ছাত্র নেতাদের পাড়া-মহল্লায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আচরণ, অশ্রাব্য বুলি, এদের জীবনবোধ সর্বোপরি ভোট প্রদানকে কেন্দ্র করে হানাহানির বিষে বিষাক্ত হওয়ার ইতিকথার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ 'বাঘবন্দি' গল্পে বিবৃত হয়েছে। যেমন:

> এ শালা যা যুগ না। দল একটা চাই। নামমাত্র সিঁদুর সিঁথিতে ঠেকিয়ে রাখ ছোটকোন, তারপর যা করছি আমরা তাই করে যাব, বুঝলি, কিন্তু কোন শালা গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না। পার্টিতে না ভিড়লেই তুমি শালা গুন্ডা, সমাজ-বিরোধী। আর দলে ভিড়ে গেলে সেই তুই শালাই রেভলিউশনারি, বিপ্লবের সৈনিক।[৩৯]

তারকের এই বক্তব্যে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের জীবনবোধেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। বহুদর্শী গৌরকিশোর জানেন এই চক্রব্যূহে প্রবেশের সুযোগ আছে কিন্তু নিষ্ক্রমণের পথ নেই। তাই ছোট্কোনদের জন্য অপেক্ষা করে নির্দয় মৃত্যু। যেমন:

> ও একা রাস্তার উপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মাথাটা ফাঁক, পেট চেরা, হাঁ করা মুখ, একটা চোখ ফুলে বলের মতো হয়ে উঠেছে। প্যান্টটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। একটা কুকুর অনেকক্ষণ থেকে ঘোরাঘুরি করছিল। শরীরটায় তাপ ছিল তাই এতক্ষণ কাছে ঘেষেনি। একেবারে ঠাণ্ডা এবং শক্ত হয়ে উঠতেই সে এগিয়ে এলো এবং মুখের জমাট রক্ত জিভি দিয়ে চকচক ঢক করে চেটে চেটে সাফ করতে লাগলো।[৪০]

ষাট-সত্তর দশকে বহু রাজনৈতিক তরুণ কর্মীর রাজনীতির পাঁকে নিমজ্জনের ফলে তাদের নির্মম পরিণতির কাহিনি উপস্থাপনের মাধ্যমে গৌরকিশোর ঘোষ তৎকালীন ছাত্র-রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন আলোচ্য গল্পে।

গৌরকিশোর ঘোষের ছোটগল্প বিশ্লেষণে বলা যায় যে, তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্টরূপে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর গল্পে। গৌরকিশোর ঘোষের ছোটগল্পে উপস্থাপিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গসমূহ কল্পনা-সঞ্জাত হয়ে ওঠেনি কারণ তা লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। ব্যক্তিগত স্বার্থ যে রাজনীতির মতাদর্শকেও গ্রাস করতে পারে, সেই বিষয়টিও তাঁর গল্পে বিবৃত হয়েছে। রাজনীতিতে ব্যষ্টির সুবিধার্থে পরস্পরবিরোধী মতপোষণের কারণে সমষ্টির ক্ষতি সাধনের বক্তব্যও গৌরকিশোর ঘোষের রাজনৈতিক গল্পসমূহের অন্যতম বিষয়। রাজনীতির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক গল্প যেন যুগান্তরের বজ্রকণ্ঠের ইশতেহার। তাঁর বিভিন্ন গল্পে স্বাধীনতা-পূর্ব, স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বিপন্ন রাজনীতির দুর্বিষহ কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানুষের জন্য যে রাজনীতি তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুভাশুভের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যৌক্তিক রাজনৈতিক মতবাদকে গ্রহণ যেমন করেছিলেন তেমনি বর্জন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তাই তাঁর রাজনৈতিক-প্রসঙ্গ সম্বলিত ছোটগল্পসমূহ রাজনৈতিক সংকীর্ণতার সীমাকে অতিক্রম করে নির্বিশেষে মানবচেতনার তেজোময় রূপ লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. গৌরকিশোর ঘোষ, *দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ১২
২. এম এন রায়, *নয়া মানবতাবাদ*, অনুবাদক : বদিউর রহমান (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৩
৩. গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
৪. অম্লান দত্ত, 'ওকে যেমন দেখেছি', অভীক সরকার (সম্পাদিত), *দেশ* (কলকাতা : ১৪০৭), পৃ. ১৮
৫. গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৬. তদেব, পৃ. ৮
৭. গৌরকিশোর ঘোষ, *আমাকে বলতে দাও* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭), পৃ. ১০৩
৮. গৌরকিশোর ঘোষ, *রূপদর্শী সংগ্রহ* ২ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ১৮৫
৯. নরহরি কবিরাজ, *অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৭), পৃ. ১২
১০. সুস্মিতা ঠাকুর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪০৮), পৃ. ২৪
১১. মিঠু নাগ, *গৌরকিশোর ঘোষ : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৩), পৃ. ১৬৫
১২. গৌরকিশোর ঘোষ, *গল্পসমগ্র* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ২০
১৩. সুস্মিতা ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
১৪. গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
১৫. তদেব, পৃ. ৪৩
১৬. তারক সরকার, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ* (কলকাতা : অরুণা প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ২
১৭. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ১৯৯৪), পৃ. ২৪
১৮. তদেব, পৃ.২৭
১৯. প্রফুল্ল চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব* (কলকাতা : প্রতিক্ষণ, ১৯৭১), পৃ. ১২
২০. গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
২১. তদেব, পৃ. ৮৩
২২. তদেব, পৃ. ১২৭
২৩. তদেব, পৃ. ১২৮
২৪. তদেব, পৃ. ১৩০
২৫. অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *বিস্থাপন ও নির্বাসন, ভারতে রাষ্ট্র-উদ্বাস্তু সম্পর্ক* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮), পৃ. ১৯
২৬. অভীক মজুমদার, 'আখ্যান : অভিজ্ঞতাঃ কল্পনা', সোহিনী ঘোষ (সম্পাদিত), *রূপদর্শী গৌরকিশোর* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০২২), পৃ. ১২৬
২৭. বিমল কর, 'কালের যাত্রার ধ্বনি' অভীক সরকার (সম্পাদিত), *দেশ* (কলকাতা : ১৪০৭), পৃ. ৩১
২৮. গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
২৯. তদেব, পৃ. ১২৮
৩০. তদেব, পৃ. ১৩০
৩১. তদেব, পৃ. ১৫০
৩২. তদেব, পৃ. ১৯৫

৩৩. তদেব, পৃ. ১৯৬

৩৪. নির্বাণ বসু, 'বাংলার রেল শ্রমিক আন্দোলনের একটি রূপরেখা', *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, সম্পাদক : নির্বাণ বসু (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩), পৃ. ২০৬

৩৫. গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

৩৬. তদেব, পৃ. ২৩৬

৩৭. তদেব, পৃ. ২৫০

৩৮. শৈবাল মিত্র, 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ', *সত্তর দশক* (৩য় খণ্ড), সম্পাদক: অনিল আচার্য (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০২০), পৃ. ২৮৩

৩৯. গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

৪০. তদেব, পৃ. ২৯৫

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

থিংস ফল এপার্ট: ইবো সমাজে নারীর চিত্র

সোনিয়া পারভীন*

Abstract

'Things Fall Apart' is the first novel of Nigerian novelist Chinua Achebe. It concerns traditional Ibo life at the time of the advent of missionaries and colonial government in his homeland. The novel opens the new door for the Modern African Literature.The novelist in the novel, 'Things Fall Apart', shows the position of women in Ibo society alongside the establishment of colonial rule and Africa-Europe conflict. The men and women of the Ibo society have never been reached in the bond of brotherhood. Colonial invasions as well as suppression and exploitation of women in patriarchal societies are largely responsible for the breakdown of Ibo culture. An attempt has been made, in the discussion of the article, to analyze the subtle hints given by the novelist about the discrimination and oppression of women in the Ibo Society as well as their enlightenment through the use of descriptive and textual analysis methods.

চাবিশব্দ: চিনুয়া আচেবে, ইবো জনগোষ্ঠী, ওকোনকুয়ো, ইকেমেফুনা, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন, নারী।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিশ শতকের বিশ্ব-সাহিত্যাঙ্গনে আধুনিক, প্রথাবিরোধী ও জীবনঘনিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক অ্যালবার্ট চিনুয়ালুমোগু আচেবে (১৯৩০-২০১৩)। নাইজেরিয়ার এই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আফ্রিকার আধুনিক সাহিত্যের জনক হিসেবে পরিচিত। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে তিনি সর্বদা মানবতার সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। *থিংস ফল এপার্ট* (১৯৫৮) উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি লাভ করেন। উপন্যাসটি নাইজেরিয়ার স্বাধীনতার দুবছর আগে প্রকাশিত হয়। ইবো ভাষার শব্দবিন্যাস ব্যবহার করে আফ্রিকার সাহিত্যও যে ইংরেজি ভাষায় লেখা যায়, সেটিই কৃতিত্বের সাথে দেখিয়েছেন তিনি তাঁর *থিংস ফল এপার্ট* উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক এখানে ব্রিটিশ উপনিবেশ পত্তনের প্রেক্ষাপটে আফ্রিকার জীবনপ্রণালী, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি দেখিয়েছেন ইবো সমাজে পুরুষের সর্বাত্মক ক্ষমতায়নের আড়ালে চাপাপড়া নারীর অন্তর্গত সত্তার উজ্জীবনের সূক্ষ্ম প্রয়াস। বর্তমান গবেষণায় কবীর চৌধুরীর অনুবাদ *সবকিছু ভেঙে চুরে যায়* থেকে বর্ণনাত্মক ও পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীর প্রতি ইবো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও লৈঙ্গিক জটিলতা এবং নারীর অস্তিত্ববোধ ও তার সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যে ক্লাসিকধর্মী উপন্যাসের ধারায় *থিংস ফল এপার্ট* একটি মাইলফলক। এ উপন্যাসটি চিনুয়া আচেবে প্রকাশিত প্রথম সাহিত্যকর্ম। যা পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আচেবের Trilogy-র প্রথম উপন্যাস এটি। পরবর্তী দুটি *Longer at Ease* (১৯৬০) এবং *Arrow of God* (১৯৬৪)। 'প্রথম উপন্যাসের মাধ্যমেই তিনি আধুনিক কথাসাহিত্যের ভুবনে একজন অসামান্য শক্তিধর শিল্পীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই উপন্যাসকে আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস বলে গণ্য করা হয়।'[১]

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমর অন্তবর্তী ও পরবর্তীকালীন পৃথিবীব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক জটিলতা, গণ-মানুষের জীবনে নেমে আসা দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা এবং তদ্‌জনিত জটিলতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সচেতন শ্রেণির অধিকারচেতনা বিশ্বসাহিত্যের বিষয়বিন্যাসে এনেছে নতুন বৈচিত্র্য। এটি একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সমাজের প্রতি ব্যক্তির অধিকারের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তেমনি স্বজাতি ও স্বাজাত্যবোধকে ধারণ করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেখিয়েছে মুক্তির আলো। এ প্রসঙ্গে আফ্রিকান সাহিত্যে নাইজেরিয়ান ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবে পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা।

চিনুয়া আচেবে অধিকাংশ সাহিত্য রচনা করেছেন নাইজেরিয়ার ঔপনিবেশিক যুগের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। শুধু নাইজেরিয়া নয়, গোটা আফ্রিকার আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাটিকেই গড়ে তোলেন তাঁর লেখালেখির মাধ্যমে। 'নাইজেরিয়ায় তিনশ'র বেশি নৃগোষ্ঠীর বসবাস। এদের মধ্যে অন্যতম হলো হাউসা, ফুলানি, ইগবো, ইয়োরুবা, ইজা, কানুরি, আনাং, টিভ, ইবিবিত্ত, এতসাকো এবং এফিক।'[২] *থিংস ফল এপার্ট* উপন্যাসের প্রেক্ষাপট পূর্ব নাইজেরিয়ার উমুওফিয়ার ইবো জনগোষ্ঠী। ঔপন্যাসিক এক শতক পিছনে গিয়ে উনিশ শতকের আশির দশকে আফ্রিকার প্রাচীন ইবো জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, প্রথা-সংস্কার, খেলাধুলা, নাচ-গান, ধর্ম, উৎসব পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি ইবো নামক আদি জনগোষ্ঠীর সমাজ, ঐতিহ্য ও তাদের সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কদর্য রূপ অঙ্কনের পাশাপাশি পিষ্ট হওয়া ইবো জনগোষ্ঠীর

ট্র্যাজিক পরিণতি দেখিয়েছেন। এর পেছনে কারণ হিসেবে ইবো জনগোষ্ঠীর মধ্যকার নারী-পুরুষের অসমতা, বৈষম্যমূলক আচরণ, পুরুষের সর্বাত্মক ক্ষমতার বিষয়টিও চিহ্নিত করা যায়।

মানব সভ্যতার যে পর্যায়ে সম্পত্তির মালিকানার উদ্ভব হয়েছে তখন থেকেই নারীকে হতে হয়েছে গৃহবন্দী। সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর বর্গবিন্যাসে নারীকে ফেলা হয়েছে নিম্ন পর্যায়ে। সমালোচকের ভাষায়

> পুরুষসত্তা যুক্তি-বুদ্ধির চেতনায় আলোকিত কিন্তু নারীসত্তা যুক্তি-বুদ্ধিহীন আবেগের তাড়নায় বশীভূত। এভাবেই পুরুষসত্তা ও নারীসত্তার মাঝে বিভেদের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। যুগে যুগে এ মতের উপর ভিত্তি করেই নারীসত্তাকে গুণগত দিক দিয়ে নিম্নস্তরের সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[৩]

পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরাই নির্ধারণ করেছে নারীর লৈঙ্গিক আচরণগত বিধি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি, ফলে নারী পুরুষকর্তৃক শাসিত ও দমিত হয়েছে। নারীর প্রতি এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের বিপক্ষে নারীবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় মূলত ইউরোপীয় রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে। তারা নারীর গুণগত দিকের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক অধিকার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সহাবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। নারীবাদ পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ অনুসন্ধান করে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নারীসত্তার সচেতনতা বৃদ্ধি করে সামষ্টিক উন্নয়নের চিন্তা করে।

থিংস ফল এপার্ট উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ১৩টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডে ৬টি পরিচ্ছেদ ও তৃতীয় খণ্ডে ৬টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। অর্থাৎ মোট ২৫টি পরিচ্ছেদে সমগ্র আখ্যানের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে মূল কাহিনির পাশাপাশি আছে নানা কৌতূহল উদ্দীপক নাটকীয় কাহিনি। লেখক এগুলোর পরতে পরতে প্রাচীন নাইজেরীয় ইবো জনগোষ্ঠীর আচার ও প্রথা, ক্রীড়া-উৎসব এবং পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতির কথা নিপুণভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে উপন্যাসটিকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে দেখানো যেতে পারে:

প্রথম খণ্ড : এখানে রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র ওকোনকুয়োর পুরুষ হয়ে ওঠার গল্পের পাশাপাশি ইবো সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক জীবনাচরণে নারীর অবস্থান সুনির্দিষ্টকরণ।

দ্বিতীয় খণ্ড : ওকোনকুয়োর নির্বাসিত জীবনে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর প্রভাব। ইবো সমাজে মিশনারীদের আগমনের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড : ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের ফলে ইবো সমাজের ভাঙন ও ওকোনকুয়োর ট্র্যাজিক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

ইবো সমাজের লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের তীব্র প্রভাবে সেখানকার সংস্কৃতি, জীবন-যাপন প্রণালী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধিবৃত্তিক বিভাজনের পাশাপাশি অপরাধ এমনকি কর্ম-বিভাজনেও লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক ওকোনকুয়ো চরিত্রকে দীর্ঘকায়, বলবান ও বীরযোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শারীরিক গঠনের দিক থেকে লেখক তাকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যেন তার আকৃতি দেখেও স্ত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করে। উমুওফিয়া থেকে এমবাইনো পর্যন্ত সাত বছরের মল্লযুদ্ধে বিজয়ী

আমালিঞ্জকে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ওকোনকুয়োর বীরত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে ইবো সমাজে পুরুষের অবস্থান শনাক্ত করেছেন। ওকোনকুয়োকে বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন:

> বিশ বছর কিংবা তারও বেশি হবে, আর এই সময়ের মধ্যে ওকোনকুয়োর খ্যাতি উত্তুরে বাতাসের প্রবল ঝাপ্টায় দাবাগ্নির মতো বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে ছিল দীর্ঘকায় এক বিশাল, ভ্রূজোড়া ছিল ঘন, ঝাকড়া ঝাকড়া, নাকটা চওড়া, সব মিলে তাকে বেশ কঠোর দেখাত। সে শ্বাসপ্রশ্বাস নিত জোরে জোরে। লোকে যখন ঘুমাতো তখন তার বর্হিবাটিতে তার স্ত্রীরা আর সন্তানরা তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেত। হাঁটার সময় তার পায়ের গোড়ালি মাটি প্রায় স্পর্শই করাত না, মনে হতো সে বুঝি এখনই কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।... সে সামান্য একটু তোৎলাত এবং রেগে গেলে ইচ্ছানুযায়ী দ্রুততার সঙ্গে কথা বলতে পারত না আর তখন সে তার মুষ্টি ব্যবহার করত।[৪]

অন্যদিকে ইবো সমাজ নারীদের কেবল সংসারের কাজ, সন্তান জন্ম-দান, লালন পালনের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের মতামত বা সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর কারণে নারীদের কিছু সীমাবদ্ধতা ও বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়েছে। পুরুষের কাছ থেকে তারা সবসময় ভরণ-পোষণের আশা করে ফলে স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের সমকক্ষ মনে করা হয় না। এ প্রসঙ্গে সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক: 'নারী হলো অসম্পূর্ণ পুরুষ। পুরুষ বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন এবং সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; অন্যদিকে নারী বুদ্ধির ক্ষেত্রে হীন, ধীরিক্ত এবং নিষ্ক্রিয়।'[৫]

থিংস ফল এপার্ট উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই, উমোফিয়ার এক কন্যা এমবাইনোতে নিহত হলে ঐ গোত্রের এক কিশোর ইকেমেফুনার দায়িত্ব এসে পড়ে ওকোনকুয়োর সংসারে। ইকেমেফুনাকে দেখে ওকোনকুয়োর স্ত্রী তার সম্পর্কে জানতে চাইলে ওকোনকুয়ো ধমকের স্বরে বলে, 'তোমাকে যা বলা হলো তাই করো। কবে থেকে তুমি উমোফিয়ার এনডিচি হয়ে উঠলে?'[৬]

ওকোনকুয়ো তার পরিবারকে খুব কড়াভাবে শাসন করে। তার মেজাজের ভয়ে তার স্ত্রীরা সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। ভেতরে ভেতরে সে নিষ্ঠুর না হলেও তার দুর্বলতা যাতে প্রকাশ না পায়, সেজন্য পরিবারের উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে। কারণ ইবো সমাজে দুর্বলতা প্রকাশ করা নারীসুলভ আচরণ বলে বিবেচনা করা হয়। ওকোনকুয়োর বাবা উনোকা ছিল অলস, পরিশ্রমবিমুখ, ভীরু ও দুর্বলচিত্তের মানুষ। তাই বাবাকে সে প্রকৃত পুরুষ বলে মনে না করে ঘৃণা করত। কারণ বাবার চারিত্রিক দুর্বলতা তার দৃঢ় চারিত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে দিয়ে নারীসুলভ চরিত্রে পরিণত না করে– এই ভয় ছিল। এই ভয়ই ওকোনকুয়ো চরিত্রকে আরো বেশি কঠোর ও পাষাণ করে তুলেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> বালক বয়সেই বাবার ব্যর্থতা আর দুর্বলতার জন্য তার মনে একটা ক্ষোভ ছিল। এখনো তার মনে পড়ে আর এক খেলার সাথী তাকে বলেছিল যে তার বাবা একটা 'আগবালা'। ওই তখন ওকোনকুয়ো প্রথমবারের মতো জানতে পায় যে, 'আগবালা' মেয়ে লোকের একটা নাম: যে লোক কখনো কোনো খেতাব গ্রহণ করেনি তাকেই নির্দেশ করে এই নাম। আর তাই একটা সুতীব্র আবেগ তার উপর সর্বদা কর্তৃত্ব করে। তার বাবা উনোকা যা কিছু ভালোবাসে তাকেই সে ভীষণ ঘৃণা করে। ওই জিনিসগুলোর মধ্যে একটা ছিল নম্রতা, আরেকটি ছিল আলস্য।[৭]

উমুওফিয়ার এক মেয়ে এমবাইনোতে নিহত হলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি কিশোর ও কিশোরীকে নিয়ে আসে উমুওফিয়াবাসী। কিশোর ইকেমেফুনা ওকোনকুয়োর ঘরে লালিত পালিত হলেও যুবতী কিশোরীকে আনা হয় পুরুষের নিহত স্ত্রীর জায়গা পূরণ করার জন্য। 'সবকিছু শোনার পর তারা

সিদ্ধান্ত নেয়, মেয়েটি ওগবুয়েফির নিহত স্ত্রীর জায়গায় নিয়ে তার কাছে যাবে। আর ছেলেটি, যার মালিক এখন সমগ্র গোত্র, তার সম্পর্কে এখনই দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই।'[৮]

এখানে দেখা যায় যে, নারীকে আনা হয়েছে কেবল একজন স্ত্রীর দায়িত্ব পালনের জন্য কিন্তু অপরদিকে বালকটির কাজের ধরন কী হবে সে সম্পর্কে গোত্রবাসী তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। ধীরে ধীরে সে ওকোনকুয়োর পরিবারের অংশ হয়ে উঠে। এখানেও লেখক ঐ সমাজের নারী ও পুরুষের বৈষম্যকে দেখিয়েছেন, যেখানে পুরুষকে মূল্যায়ন ও নারীকে শুধু গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ওকোনকুয়োর সংসারে ইকেমেফুনার দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে তার প্রতি সন্তানবাৎসল্য অনুভূতি তৈরি হওয়া সত্ত্বেও সে তা প্রকাশ করতে পারে না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্নেহ প্রকাশ করা পুরুষালি মনোভাবের বিপরীত। অর্থাৎ দয়া, স্নেহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করা মেয়েলি স্বভাবজাত বলে বিবেচিত তাই ওকোনকুয়ো মনে করে: 'স্নেহের প্রকাশ ছিল দুর্বলতার চিহ্ন। দেখবার একমাত্র জিনিস হলো শক্তিমত্তা। আর তাই সে আর সবার মত ইকেমেফুনাকেও বেশ কড়া হাতে শাসন করত, কিন্তু সে যে ছেলেটিকে পছন্দ করেছে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।'[৯]

কিন্তু প্রথাগত সামাজিক নিয়ম-নীতির যাতাকলে পিষ্ট হয়ে ওকোনকুয়ো ইকেমেফুনাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। এতে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেয়নি। ইকেমেফুনাকে হত্যা করার সময় ভালোবাসা ও প্রথা পালনের বন্ধনে ওকোনকুয়োর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরক্ষণেই সেই দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সে ইকেমেফুনাকে হত্যা করে। এখানে ভালোবাসার চেয়ে প্রথা পালনই মুখ্য হয়ে ওঠে। যা ইবো সমাজে পুরুষালি গোত্র প্রধানের পরিচয়কে আরো স্পষ্ট করে। 'ভয়ে দিশেহারা হয়ে ওকোনকুয়ো তার কুঠার বের করে তাকে কেটে ফেলে। তার ভয় হয়, পাছে লোকে তাকে দুর্বল ভাববে।'[১০] পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব রক্ষার্থে ওকোনকুয়োর নিষ্ঠুর-পাশবিক-অমানবিক হত্যাকাণ্ডই তার সন্তান নওইয়ের মনে পিতা বা পিতৃতন্ত্রের ওপর বিরূপ মনোভাব তৈরি করে।

ইবো জনগোষ্ঠীর সমাজ কৃষিনির্ভর। এই সমাজের নারী গৃহের কাজের পাশাপশি কৃষিকাজেও অংশগ্রহণ করত। তবে নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ফসলের রাজা বলা হতো ইয়্যাম নামক শস্যকে। ইয়্যাম চাষ করা ছিল পুরুষের কাজ। অপরদিকে নারীরাও যথেষ্ট পরিশ্রম করে উৎপাদন করত অন্য ফসল, যেটিকে বলা হতো মেয়েদের ফসল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কোকো-ইয়্যাম, সীম আর কাসাভা। এ ক্ষেত্রে পুরুষেরা কৃষি জমিতে শস্য উৎপাদন করত এবং নারীদের কাজ ছিল তা সংরক্ষণ করা। 'ইয়্যাম উৎসব' ইবো জনগণের একটি প্রধান উৎসব। নবান্নের উৎসবকে বলা হয় নব-ইয়্যাম উৎসব। ফসল কাটার আগে এই উৎসব হয়। এই উৎসব ছিল ধরণীর দেবী এবং সকল উর্বরতার উৎস 'আনি' দেবীকে ধন্যবাদ প্রদানের একটি বিশেষ ঘটনা। ধরণীর দেবী এবং গোত্রের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের লক্ষ্যে প্রতি বছর ফসল ঘরে তোলার আগে নতুন ইয়্যাম ভোজের আয়োজন করা হয়। এসব শক্তির উদ্দেশ্যে ইয়্যাম উৎসর্গ না করে কেউ নতুন ইয়্যাম মুখে তোলে না। কারো ঘরে যদি পুরান ইয়্যাম থাকত তাহলে সেটি উৎসবের আগের দিনই শেষ করে ফেলা হতো। নতুন বছর শুরু করত নতুন সতেজ ইয়্যাম দিয়ে। পুরো জনগোষ্ঠী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। উৎসবে প্রতিটি পরিবারই পার্শ্ববর্তী ঘরগুলোতে যাতায়াত করে। নারীরা নিজেদের নানা নকশায় চিত্রিত করে। আচেবের ভাষায়:

> সমগ্র উমুওফিয়া ব্যাপী নতুন ইয়্যাম উৎসব ছিল একটা বিশেষ আনন্দময় ঘটনা। ইবো জনগণ যেমন বলে, বলিষ্ঠ বাহুর প্রতিটি লোক কাছের এবং দূরের অনেক অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাবে, এটাই সকলে প্রত্যাশা করে। ... ওকোনকুয়োর স্ত্রীরা বাড়ির দেয়াল আর কুটিরগুলো লাল মাটি দিয়ে লেপে ঘষে, মেজে এমন ঝকঝকে করে তোলে যেন সেখানে আলো ঠিকরে পড়ে। তারা তাদের পেট ও পিঠে সুন্দর কালো নক্‌শা আঁকিয়ে নেয়।[১১]

আফ্রিকান সংস্কৃতিতে বিয়ের অনুষ্ঠানেও বিরাট আয়োজন করা হয়। বাঙালি বিয়ের মতই আত্মীয়-স্বজন সহকারে মহা ধুমধাম করে কনে দেখা, কন্যাপণ ও বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বিয়েতে কন্যা ও তার মায়েরা নাচের তালে তালে গান বাজনা করে। এছাড়া ভোজে কোলাবাদাম, ফু-ফু, সুরুয়া ও ইয়্যামের তরকারির সাথে তালের রসের প্রচুর মদ পরিবেশন করা হয়। নয় গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পালন করা হতো। বিয়েতে যৌতুকের বিষয়টি প্রাধান্য পেত। কোনো কোনো গ্রামে টাকা ও ইয়্যাম দিয়ে মেয়েদের বিয়ে করা হতো। আবামে আর অনিন্তদের রীতিনীতি আবার উল্টো। তারা সরাসরি দাম কষাকষি করে, মনে হয় বাজারে গিয়ে গরু-খাসি কিনছে। উমুনসোবাসীরা আবার দর কষাকষি করে না, পাণিপ্রার্থীরা বস্তার পর বস্তা কড়ি নিয়ে আসতো যতক্ষণ না কুটুম্বরা তাদের থামতে না বলে। ওকোনকুয়োর পরিবারে শলা দিয়ে যৌতুকের মূল্য নির্ধারণ করা হতো। তবে উমুওফিয়ার বিধান অনুযায়ী কোনো মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গেলে স্বামীকে যৌতুকের টাকা ফেরত দিতে হতো। ওকোনকুয়োর বন্ধু ওবিরিকার কন্যার বিয়ের নানা ধরনের চিত্র উঠে আসে আলোচ্য উপন্যাসে:

> উরি তথা বাগদান অনুষ্ঠানের দিন কন্যার পাণিপ্রার্থী (যৌতুকের বেশিরভাগ অর্থ আগেই প্রদানের পর) শুধু ভাবী বধূর পিতা-মাতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের জন্য নয়, রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত তার ব্যাপক আত্মীয়পরিজন সবার জন্য , যারা 'উমুন্না' নামে অভিভূত, প্রচুর পরিমাণে তাড়ি নিয়ে আসবে। মহিলা, পুরুষ, শিশু সবাই আমন্ত্রিত হয়েছে, তবে এটা ছিল মেয়েদের উৎসব এবং এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল বধূ এবং বধূমাতা।[১২]

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওকোনকুয়ো থেকে আরম্ভ করে সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সকল ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত। স্ত্রীদের থেকে প্রাপ্ত অর্থ একদিকে পুরুষকে যেমন স্বাবলম্বী করে তোলে তেমনি সমাজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। পুরুষের এই শক্ত অবস্থানই পুনরায় তাকে বহুবিবাহের দিকে ধাবিত করে। ফলে পুরুষ সমাজে নেতৃত্বস্থানীয় একাধিক খেতাব লাভ এবং নারীর প্রতি কর্তৃত্বমূলক আচরণ প্রকাশ করে। ইবো সমাজে শান্তির সপ্তাহে স্ত্রীদের সাথে কোনো প্রকার ঝগড়া নিষিদ্ধ। এ সপ্তাহে কারো সাথে একটি রূঢ় বাক্য পর্যন্ত তারা উচ্চারণ করে না। এই শান্তির সপ্তাহে ওকোনকুয়ো তার তৃতীয় স্ত্রীকে বেদম প্রহার করে ফলে সে ধরণীর দেবী 'আনি'র পুরোহিত ইজিয়ানির আক্রোশের সম্মুখীন হয়। প্রচণ্ড রাগী ও শক্তিশালী হলেও সে পুরোহিতের সমস্ত নির্দেশ মেনে নেয়। পুরোহিতের ভাষায়:

> তুমি যে অন্যায় করেছো তার ফলে আমাদের সমগ্র গোত্র ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ধরণীর দেবীকে তুমি অপমান করেছো এবং সে অপরাধে তিনি আমাদেরকে ভালো ফসল হতে বঞ্চিত করতে পারেন।... কাল সকালে তুমি দেবী আনির মন্দিরে গিয়ে একটা ছাগী, একটা মুরগী, এক প্রস্থ কাপড় আর একশো কড়ি নিয়ে উপস্থিত হবে।[১৩]

শুধু আফ্রিকা নয়, প্রায় সমগ্র মানব জাতির প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে পুরুষতান্ত্রিকতা ছিল। যে কোনো সচ্ছল পুরুষ এক বা একাধিক বিয়ে করতে পারে, কিন্তু সমাজ বা সংসারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নারীকে মূল্যায়ন করা হয় না। *থিংস ফল এপার্ট* উপন্যাসে দেখা যায় উৎপাদন থেকে শুরু করে মল্লযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় পুরুষের কর্তৃত্ব। মত

প্রকাশ থেকে শুরু করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নারীর নেই। তবে এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ওকোনকুয়োর দ্বিতীয় স্ত্রী ইকওয়েফিকে একটু স্বতন্ত্র করে নির্মাণ করেছেন। সে তার প্রথম স্বামীকে ছেড়ে প্রেমিক ওকোনকুয়োর সাথে ঘর বাঁধে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করে তার এরকম সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত সাহসী মনের পরিচয় এবং ঐ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের দৃঢ় প্রতিবাদ।

ইবো জনগোষ্ঠীর নারীদের দেখা হচ্ছে পুরুষের শারীরিক সম্ভোগের উপকরণ হিসেবে সন্তান উৎপাদন ও লালন পালনের যন্ত্ররূপে। ওকোনকুয়োর কনিষ্ঠ স্ত্রী চুলের বিনুনী করার জন্যে বন্ধুর ঘরে গিয়ে বিকেলে রান্নার পূর্বে ফিরে না আসায় সে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েদের না খেতে দিয়ে বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে শান্তি সপ্তাহকে উপেক্ষা করে স্ত্রীকে প্রহার করে। অধিক সন্তান জন্মদান ও বাল্যবিবাহ, শিশুমৃত্যুহার, যমজ সন্তান হত্যা প্রভৃতি ঘটনাবলি উপস্থাপন করে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন আফ্রিকার নারীদের মর্মপীড়া, জীবনযন্ত্রণা ও মাতৃকষ্টকে। উচেন্দুর ভাষ্যে– 'আমার যৌবনে আমার শক্তিমত্তার সময় আমি যেসব সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম তাদের কজনকে আমি কবর দিয়েছি তুমি জানো? বাইশ জনকে।'[১৪]

ইকওয়েফি দশটি সন্তান জন্ম দিয়েছে যার মধ্যে নয়টি সন্তানই মারা গেছে। এর পেছেনে গর্ভজাত মায়ের সুষম খাদ্য ও পুষ্টির অভাব, পুরুষের চাপে অধিক হারে সন্তান জন্মদানে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি অনুষঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা যায়। সন্তানদের নামকরণের মধ্যেই নারীর চরম দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। 'সন্তানের জন্মদান, যা একটি নারীর সর্বোচ্চ গৌরবের ব্যাপার হওয়ার কথা, ইকেওয়েফের জন্য হয়ে ওঠে প্রতিশ্রুতিহীন একটা নিছক শারীরিক যন্ত্রণার বিষয়। ...তার ক্রমবর্ধমান হতাশা ওই নামকরণের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়।'[১৫]

থিংস ফল এপার্ট উপন্যাসের অন্যতম উজ্জ্বল, বুদ্ধিমতি নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ওকোনকুয়োর মেয়ে ইজিনমাকে। ইজিনমা চরিত্রটি ইবো সমাজের ঐতিহ্যবাহী লৈঙ্গিক ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করার পাশাপাশি নারীর সক্রিয় অবস্থান চিহ্নিত করে। ইজিনমা তার বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় না– সে প্রতিবাদী নারীর প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে। সে গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলতে পছন্দ করে, যদিও এটি একটি মেয়ের জন্য অশোভন বলে বিবেচিত হয়। গ্রামের অন্য মেয়েদের থেকে তার চালচলন ছিল একটু ভিন্নধর্মী। ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে: 'বেশিরভাগ শিশুই মাকে নাম ধরে ডাকতো না, কিন্তু ইজিনমা ডাকতো... ইজিনমা ওকোনকুয়োর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল।'[১৬] ইজিনমা চরিত্রটি আশাবাদী ও সমাজে গতিশীলতার প্রতীকরূপে উদ্ভাসিত। সে পরিবর্তনের মুখেও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ বজায় রাখার প্রতিনিধিত্ব করে।

ইবো সমাজে নারীর অবস্থান একেবারে নিম্ন পর্যায়ে। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল ঘরের কাজে সহযোগিতা করা। সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীদের কাজ রান্না-বান্না করা ও ঘরের নকশা আঁকানো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসন বিন্যাসের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের পার্থক্য দৃশ্যমান। ইলো প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত উৎসবে ঘরের মহিলাদের আসন পুরুষদের থেকে অনেক দূরে রাখা হতো। পুরুষদের আসন থাকত উঁচু টুলের উপর। উঁচু টুলকে পুরুষের সামাজিক অবস্থানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। 'জনতা যেভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এই উৎসব মূলত পুরুষের জন্য। অনেক নারী উপস্থিত থাকলেও তারা প্রান্তীয় অবস্থান নেয়, বহিরাগতের মতো।'[১৭] নারীদেরকে উৎসবে নাচ-গান ও ঘর পরিষ্কার সুন্দর করে তোলার কাজে লাগানো হয়। ইগউযুগউয়ু ভবনের বাইরে নকশা ও ছবি অঙ্কন করতে পারলেও তার ভিতরে প্রবেশ করার অধিকার তাদের

নেই। ভিতরে কী আছে কল্পনা করলেও সেটি প্রকাশের অধিকারও তাদের নেই। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> বিশেষভাবে নির্বাচিত মেয়েরা নিয়মিত বিরতি দিয়ে ভবনটির দেয়ালে নানা রঙের নকশা ও ছবি অঙ্কন করে। এই মেয়েরা কখনোই ভবনের ভেতরটা দেখে নি। কোনো মেয়েই দেখে নি। পুরুষের তত্ত্বাবধানে তারা শুধু বাইরের দেয়ালগুলো ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে ও তার গায়ে ছবি আঁকে। ভেতরে কী আছে সে সম্পর্কে তারা যদি কিছু কল্পনা করেও থাকে তাহলে সে-কল্পনাকে তারা নিজেদের মধ্যে গোপন রাখে। গোত্রের সব চাইতে শক্তিশালী এবং গোপন ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা সম্পর্কে কোনো মেয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন করে না।[১৮]

থিংস ফল এপার্ট উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ঔপন্যাসিক মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। ওকোনকুয়ো নিজ গোত্রের একটি ছেলেকে ভুলক্রমে মেরে ফেললে সাত বছরের জন্য সে তার মাতুলালয় এমবান্তায় নির্বাসিত হয়। এখানেও সে কঠিন পরিশ্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থাপন্ন হয়ে ওঠে। এমবান্তর কোনো মেয়ে মারা গেলে তাকে স্বামীর পরিবারের সাথে কবর না দিয়ে বাবার বাড়িতে আনা হয়। বাবার বাড়িতে তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সমাধিস্থ করা হয়। ওকোনকুয়োর মায়ের মৃত্যুর পর তাকেও মামার দেশে কবর দেয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়। তারা বিশ্বাস করে যখন সবকিছু ভালোভাবে চলে, জীবন যখন মধুর, তখন একজন মানুষের জায়গা তার পিতৃভূমিতে। কিন্তু জীবন যখন ব্যথা ও তিক্ততায় ভরে যায় তখন মানুষ তার মামার দেশে আশ্রয় নেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, সেখানে রক্ষা করার জন্য মা থাকে। এই অঞ্চলটি মাতৃতান্ত্রিক অর্থাৎ মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানা হয়। এমবান্তায় নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া হয়। এখানে সবাই মাতার পরিচয়ে পরিচিত হয়। ওকোনকুয়োর মামা উচেন্দু বলেছে:

> আমারা সবাই জানি যে পুরুষ হলো পরিবারের প্রধান, স্ত্রীরা তার নির্দেশ অনুযায়ী সব কাজ করে। একটি সন্তানের মালিক তার বাবা এবং তার পরিবার, সেখানে তার মা আর মায়ের পরিবারের কোনো কর্তৃত্ব নেই। একটা মানুষের জায়গা তার পিতৃভূমি, মাতৃভূমি নয়, তবুও আমরা নাম রাখি এননেকা, মা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৯]

ওকোনকুয়োকে তার মায়ের আত্মীয়-স্বজনরা সাদরে গ্রহণ করে নেয়। তার মাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্বপ্রথম তাকে স্বাগত জানায়। শাস্তিস্বরূপ ওকোনকুয়ো বহু বছর পরে তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এমবান্তায় আসে। মায়ের আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় সে তার তিন স্ত্রীর জন্য তিনটি কুটির নির্মাণ করে। এমবান্তায় এসে সে তার পিতৃভূমি উমুওফিয়ার কথা মনে করে আফসোস করে। কারণ তার জীবনের কেন্দ্রমূলে ছিল বিশাল এক অনুভূতি। সে গোত্রের একজন মহান প্রভু হতে চেয়েছিল এবং সেটি যখন অর্জনের পথে তখন তার স্বপ্ন ভেঙে যায়। ওকোনকুয়োর এই অবস্থায় তার মামা উচেন্দু সবসময় তাকে সান্ত্বনা দেয়। সাত বছর কেটে গেলে ওকোনকুয়ো আবার তার বাবার দেশে ফিরে যেতে পারবে। পরিবারের রক্ষক হয়ে সে যদি সে এত ভেঙে পড়ে তাহলে তার পরিবার টিকে থাকতে পারবে না।

ওকোনকুয়ো যখন এমবান্তায় ছিল তখন খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের আর্বিভাব ঘটে। তাদের আর্বিভাবে সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যায়। মিশনারিরা প্রথমে গির্জা নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি চায়। তারপর ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করে। এমবান্তর গ্রামবাসীকে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করে। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। এননেকা নামের এক মহিলা সর্বপ্রথম খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। ওকোনকুয়োর পুত্র নওই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। নওই তাদের পরিবারের ভাঙন,

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবমূল্যায়ন, বিভিন্ন কুসংস্কার নিজে প্রত্যক্ষ করেছে। সমালোচকের ভাষায়:

> নিজ ঘরে পুত্র স্নেহে পালিত ইকেমেফুনাকে ওকোনকুয়ো নিজ হাতে নিজের মাশেতে দ্বারা হত্যা করেন। ছেলে নোয়ি অনুমান করতে পারে যে, ইকেমেফুনাকে তার বাবা নিজ হাতে হত্যা করেছেন। এ ঘটনা থেকে নোয়ি তার বাবা ও পুরো গোত্রকে ঘৃণা করতে শুরু করে।[২০]

ফলে তার কাছে মিশনারিদের দেখানো পথ সহজ মনে হয়। এটি জানতে পেরে ওকোনকুয়ো আফসোস করে এবং এখানেও সেই নওইয়ের মাকে দোষারোপ করে। ওকোনকুয়ো বলে:

> কেমন করে সে নওইর মতো একটা অধঃপতিত এবং মেয়েলি পুত্রের জন্ম দিল? হয়তো ও তার ছেলে নয়। না! ও তার ছেলে হতেই পারে না। তার বউ তাকে ঠকিয়েছে। ওকে সে উচিত শিক্ষা দেবে! কিন্তু নওইর সঙ্গে ওকোনকুয়ো তার পিতা উনোকার, নওইর দাদার, সুস্পষ্ট মিল দেখতে পায়। তখন তার আগের চিন্তা সে তার মন থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। কিন্তু সে, ওকোনকুয়ো, যাকে সবাই বলত আগুনের শিখা, কেমন করে সে ওই রকম মেয়েলি স্বভাবের একটি ছেলেকে জন্ম দিল? নওইর বয়সে সে তার নির্ভীক স্বভাব ও মল্লক্রীড়ায় নৈপুণ্যের জন্য সমগ্র উমুওফিয়ায় বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল।[২১]

ইবো জনগোষ্ঠী নানা রকম রিচুয়াল ও বিশ্বাসে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আধুনিক জনসমাজে তা বর্বর হিসেবে বিবেচিত হয়। ইবো সম্প্রদায়ের কাছে জন্ম-মৃত্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোনো শিশু যদি স্বাভাবিক গঠনে জন্ম নেয়, তাহলে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়, কিন্তু যমজ বা অস্বাভাবিক শিশু জন্ম নিলে তাকে অশুভ বলে ধরে নেওয়া হয় এবং জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলা হয়; যাতে সে আর কোনভাবে মাতৃগর্ভে ফিরে না আসে। ইবো জনগোষ্ঠীর কুসংস্কারকে দূর করতে মিশনারিরা এই যমজ সন্তানকে আপন করে নেয়। তারা গ্রামবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করে যমজ শিশুকে যত্ন নিলে কেউ কখনো মারা যায় না। 'আমি কি মরে গেছি? ওরা বলেছিলো যে যমজ বাচ্চাদের যত্ন নিলে আমি মারা পড়ব। কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি। পৌত্তলিকরা যা বলে সবই মিথ্যা কথা। একমাত্র ঈশ্বরের বাণীই সত্য।'[২২]

এসব দেখে ওকোনকুয়োর মনে হয় এটি মেয়েদের গোত্র। তার পিতার পরিবার হলে এটি কখনও ঘটত না। সে মনে করে তার মায়ের দেশে সে যে সফলতা অর্জন করেছে, তার পিতার দেশে উমুওফিয়া হলে সে আরো বেশি সফল হতে পারত। নির্বাসনে থাকাকালীন সন্তান জন্ম নিলে এননেকা-অর্থাৎ মাতা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাখা হয় কিন্তু ওকোনকুয়ো নির্বাসনে থাকাকালীন তার পুত্র সন্তানের নাম রাখে এমওফিয়া যা অর্থ তেপান্তরে জন্ম নেওয়া। সর্বদিক থেকে সে তার মাতৃকূলকে খাটো করে দেখে ও দুর্বল ভাবে। নির্বাসন শেষে হলে ওকোনকুয়ো তার মাতুলালয়ের জন্য বিশাল এক ভোজের আয়োজন করে। কারণ সে ভাবে এই সাত বছর ধরে তার মাতুলালয়ের লোকজন তাকে যে আদর যত্ন করেছে তার জন্য তাদের প্রতি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এখানে তার চরিত্রের মানবিক দিকটি ফুটে ওঠে। ওকোনকুয়োর ভাষায়:

> গত সাত বছর ধরে আপনারা আমার জন্য যা করেছেন তার মূল্য পরিশোধ করার জন্য আমি এটা করছি না। শিশু তার মাতৃদুগ্ধের মূল্য পরিশোধ করতে পারে না। আমি আপনাদেরকে এখানে একত্র হবার জন্য আমন্ত্রণ করেছি, কারণ আত্মীয়স্বজনদের একত্র হওয়া একটা উত্তম জিনিস।[২৩]

থিংস ফল এপার্ট উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে আচেবে আফ্রিকায় পাশ্চাত্য ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের একটি সর্বজনীন প্যাটার্ন তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের এই অংশেই

শ্বেতাঙ্গদের সাথে ইবো জনগোষ্ঠীর বিরোধ দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গদের আগমনে পুরো উমুওফিয়ার চিত্র পাল্টে যায়। তারা প্রথমে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইবো জনগণের বিশ্বাসে আঘাত হানে। তারা নিঃশব্দে এবং শান্তিপূর্ণভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকে। ফলে নতুন ধর্ম উমুওফিয়াতে বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। তারা জনগণকে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করতে গির্জা নির্মাণ করে। শেতাঙ্গরা ইবো জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। নতুন ধর্ম ও বিশ্বাস ইবো জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করে। সমাজের কেবল নিচু জাতই নয়, মর্যাদাবান ও খেতাবসম্পন্ন মানুষেরাও দলে দলে নতুন ধর্মে যোগদান করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও ইবো জনগোষ্ঠীকে পঙ্গু করে দেয়। ধর্মের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাদের হস্তক্ষেপ শুরু হয়। সরকার গঠন করে তারা বিচারালয় স্থাপন করে, পেয়াদা বসায়, বিচার কাজ পরিচালনা করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে নারীর পারিবারিক অবস্থান আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> উমুওফিয়াতে গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই গির্জা বহু মানুষকে বিপথে টেনে নিয়ে যায়। শুধু নিচু জাতে জন্ম নেয়া মানুষ এবং অচ্ছুৎরাই নয়, কখনো কখনো মর্যাদাবান মানুষেরাও নতুন ধর্মে যোগ দেয়।...শ্বেতাঙ্গ লোকগুলো শুধু গির্জা নয়, একটা সরকারও সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা একটা আদালত নির্মাণ করে, সেখানে জেলা কমিশনার কিছুই না বুঝে, বিচারকার্য পরিচালনা করে।[২৪]

গির্জার পাশাপাশি খ্রিস্ট ধর্মযাজক মিস্টার ব্রাউন উমুওফিয়ায় স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন পরিবারে ঘুরে ঘুরে তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে বিনীত অনুরোধ করেন। তিনি অনেক যুক্তি দেখিয়ে তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, আগামী দিনগুলোতে লেখাপড়া জানা মানুষগুলো এ পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে। তারা যদি লেখাপড়া না শিখে তাহলে হয়ত ভিনদেশি লোক এসে তাদের শাসন করবে। ইতোমধ্যে এর নমুনা তারা দেখতে পেয়েছে। তিনি সবাইকে বোঝাতে থাকেন শিক্ষিত হলে ইবোরা আদালতের পিয়ন ও পেয়াদা হতে পারবে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে গির্জা ও স্কুলের সংখ্যা হাত ধরাধরি করে বাড়তে থাকে। এর মাধ্যমে আচেবে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিষয়টি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলেন:

> স্কুলে কয়েক মাস পড়ার পরই একটা লোক আদালতের পেয়াদা বা পিয়ন হতে পারে, এমনকি কোর্টের কেরানীও হতে পারে। যারা স্কুলে আরো বেশি সময় কাটাতে পারে তারা শিক্ষক হন। আর উমুওফিয়ার শ্রমিককুল প্রবেশ করে দ্রাক্ষাক্ষেতে। চারপাশের গ্রামগুলোতে নতুন নতুন গির্জা নির্মিত হয়, সেই সঙ্গে কিছু স্কুলও। প্রথম থেকেই ধর্ম এবং শিক্ষা হাত ধরাধরি করে চলে।[২৫]

তাছাড়া উমুওফিয়াতে ব্রিটিশরা একটি বাণিজ্যকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করে। তারা মুদ্রার বিষয়টি ইবো জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে সক্ষম হয়। তাদের জন্যই তালের তেল এবং শাঁস মূল্যবান সামগ্রী হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং বাইরের পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উমুওফিয়া ব্রিটিশদের অধীনে চলে আসে। পরিবর্তিত এই অবস্থায় ওকোনকুয়ো ও ওবিরিকা প্রচণ্ড পীড়িত হয়। তারা নানাভাবে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে ব্রিটিশরা তাদের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। মানতে না পেরে ওকোনকুয়ো দু'জন পেয়াদাকে হত্যা করে বসে। ফলে নিজের জীবনে সে ডেকে নিয়ে আসে চরম এক ট্রাজেডি। হত্যার পর সে বুঝতে পারে যে, উমুওফিয়াবাসীরা যুদ্ধ করবে না। কারণ অন্য পেয়াদাদেরকে উমুওফিয়াবাসীরা পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও হৈ-চৈ সৃষ্টি করে। এসব ঘটনা দেখে আদালতের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আগেই সে আত্মহত্যা করে। জেলা কমিশনার

ওকোনকুয়োকে খুঁজতে খুঁজতে সে গাছের সামনে এসে উপস্থিত হয়, যেখান থেকে ঝুলছিল ওকোনকুয়োর দেহ। তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওকোনকুয়োর বন্ধু ওবিরিকার ভাষায় এ অবস্থার বর্ণনা:

> ওবিরিকা এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার বন্ধুর ঝুলন্ত দেহের দিকে তাকিয়েছিল। সে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে জেলা কমিশনারকে লক্ষ্য করে হিংস্র গলায় বলল, ওই লোকটি ছিলেন উমুওফিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। আপনারা ওঁকে আত্মহত্যার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। আর এখন তাকে কবর দেয়া হবে একটা কুকুরের মতো।[২৬]

ইবো সমাজকে অপমানিত করেছে তার নিজের লোকেরাই। নিজেদের সংস্কৃতি বিনাশের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কিন্তু ওকোনকুয়ো তার নিজের জীবন দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছে। ওকোনকুয়োর জীবনের ট্রাজেডি ঠিক এখানেই। ফলে পশ্চিমারা আইবোর সকল বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আচার, আচরণ, ধর্ম-প্রথা ভেঙে দেয়। তারা একটা নতুন দেয়াল নির্মাণ করে– সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। ওবিরিকার ভাষায়: 'আমাদের গোত্র এখন আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে না। যেসব জিনিস আমাদের এক করে রাখত তারা সেখানে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে, এখন আমরা ভেঙে-চুরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।'[২৭]

ঔপন্যাসিক এখানে দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের আগমনে ইবো সমাজের বিরূপ প্রভাব এবং সেই প্রভাব মানুষগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করেছে। ইবো সমাজের ভাঙন রোধ করে পূর্ণ বিকাশের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যকার সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করে ইকওয়েফি কিছু দৃষ্টান্ত দেখালেও তা ঐ সমাজের রীতিনীতিকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেওয়ার মতো শক্তিশালীভাবে চড়াও হতে পারেনি। খ্রিস্টীয় ধর্ম-ধর্মান্তরিত নারীদের যে মর্যাদা দিয়েছিল পুরুষতান্ত্রিক ইবো সমাজ নারীদের সে মূল্যায়ন করেনি। ফলে তাদের লোকজীবনের ঐক্যচেতনা ভঙ্গুর হয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই বিভক্তির ফল হিসেবে ঔপন্যাসিক কৌশলে নওইকে দায়ী করেছেন। ওকোনকুয়ো নির্বাসন শেষে উমুওফিয়াতে এসে দেখে কেবল নওই নয়, অধিকাংশ জনগোষ্ঠী সাদা মানুষদের দেখানো পথ অনুসরণ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। নওইয়ের এই মনোভাব পরিবর্তনের পেছনে লেখক ঔপনিবেশিক শাসনের পাশাপাশি ইবো সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার এবং নারীর অবমূল্যায়নের প্রসঙ্গকেও ইঙ্গিত করেছেন। ইবো সমাজকে রক্ষার জন্য নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতার দিকেও জোর দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। নারীরা পুরুষের অধীনে থাকলেও অনেকক্ষেত্রে তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদের সংগ্রামকে দমনের চেষ্টা করেছে। নারী-পুরুষের ঐক্য ও ভারসাম্য রক্ষিত হলে তারা একত্রে শ্বেতাঙ্গকে মোকাবেলা করতে পারতো। তাই ইবো সমাজ ধ্বংসের পেছনে উপনিবেশি শক্তির প্রভাব যেমন ছিল তেমন ঐ জনগোষ্ঠীর নারী অবদমনের বিরোধী মনোভাবও বিশেষভাবে দায়ী। সর্বোপরি ঔপন্যাসিক ইবো সমাজে নারীর দুর্বল অবস্থান দেখানোর পাশাপাশি তাদের অস্তিত্ববোধ ও বিকাশ সম্ভাবনাকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. চিনুয়া আচেবে, *থিংস ফল এপার্ট*, *কবির চৌধুরী (সম্পাদিত)*, *সবকিছু ভেঙে-চুরে যায়*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৮), পৃ: ০৭
২. ড. এলহাম হোসেন, *আফ্রিকার সাহিত্য ভাবনা* (ঢাকা: বাঙ্গালা গবেষণা প্রকাশনা), পৃ: ১১৭
৩. উদ্ধৃত, রাশিদা আখতার খানম, "নারীবাদী তত্ত্ব ও মতিজানের মেয়েরা", বেগম আকতার কামাল (সম্পাদিত), *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৪), পৃ:২৩৯
৪. চিনুয়া আচেবে, *থিংস ফল এপার্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭-১৮
৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ: ১৫৮
৬. চিনুয়া আচেবে, *থিংস ফল এপার্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭-২৮
৭. তদেব, পৃ: ২৬-২৭
৮. তদেব, পৃ: ২৬
৯. তদেব, পৃ: ৪০
১০. তদেব, পৃ: ২৬
১১. তদেব, পৃ: ৪৮
১২. তদেব, পৃ: ১১৩
১৩. তদেব, পৃ: ৪২
১৪. চিনুয়া আচেবে, *থিংস ফল এপার্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪
১৫. তদেব, পৃ: ৮৩
১৬. তদেব, পৃ: ৫৪
১৭. তদেব, পৃ: ৯২
১৮. তদেব, পৃ: ৯৩
১৯. তদেব, পৃ: ১৩৩
২০. মুহম্মদ মুহসিন, *ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবে: পাঠ ও বীক্ষণ* (ঢাকা: কবি প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ: ২৪
২১. চিনুয়া আচেবে, *থিংস ফল এপার্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫১
২২. তদেব, পৃ: ১৫৫
২৩. তদেব, পৃ: ১৬২
২৪. তদেব, পৃ: ১৬৯-১৭০
২৫. তদেব, পৃ: ১৭৬
২৬. তদেব, পৃ: ১৯৯
২৭. তদেব, পৃ: ১৭২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

রবীন্দ্রসংগীতে লোকগানের প্রভাব

নুসরাত জাহান প্রভা*

Abstract

Rabindranath Tagore's musical compositions reveal his expressive artistry. In one division of Rabindranath's musical composition, the Secular spirituality of the countryside life of East Bengal and the variety of natural forms of the Padmalalita landscape particularly influenced him. The presence of these associations related to nature and public life can be seen in a Rabindranath's lyrics at various stages. Especially in the analysis of the lyrics of his (Swadesh Parjay) Songs, it is possible to find out that he has added the everyday aspects of the mundane public life of East Bengal to his music. Rabindranath was impressed by the uncomplicated melody of East Bengal. He was also influenced by Baul, Kirtan, Sari, Ramprasadi tunes of the region. As an expression of patriotism, Rabindranath saw this melody as a song of worship, and also in the prayer of God. In this study, text analysis method, Comparative method and descriptive method are used to investigate the influence of East Bengal in the lyrics and melody of Rabindranath's musical compositions.

চাবিশব্দ: রবীন্দ্রনাথ, বাণী, সুর, রবীন্দ্রসংগীত, গান, লোকগান।

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

বাংলা শীলিত সংগীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সর্বাগ্রে স্মরণীয় একটি নাম। তাঁর সংগীতচিন্তায় লোকগানের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। লোকগানের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গানে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে প্রকৃতি ও মানুষের মিলনে সৃষ্ট সৌন্দর্য অবলোকন করেন। সেসময় পূর্ববঙ্গে অবলোকিত সৌন্দর্যচিন্তার সারাৎসার তাঁর সংগীত রচনায় সার্থক অনুষঙ্গ রূপে প্রতিফলন হয়েছে।[১] রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ছিন্নপত্রাবলি*সহ নানান প্রবন্ধে ও পত্রালাপে পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত, জনজীবন, প্রকৃতি, সংস্কৃতি, জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।[২] রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতানে'র গানের বাণী, সুর ও ছন্দ বিশ্লেষণ করলে লোকগানের অভিজ্ঞতার সারাৎসারকে তিনি যেভাবে তাঁর সংগীত রচনায় সার্থক অনুষঙ্গরূপে বিন্যস্ত করেছেন তা অনুধাবন করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সংগীতচিন্তা* গ্রন্থে 'সুর ও সংগতি' প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রালাপ ও আলোচনায় তিনি বাংলার সংগীত বিষয়ে বলেছেন- '... বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ।'[৩] রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার কাঠামোতে পূর্ববঙ্গের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে তিনি স্বকীয় ও সার্থক রূপে প্রয়োগ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর সংগীত বিষয়ক ভাবনায় লোকগানের প্রভাব এক বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে।

গবেষণার লক্ষ্য- উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা এবং সংগীতের বাণী ও সুরে লোকগানের প্রভাব কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা যাচাই করা এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গবেষণা করতে গিয়ে পাঠ্যবিশ্লেষণ পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে অনুসন্ধান করা হয়েছে রবীন্দ্রমানসে লোকগানের কতটুকু প্রভাব রয়েছে। তারপর রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায়, বাণী ও সুরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে লোকগানের অনুষঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণাকর্মের তাৎপর্য

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে রচিত *রবীন্দ্রসংগীত* গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ 'দেশি সংগীতের প্রভাব' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটিতে দেশি সংগীত সম্পর্কে সবিস্তার প্রকাশ করেছেন। শুধুমাত্র লোকগানের আলোচনা কেন্দ্রিক না হওয়ায় এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রমননে লোকগানের প্রভাব বিশ্লেষণ অনুপস্থিত।[৪] *বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ* গ্রন্থে কঙ্কর সিংহ 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে শুধুমাত্র স্বদেশ পর্যায়ের গানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৫] এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথে সাথে লোকগানের যোগসূত্র এবং প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়নি। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী রচিত *সংগীত সংজ্ঞার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে 'রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার সুর' নামক প্রবন্ধে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তন, বাউল, সারি ও রামপ্রসাদী গানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৬] *শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে অবস্থানকালের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের ওপর এর প্রভাব এই গ্রন্থে অনুপস্থিত।[৭] সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতে লোকগানের প্রভাব বিশ্লেষণ ও উদ্‌ঘাটন একটি মৌলিক গবেষণা।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তায় পূর্ববঙ্গ

১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে জমিদারি তদারকির মতো এমন বিপুল দায়িত্ব এসে যুক্ত হয়। জমিদারি দায়িত্ব সূত্রে ঠাকুর পরিবারের তিনটি পরগণা- বিরাহিমপুর, কালিগ্রাম ও সাহাজাদপুর গ্রামের সাথে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম এক নিবিড় পরিচয় ঘটে।[৮] এই সময় তিনি পর্যায়ক্রমে বাংলার অন্তরের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনকে পূর্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। প্রকৃতির সাথে জীবনের বাস্তবতাকে এমন নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ তিনি ইতিপূর্বে পাননি। রবীন্দ্রনাথের মতে, মহানগরীতে তিনি যে জনজীবন ব্যবস্থা দেখেছেন তা পরিবেশচ্যুত কৃত্রিম নাগরিক জীবন ব্যবস্থা।[৯] অপরদিকে পূর্ববঙ্গের জনজীবন ব্যবস্থাকে তিনি প্রকৃতি ও মানুষের মিলনে সৃষ্ট এক বাস্তবিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন। এই অনুধাবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য জীবনে হৃদয়াবেগের আতিশয্যকে মৃদু করেছিলেন এবং পদ্মাপারের নূতন রস, শক্তি ও সৌন্দর্যকে তাঁর সাহিত্যে অধিক স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ছিন্নপত্রাবলি*তে বাংলার জনজীবন, প্রকৃতির ঋতুবদলের রূপ, নদীপারের গল্প, প্রকৃতি ও মানুষের সুর ও ছন্দকে সবিস্তরে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁর সংগীত রচনার এক বিশাল অংশে তিনি এই অবলোকিত নির্যাসসমূহ নানান সার্থক অনুষঙ্গরূপে বিন্যস্ত করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতে লোকগানের ভাব ও অনুষঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের প্রাক-যৌবন পূর্বেই তাঁর রচিত সংগীতের বাণীতে পূর্ববঙ্গের লোক অনুষঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতে যেমন বাউল ও ভাববাদী চরিত্রেরা স্থান পেয়েছে তেমনি তাঁর পর্যায় ভিত্তিক গানে ধানের ক্ষেত, নদী, মাঠ, অরণ্য, ধান, মন্দির, পূজা, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত, পথ, বন-প্রকৃতি, কুঞ্জ, উৎসবক্ষেত্র, গ্রাম্য পটভূমি, প্রভৃতি অনুষঙ্গ যোগ হয়েছে।[১০] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে, পদ্মা-কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে বৈরাগী বাউলদের জীবনদর্শনের সাথে পরিচিত হয়েছেন। বাউলের এই মরমি ভাববোধ এবং রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিবেদ্য, রসাভিব্যক্ত ও মর্মস্পর্শীবোধ তাঁকে গভীরতর দার্শনিকত্বে উত্তীর্ণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্যায়ের 'সাধক'[১১] উপপর্যায়ের গানের বাণীতে ভক্তের ঈশ্বর মিলনের মরমি প্রতীকে জীবন-ভাবনার সার্থক শিল্পরূপায়ণ করেছেন এই গানে-

> ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবনসমর্পণ-
> ওরে দীন, তুই জোড়কর করি কর্ তাহা দরশন।[১২]

অরূপ সুন্দরের চিরসন্ধানে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধ এবং বাউল অন্তরে শ্রেয়োপ্রাপ্তির প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'সাধক' উপপর্যায়ে।

> হেরো গো অন্তরে অরূপসুন্দরে, নিখিল সংসারে পরমবন্ধুরে,
> এসো আনন্দিত মিলন-অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের 'বাউল' উপপর্যায়ের গানের বাণীতে বাউলদের 'মনের মানুষ' এর অন্বেষণ এবং রবি-বাউলের অন্তরে ঈশ্বর অন্বেষণের বাসনা একই মাত্রায় যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন-

> আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের মানুষ তথা ঈশ্বর সন্ধানে আরও বলেছেন-

> আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
> তাই হেরি তায় সকল খানে।[১৫]

তিনি আত্ম-জাগরণের তত্ত্বাদর্শ যেন সময় থাকতেই জাগ্রত হয় সেই প্রত্যাশায় রচনা করেছেন-

আমার মন যখন জাগলি না রে
ও তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের 'পথ' উপপর্যায়ের গানের বাণীতে তিনি গ্রামীণ অনুষঙ্গের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর অন্বেষণের বার্তা দিয়েছেন-

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এ পারে, কেউ পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।[১৭]

গানের বাণীতে রবীন্দ্রনাথ খেয়া, পারের ঘাট, পথিকের বাঁশি প্রভৃতি লোক অনুষঙ্গের উপস্থিতিতে ঈশ্বর অন্বেষণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানের সংখ্যা অত্যল্প হলেও সে সকল গানের বাণী, সুর ও ছন্দের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে তার স্বকীয় প্রাসঙ্গিকতার উদ্দীপ্ততা প্রকাশ পায়। শিলাইদহ, কুষ্টিয়া-পদ্মাতীরস্থ জনপদের অন্তর্প্লাবী সুরের এবং বোধের মন্ত্রোচ্চারণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ'[১৮] পর্যায়ের গানে। স্বদেশের আত্মশক্তি জাগরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মনুষ্যবোধ, সংকীর্ণতা, জনসচেতনতার নির্ভীক উচ্চারণ করেছেন তাঁর 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানে। স্বদেশকে 'জননী' রূপের সম্বোধনে তিনি রচনা করেছেন- 'আমার সোনার বাংলা'[১৯], 'ও আমার দেশের মাটি'[২০], 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'[২১], 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে'[২২], 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'[২৩], 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক'[২৪], 'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?'[২৫], 'জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে'[২৬] প্রভৃতি। স্বদেশের প্রতি আত্মনিবেদনে এবং নিজ দেশকে 'মা' সম্বোধনের যেকোন একটি গানের বাণী বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট অনুধাবন করা সম্ভব যে স্বদেশের মাটি, প্রকৃতি, শস্য, মাঠ, বায়ু প্রভৃতি সন্তান রূপে শুধুমাত্র যে আমরা প্রতিনিয়ত নিয়েছি তার প্রেক্ষিতে আমরা যেন দেশকে একত্ম হয়ে সযত্নে আগলে রাখতে পারি সেই শক্তি কবি শক্তিদাতা অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতি' পর্যায়ের বিভিন্ন গানের বাণীর প্রেক্ষাপটের সূত্রপাত সম্পর্কে তিনি তাঁর *ছিন্নপত্রাবলি*তে সবিস্তরে প্রকাশ করেছেন। শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ যেমন বসন্তের প্রথম পূর্ণিমায় তিনি মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন তেমনি পতিসরে আষাঢ়ের রূপ বিন্যাসে তিনি লিখেছেন- 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া'[২৭]। রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্রাবলি*র বিভিন্ন পত্রে পূর্ববঙ্গের নানান অঞ্চলের ঋতুবৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতার প্রকাশ মেলে।[২৮] তিনি কোনো পত্রে প্রকৃতি ও জনজীবনের প্রেক্ষিতে গানের বাণী গঠনের বার্তা দিয়েছেন আবার প্রকৃতির উন্মত্ততার সুরেও রচনা করেছেন 'প্রকৃতি'[২৯] পর্যায়ের গান। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনায় বহুমাত্রিক দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। 'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানের বাণীতে প্রকৃতির সজ্জিত রূপ, নিঃসঙ্গতা, প্রকৃতির নিঃস্বার্থদান, একত্মতাসহ মানব ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বার্তা প্রকাশিত হয়েছে।

বাউলধর্ম এবং বাউলসুলভ অনুধ্যান রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম চিন্তা ও তাঁর দর্শনবোধের মরমি উপাদানকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই লোকায়ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'গীতাঞ্জলি'[৩০], 'গীতিমাল্য'[৩১], 'গীতালি'[৩২] ও নৈবেদ্যে'র[৩৩] গানে। আত্মজাগরণের আধ্যাত্ম বোধ থেকে কবি তাঁর গীতাঞ্জলিতে রচনা করেছেন-

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"[৩৪]

পরশমণির ছোঁয়ায় নিজ জীবনকে দহন দানে পুণ্য করার প্রার্থনা করেছেন কবি তাঁর 'গীতালি'[৩৫] কাব্যগ্রন্থে। কবির মতে, হৃদয়ের সকল কালো ঘুচলেই তবে সেই হৃদয় আলোর পথ পাবে। এই আধ্যাত্মবোধে কবি রচনা করেছেন-

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতিমাল্য'[৩৭] কাব্যগ্রন্থে ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। জীবন সংসারে ভক্ত ও ঈশ্বরের মাঝে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার নানা খেলা চলে। তবে দিনশেষে ভক্ত উপলব্ধি করে যে, ঈশ্বরের প্রেমে আঘাত থাকলেও সেখানে কোনো অবহেলার স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে বলেছেন-

নয় এ মধুর খেলা–
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা নয় এ মধুর খেলা।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যসংগীতসমূহে ঈশ্বরখোঁজ আরও বিশদ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে তিনি বাউলদের মতো 'মনের মানুষ' বা ঈশ্বরকে খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর এই বৈরাগী ভাববোধই তাঁকে 'রবিবাউল' করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার সুরের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের গানে বাংলার সুরের প্রভাব অনুসন্ধান করলে বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী ও সারি গানের সুরের প্রাধাণ্য লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের সাথে পত্রালাপে বলেছেন- 'বাংলার সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়।'[৩৯] কীর্তনের একটি বিশেষ উপাদান হলো 'আঁখর'। আঁখর ও কীর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আলাপ-আলোচনা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন- 'ছন্দোবদ্ধ বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবে আঁখরের দৈন্য অনিবার্য, কীর্তনের সুরের ঐশ্বর্য সেটাকে পূরণ করে দেয় বলেই সেটাতে রসের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কীর্তনে-সুরে বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে।'[৪০] রবীন্দ্রসংগীতে প্রভাবিত সুরের বিভিন্ন অঙ্গভিত্তিক গানের মধ্যে কীর্তন অঙ্গ এবং বাউল অঙ্গের গানের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আঁখর যুক্ত কীর্তন অঙ্গের গান- 'ওহে জীবনবল্লভ ওহে সাধন-দুর্লভ'[৪১], 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'[৪২], 'কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে'[৪৩], 'আমি জেনে-শুনে তবু ভুলে আছি'[৪৪]। এছাড়া শুধুমাত্র কীর্তনের সুরের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কীর্তন অঙ্গের গান- 'যেতে যেতে চায় না যেতে'[৪৫], 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ'[৪৬], 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল'[৪৭] প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের বাণী ও সুরের যে সমান্তরাল গঠন সেই বিষয়টিতে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি তাঁর কীর্তন অঙ্গের গানে নানান বিষয় যুক্ত করেছেন শুধুমাত্র প্রার্থনায় বেঁধে রাখেননি বরং কীর্তনের সুর সকল বিষয়ের সাথে একাত্ম হতে সক্ষম তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সফলভাবে ফুটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরের কাঠামোর রস স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেছেন। বাউল সুরে রাগরাগিণীর মিশ্রণ যেমন- ঝিঁঝিট, বিভাস, খাম্বাজ, পিলু, কাফি প্রভৃতি সংযোগে নব-নির্মাণ করেছেন তাঁর বাউল অঙ্গের গান। 'হরি তোমায় ডাকি'[৪৮], 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'[৪৯], 'আমি নিশি নিশি কত

রচিব'[৫০], 'ওগো এত প্রেম আশা'[৫১], 'জোনাকি কী সুখে'[৫২], 'আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে'[৫৩] প্রভৃতি বাউল অঙ্গের গানে বাউল সুরের সাথে মিশ্র রাগ-রাগিণীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাউল গান সম্পর্কে তাঁর 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থের 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন- "একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতে মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলো স্বাধীন।"[৪৪] বাউলের মতো এমন স্বাধীন সুর সহজেই লোকসাধারণের মর্মমূলে স্বদেশপ্রীতির তাড়না সঞ্চার করবে রবীন্দ্রনাথ তা অনুধাবন করেছিলেন। 'বিধির বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে'[৫৫], 'এখন আর দেরি নয় ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো'[৫৬], 'ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে'[৫৭], 'ওরে তোরা নেই বা কথা বললি'[৫৮], 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে'[৫৯], 'যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু'[৬০] স্বদেশপ্রীতির এমন বিশটি গান বাউলের সুরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন এবং তা 'বাউল'[৬১] পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সকল পর্যায়ের গানেই বাংলার লোক সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে তাঁর 'স্বদেশ'[৪৮] পর্যায়ের গানে কীর্তন, বাউল, সারি প্রভৃতি লোক সুরের প্রভাবিত প্রয়োগের পরিমাণে যেমন আধিক্য রয়েছে তেমনি গানগুলোর সার্থক রূপের স্বকীয় প্রকাশ ঘটেছে। স্বদেশি গানের যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুরের ধারাকে লোক সুরের রূপে বেঁধেছেন। রবীন্দ্রনাথ লোক সুরকে তাঁর মর্মের চিত্তলোকে ধারণ করেছেন এবং সেই সুরকে তাঁর দর্শনে, রচনায় এবং সংগীতচিন্তায় গভীরভাবে প্রয়োগ করেছেন।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত রচনায় গ্রামীণ জনজীবন ও সংস্কৃতির প্রাচুর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বাংলার লোকসংগীত সংরক্ষণ ও সংগ্রহে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি 'বাউল গান' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন- "গ্রাম্য গাঁথা ও প্রচলিত গীতসমূহ সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভালো করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না।"[৬৩] রবীন্দ্রনাথের জমিদারি দায়িত্বে তাঁর পূর্ববঙ্গে আগমন ঘটে এবং বাংলার জনজীবন ব্যবস্থাকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করেন যা তাঁর জীবনদর্শন, মর্মবোধকে আরও পরিণত করেছে। তিনি লোকসাহিত্যের সংগ্রহে শুধুমাত্র অনুপ্রেরণা দেননি বরং তিনি তাঁর নিজ রচনায় লোক অনুষঙ্গকে রাজ আসন দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী, সুর ও ছন্দে সমৃদ্ধ লোক অনুষঙ্গের প্রয়োগে 'রবীন্দ্রসংগীত' গীতধারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ ১৩৪০), পৃ. ৩০৪
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলি* (কলকাতা: বিশ্বভারতী ১৮৯৫), পৃ. ২৫০
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী ১৩৯৯), পৃ. ৯৭
৪. বিস্তারিত- শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ ১৩৪৯)
৫. বিস্তারিত- কঙ্কর সিংহ, *বঙ্গভঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ* (কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ২০১২)
৬. বিস্তারিত- প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *সংগীত সংজ্ঞার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতা: একুশ শতক ২০০৮)
৭. বিস্তারিত- প্রমথনাথ বিশী, *শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: গ্রাফোসম্যান পাববলিকেশন ২০১৪)

৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫
৯. তদেব, পৃ. ৩০৪
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৩৯), পৃ. ৭
১১. তদেব, পৃ. ৩
১২. তদেব, পৃ. ১২৭
১৩. তদেব, পৃ. ১২৭
১৪. তদেব, পৃ. ২১৫
১৫. তদেব, পৃ. ২১৬
১৬. তদেব, পৃ. ২১৭
১৭. তদেব, পৃ. ২২১
১৮. তদেব, পৃ. ৩
১৯. তদেব, পৃ. ২৪৩
২০. তদেব, পৃ. ২৪৪
২১. তদেব, পৃ. ২৪৭
২২. তদেব, পৃ. ২৫৫
২৩. তদেব, পৃ. ২৫৭
২৪. তদেব, পৃ. ২৫৯
২৫. তদেব, পৃ. ২৬২
২৬. তদেব, পৃ. ৭
২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলি* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৮৯৫), পৃ. ২১৭
২৮. তদেব, পৃ. ২২৯
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৩৯), পৃ. ৭
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৩৯), পৃ. ২৭
৩১. তদেব, পৃ. ২২৩
৩২. তদেব, পৃ. ২৩৮
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলি*, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৮৯), পৃ. ১১২
৩৪. তদেব, পৃ. ২৯
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২
৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৪০. তদেব, পৃ. ৬৮
৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫২
৪২. তদেব, পৃ. ৮৫১
৪৩. তদেব, পৃ. ১৯৬

৪৪. তদেব, পৃ. ৮৪৭
৪৫. তদেব, পৃ. ৭১
৪৬. তদেব, পৃ. ২১৮
৪৭. তদেব, পৃ. ৩৮৮
৪৮. তদেব, পৃ. ৮৪০
৪৯. তদেব, পৃ. ৮২০
৫০. তদেব, পৃ. ৩৯১
৫১. তদেব, পৃ. ৩৯১
৫২. তদেব, পৃ. ৫৮২
৫৩. তদেব, পৃ. ২৪৬
৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬
৫৬. তদেব, পৃ. ২৬০
৫৭. তদেব, পৃ. ২৬০
৫৮. তদেব, পৃ. ২৫৮
৫৯. তদেব, পৃ. ২৪৫
৬০. তদেব, পৃ. ২৫৮
৬১. তদেব, পৃ. ৭
৬২. তদেব, পৃ. ৭
৬৩. করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৩৯৯), পৃ. ১৪৫

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

ইকবালের দর্শনে আত্মার ধারণা : একটি বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আবদুস সালাম*

Abstract

Muhammad Iqbal is one of the most influential muslim philosophers. He was not only a philosopher but also a poet and a visionary thinker who sought to bridge the gap between traditional islamic thought and modern philosophical discourse. Central to Iqbal's philosophy is the concept of the khudi (self), which serves as a cornerstone for understanding his perspective on the soul. According to Iqbal, the soul is not a passive, abstract entity but an active and dynamic force that evolves and realizes its potential through self-awareness, action and relationship with the Divine. Iqbal uses the term khudi to describe the soul or self. Actually the words self, ego, soul and mind express all the same meaning. Philosophy of self is the part of his metaphysics. In this paper I have discussed Iqbal's notions about self with special reference to his writing which is his lecture series *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Before explain the concept of self in Iqbal's philosophy I tried to give a summary of different muslim philosophers thought on self. Iqbal's thought was guided by the muslim thinkers and Qur'anic teachings but sometimes he followed by the western thinkers like Kant, Bergson, Neitzsche, Bradley, William James and others. All the views of them led Iqbal to accept the reality of self but all this could not satisfy his mind. So he would affirm the knowledge of the self. He claim that intuition must be the way to affirm the knowledge of the self and others metaphysical subject. Finally, in this paper, I have tried to explain some characteristics of the self after Iqbal.

চাবিশব্দঃ আত্মা, স্বজ্ঞা, সত্তা, চেতনা, অভিজ্ঞতা।

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

মুহাম্মদ ইকবাল, যিনি আল্লামা ইকবাল নামেই সমধিক পরিচিত, ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, আইনবেত্তা ও মরমিবাদী ছিলেন। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন মরমি চেতনা ফুটে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি দেশপ্রেমের তীব্র বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। তবে ইকবালের কবিতায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রবল। ইকবালের অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ হলোঃ *The Reconstruction of Religious Thought in Islam.* মাদ্রাজের একটি সাহিত্য সমাজের আমন্ত্রণে তিনি যে ছয়টি বক্তৃতা প্রদান করেন, সেই বক্তৃতামালাই মূলত এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আর এটা ছিল ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। তাঁর এই দার্শনিক চেতনা গ্রিক দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়; বরং তিনি গ্রিক দর্শনের সমালোচনা করে বলেন, গ্রিক দর্শন সম্পূর্ণরূপে অনুমানমূলক। আর এই অনুমানমূলক দর্শন কখনই মূর্ত জগতের পরম সত্তা (Ultimate reality) সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। এমনকি অনুমান বা ধারণা দৃশ্যমান জগতের বাস্তবতাকেও অস্বীকার করে। প্লেটোর ধারণায় দৃশ্যমানজগত অবাস্তব। কেননা দৃশ্যমানজগত নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রকৃত জগতকে অবশ্যই স্থায়ী এবং শাশ্বত হতে হবে। ধারণা-ই কেবল স্থায়ী এবং শাশ্বত। আর এজন্য প্লেটো ধারণার জগতকে বাস্তব এবং অভিজ্ঞতার জগতকে অবাস্তব বলেছেন। আর এটাই হলো সকল ভাববাদী দার্শনিকদের অবস্থান এবং তাঁরা মনে করেন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আধুনিক জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মনে করেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া কেবলমাত্র অনুমান বা ধারণা যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি হতে পারে না। অভিজ্ঞতা ছাড়া কেবলমাত্র ধারণা শূন্যগর্ভ। অভিজ্ঞতাপূর্বভাবে কোন জ্ঞান সম্ভবপর নয়। ইকবাল কান্টের দর্শন দ্বারাই অনুপ্রাণিত হন।[১] বিশেষ করে কান্টের এই অভিজ্ঞতাবাদী চেতনার দ্বারা। কেননা ইসলামিক চেতনাও অভিজ্ঞতাকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য কোন কিছুর বাস্তবতাকে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু ইসলামে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাথে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বাস্তবতাকেও স্বীকার করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞান বস্তু জগতের সকল কিছুকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করে। এখানে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জীবন এমনকি চেতনাকেও যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। এই যান্ত্রিকতা অনুসারে মনে করা হয় মানুষের আত্মা কেবলমাত্র যান্ত্রিক শক্তি হিসেবে ক্রিয়া করে, কিন্তু এর নিজস্ব কোন সত্তা নেই। ইকবালের দর্শনের মূল সমস্যা হলো- ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার বাস্তবতা, স্বাধীনতা ও অমরত্বের ধারণাকে যুক্তিসহ সমর্থন করা। ইকবাল অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে কান্টের মতো কেবলমাত্র জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং একজন তেজোদ্দীপ্ত দার্শনিক কবি হিসেবে তিনি ইসলামি মরমিবাদের দরজায় করাঘাত করে সরাসরি আল্লাহর প্রত্যাদেশ, আত্মার রহস্য, আত্মার অমরত্ব ও স্বাধীনতা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে, পরম সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ ও তার প্রকৃতি নিরূপিত হতে পারে বিশেষ এক ধরনের অভিজ্ঞতার দ্বারা, ইকবাল যাকে বলেছেন স্বজ্ঞা (Intuition)। এই স্বজ্ঞার লক্ষ্য হলো সমগ্র সত্য হৃদয়ঙ্গম করা। এটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা যা কেবলমাত্র আল্লাহর পছন্দনীয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি লাভ করে থাকে। যাইহোক, ইকবালের প্রধান দর্শন হলো আত্মা সম্পর্কিত (খুদি) দর্শন। আত্মা (খুদি) হলো তাঁর চিন্তার শুরু এবং মৌলিক বিষয়। এই আত্মার (খুদি) উপরই কেবলমাত্র অধিবিদ্যা সম্ভবপর হয়। আত্মা যথার্থই বাস্তব।

আত্মা অস্তিত্বশীল এবং এই অস্তিত্ব তার নিজ অধিকারেই। আমরা স্বজ্ঞার মাধ্যমে এর বাস্তবতাকে জানতে পারি। আমার আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো ইকবালের দর্শনে আত্মার ধারণা বিশ্লেষণ করা। তবে ইকবালের দর্শনে আত্মার ধারণা আলোচনার পূর্বে বিভিন্ন মুসলিম দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কিত ধারণা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

আমাদের দেশে ইকবালের প্রধান পরিচয় একজন কবি ও দার্শনিক হিসেবে। তবে কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর একাডেমিক পরিচয় হলো তিনি একজন দার্শনিক। কিন্তু তাঁর দর্শন পাঠক মহলে খুব বেশি বিস্তৃত নয়; যদিও তাঁর কবিতার প্রতিটি ভাঁজেই দর্শন ফুটে উঠেছে। তাঁর দর্শনের একটি বিশেষ দিক হলো অধিবিদ্যা। আর অধিবিদ্যক দার্শনিক আলোচনার একটি অন্যতম বিষয় হলো আত্মা। প্রবন্ধটি একটি গুণগত গবেষণাকর্ম। গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে প্রথমেই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, বই, জার্নাল ইত্যাদি বিষয় সংগ্রহ করতে হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায়, গবেষণাকর্মে ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পরে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণী পদ্ধতি (Analytical Method) ব্যবহার করা হয়েছে।

আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম দার্শনিক মত

যে সকল মুসলিম দার্শনিক আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে মিসকাওয়াহ, ইবনে সিনা, আল-গাযালি অন্যতম। প্রথম মুসলিম দার্শনিক হলেন আল-কিন্দি। তাঁকে প্রকৃত আরব দার্শনিকও বলা হয়। তিনি তাঁর *On the Soul* নামক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে আত্মা সম্পর্কিত তাঁর মত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, আত্মা হলো একটি বিশুদ্ধ সত্তা এবং এর সারসত্তা সৃষ্টিকর্তা হতে বের হয়ে এসেছে, যেমনিভাবে সূর্য থেকে আলোকরশ্মি বের হয়ে আসে। আত্মা আধ্যাত্মিক এবং ঐশী সত্তা; সুতরাং দেহ থেকে তা পৃথক এবং ভিন্ন। আত্মা যখন দেহ থেকে আলাদা হয়, তখন জগতের সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি হয় অতিপ্রাকৃত। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আত্মা বোধের জগতে প্রবেশ করে এবং তার আদিস্থান সৃষ্টিকর্তার আলোর জগতে ফিরে যায় এবং তাঁকে (স্রষ্টাকে) অবলোকন করে।[২] বিশুদ্ধ আত্মা যখন দেহ থেকে বের হয় তখন তা স্বপ্ন দেখে এবং অন্যান্য আত্মার সাথে কথোপকথন করে। তবে আত্মা কখনও ঘুমায় না; দৈহিক ঘুমের সময় আত্মা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার পরিত্যাগ করে। আর আত্মা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার পরিত্যাগ করে যখন কেবলমাত্র প্রজ্ঞা ব্যবহার করে, তখনই সে স্বপ্ন দেখে।[৩] তনি মনে করেন, আত্মা এবং জড় বা দেহ দুটি স্বতন্ত্র সত্তা এবং জড় থেকে আত্মার অবস্থান উচ্চ স্তরে। সকল ইচ্ছার উন্মেষ ঘটে আত্মাতে এবং আত্মা কাজের নির্দেশনা প্রদান করে। সুতরাং আত্মার নির্দেশনা মেনে চলাই হলো জড় বা দেহের ধর্ম। কিন্তু দৈহিক নির্দেশনা মেনে চলতে আত্মা বাধ্য নয়। মানবাত্মা দেহের সাথে সংযুক্ত থাকলেও অন্তঃসারের দিক থেকে তা দৈহিক প্রভাবমুক্ত।[৪] অন্য আর একজন প্রভাবশালী মুসলিম দার্শনিক হলেন আল-ফারাবি। তিনি বুদ্ধিতত্ত্বের (Theory of Intellect) সাহায্যে তাঁর আত্মা সম্পর্কিত মত তুলে ধরেছেন। তিনি বুদ্ধিকে ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং তাত্ত্বিক বুদ্ধি এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ব্যবহারিক বুদ্ধির সাহায্যে করণীয় বিষয় অনুসৃত হয় আর তাত্ত্বিক বুদ্ধি আত্মার পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করে। তাত্ত্বিক বুদ্ধিকে আবার জড়ীয়, অভ্যাসগত এবং অর্জিত এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। জড়ীয় বা

সম্ভাব্য বুদ্ধিকে আল ফারাবি কখনো কখনো আত্মা বা আত্মার অংশ বা এমন একটা বৃত্তি বলে অভিহিত করেছেন, যার সাহায্যে সত্তার সারবস্তুকে পৃথক করে অনুধাবন করা যায়। তাঁর মতে, বুদ্ধির স্তরগুলো নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়।[৫] অর্থাৎ জড়ীয় বা সম্ভাব্য বুদ্ধি অভ্যাসগত বা সক্রিয় বুদ্ধির স্তরে এবং সবশেষে অর্জিত বুদ্ধির সাথে উন্নীত হয়। সম্ভাব্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে ধারণ করে, সক্রিয় বুদ্ধি বুদ্ধিগ্রাহ্য বা বোধগম্যকে ধারণ করে এবং ধারণা (Concept) গঠন করে। অর্জিত বুদ্ধি পরস্পর কথোপকথন, তন্ময়তা এবং প্রেরণার স্তরে উন্নীত হয়। ফরাবির মতে, সক্রিয় বুদ্ধি যার মাধ্যমে ধারণা করা হয় তা বিশ্বাত্মা বা আল্লাহ থেকে মানবাত্মায় প্রবেশ করে এবং ব্যক্তির দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তা আবার তার আদি নিবাস বিশ্বাত্মায় ফিরে যায়।[৬] সুতরাং বলা যায়, ফরাবির মতানুসারে আত্মা অমর; তবে তা ব্যক্তি আত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং পরমাত্মায় ফিরে গিয়ে আত্মা অমরত্ব লাভ করে। আর একজন বিশিষ্ট মুসলিম দার্শনিক হলেন ইবনে মিসকাওয়াহ। তিনি জড়বাদীদের বিরুদ্ধাচারণ করে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে বলেন, মানুষের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, যা একই সময়ে ভিন্ন এমনকি বিপরীত আকার গ্রহণ করতে পারে। তবে তা জড়বস্তু নয়, কেননা জড়বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র একটা আকারই গ্রহণ করতে পারে। তিনি মনে করেন, আত্মা সরল এবং জটিল, উপস্থিত এবং অনুপস্থিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য জিনিস প্রত্যক্ষ করতে পারে। তবে আত্মা বিভাজ্য নয়। সুতরাং আত্মার কোন অংশ নেই। অংশ বা বিভাজ্যতা কেবলমাত্র জড়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যতম মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা'র আত্মা সম্পর্কিত মত দেহ-মনের দ্বৈতবাদী তত্ত্বের উপর গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে, দেহের সঙ্গে মন বা আত্মার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই বরং এ সম্পর্ক হলো আকস্মিক সম্পর্ক। আত্মা বাইরে থেকে তথা বিশ্বাত্মা থেকে দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং আত্মা একটি স্বতন্ত্র সত্তা এবং এক ধরনের মরমি সম্পর্কের দ্বারা তা দেহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়। তবে, তা দেহের কোনো আকার (Form) নয়।[৭] স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ক্রমবর্ধমানভাবে নিজেকে বিকশিত করে। দেহের সঙ্গে আত্মার আবশ্যিক সম্পর্ক না থাকায় দেহের বিনাশের সাথে সাথে আত্মার বিনাশ ঘটে না; বরং আত্মা অমর এবং দেহাবসানের সাথে সাথে তা' তার আদি নিবাসের সঙ্গে মিলিত হবে। তবে এই মিলনের অর্থ বিশ্বাত্মার সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়া নয়; বরং আদি উৎস হিসেবে বিশ্বাত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে সসীম আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলা। ইবনে সিনা আত্মার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। যথা:

১. উদ্ভিদাত্মা (Vegetative Soul)
২. জীবাত্মা (Animal Soul)
৩. মানবাত্মা (Human Soul)।[৮]

এদের মধ্যে কেবল মানবাত্মাই উচ্চতর বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। এই প্রাজ্ঞিক মানবাত্মার সর্বোচ্চ বৃত্তি হলো ধ্যান-অনুধ্যান এবং বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা। যার মাধ্যমে সে অন্যান্য মানসিক বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। আত্মার এই পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। আর আত্মার এই পূর্ণ বিকাশের পর্যায়ে মানুষ পরমসত্তা সম্পর্কে স্বজ্ঞা প্রসূত সরাসরি জ্ঞান অর্জন করে। হুজ্জাতুল ইসলাম হিসেবে খ্যাত আল-গাযালি'র আত্মা সম্পর্কিত ধারণা কোরআন ও হাদিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে

উঠেছে। গাযালি মনে করেন, আত্মা হলো একক এবং আবশ্যিকভাবেই এক ধরনের ইচ্ছা। আল্লাহ যেমন জগতের বাইরে এবং ভিতরে উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থান করে, আত্মাও তেমনি দেহের ভিতরে এবং বাইরে অবস্থান করে। 'আল্লাহ মানুষকে তার নিজ প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টি করেছেন'।[৯] 'আল্লাহ মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করে তার মধ্যে রুহকে ফুঁকে দিয়েছেন'।[১০] আত্মা একটি আলোকিত আয়নাস্বরূপ যা ঐশী স্ফুলিঙ্গের দ্বারা আল্লাহর গুণাবলি এমনকি আল্লাহর সারসত্তাকে প্রতিফলিত করে। গাযালি মনে করেন, আত্মায় কেবলমাত্র ব্যক্তির মানুষের গুণাবলিই প্রতিফলিত হয় না; বরং আল্লাহর গুণাবলিও প্রতিফলিত হয় এবং ব্যক্তি আত্মার মধ্য দিয়ে যেমন তার নিজের অস্তিত্বের ভাব ফুটে ওঠে তেমনি আল্লাহর অস্তিত্বের ভাবকেও জাগিয়ে তোলে।[১১] মূলত আল্লাহকে জানার চাবিকাঠি হলো নিজেকে জানা। হাদিসে এসেছে 'যে নিজেকে জেনেছে সে তার রবকে জেনেছে'। গাযালি মনে করেন, আল্লাহ এবং আত্মা উভয়ই অদৃশ্য, অবিভাজ্য, স্থান এবং কালে আবদ্ধ নয় এবং গুণ ও পরিমাণের ক্যাটাগরির বাইরে। এমনকি কোনো ধরনের আকৃতি, বর্ণ, আকার ইত্যাদির ধারণা তাদের উপর আরোপ করা যায় না। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যাবতীয় পদার্থ থেকে ভিন্নতর এবং শ্রেষ্ঠ। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ দু'টি যথা:

১. জ্ঞান ও
২. ক্ষমতা।[১২]

আত্মা অবিভাজ্য হলেও এই সুবিশাল জগতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান আত্মা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করে। জাগতিক বিষয়ের পাশাপাশি আত্মার সামনে আধ্যাত্মিক জগতের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান আত্মা তিন ভাবে লাভ করতে পারে। যথা:

১. নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে
২. দেহাবসানে মৃত্যুর পরে চাক্ষুষভাবে
৩. জাগ্রত অবস্থায় এলহাম অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে উদিতভাবযোগে।

গাযালি মনে করেন দুই ধরনের জগত রয়েছে। যথা:

১. আদেশের জগত এবং
২. সৃষ্ট জগত।

আত্মা আদেশের জগতের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "তারা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন "আত্মা আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত।"[১৩] আদেশের জগত হিসেবে আত্মা সৃষ্ট জগতকে শাসন করে। নির্দেশনা হলো এক ধরনের ঐশী ক্ষমতা, যা জগতকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং আত্মা হলো এক ধরনের আধ্যাত্মিক বিষয় যা দেহকে সজীব রাখে এবং তাকে (দেহকে) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। দেহ হলো এক ধরনের যন্ত্র বিশেষ যা আত্মার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১৪]

আত্মা সম্পর্কে ইকবালের মত

ইকবাল আত্মাকে (খুদি) বাস্তব সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা একে জানতে পারি। স্বজ্ঞা আমাদেরকে কেবলমাত্র আত্মার বাস্তবতার নিশ্চয়তাই প্রদান করে না: বরং আত্মার সারবস্তু এবং প্রকৃতিও স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়।[১৫] তবে সর্বেশ্বরবাদীগণ আত্মার বাস্তব সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে, ঘটনার জগত অনস্তিত্বশীল এবং অবাস্তব। কেননা জগতের সব কিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার সাথে সাথে মানুষ, তার সামাজিক ও নৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা এবং দায়-দায়িত্বও একটা পর্যায়ে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। কর্ম, প্রচেষ্টা, উন্নতি ইত্যাদি স্বতন্ত্র হোক বা জাতীয় হোক এদের কোন বাস্তবতা নেই। সুতরাং সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কোন অভিজ্ঞতা বা বস্তু জগতের কোন বাস্তবতা নেই। আর বস্তু জগতের কোন কিছুরই যদি বাস্তবতা না থাকে, তাহলে আত্মারও কোন বাস্তব সত্তা নেই। ইকবাল প্রথম দিকে সর্বেশ্বরবাদ এর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও পরবর্তীকালে সর্বেশ্বরবাদী মতকে খণ্ডন করেন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়-উপাত্ত এবং চিন্তার প্রত্যক্ষণগত স্তরকে অবাস্তব হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

অস্তিত্বের রূপ হল আত্মার পরিণাম,
সবকিছুই আত্মার রহস্য
যা দেখছ তুমি,
জাগ্রত হল যখন আত্মা চৈতন্যে
প্রকাশ করলে সে
চিন্তার বিশ্ব।[১৬]

সুতরাং জগত অস্তিত্বশীল। আমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি না। যদিও সর্বেশ্বরবাদীগণ মনে করেন, ইন্দ্রিয় সংবেদন আমাদের সাথে প্রতারণা করে বলেই জগত আমাদের কাছে অস্তিত্বশীল বলে প্রতিভাত হয়।[১৭] সর্বেশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে ইকবাল দ্বিতীয় আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেখানে তিনি আত্মা বা খুদি'র বাস্তব সত্তা আছে বলে দাবি করেন। তিনি মনে করেন, এমনকি সর্বেশ্বরবাদীগণও বিষয়টিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনা। ইকবাল মনে করেন, সর্বেশ্বরবাদীদের একটি কর্তব্য হলো বস্তু জগতের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া। সর্বেশ্বরবাদীগণ মনে করেন, বস্তুজগত হয় ঈশ্বর থেকে বের হয়ে এসেছে (Emanation of God) অথবা ঈশ্বরের প্রকাশ (Manifestation of God)। কিন্তু এই উভয় প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত এই ধারণাতে পৌঁছে যে, বস্তু জগতের অস্তিত্বের বিভিন্ন ক্রম (Grade) রয়েছে। ফলস্বরূপ সত্তার কিছু শ্রেণি যা ঈশ্বরের প্রকৃতির সাথে গভীর সম্বন্ধ ধারণ করে, তা অন্য সত্তার স্তরের চেয়ে অধিক বাস্তব হিসেবে বিবেচিত হয়। ঈশ্বরের প্রকৃতির সাথে গভীর সম্বন্ধযুক্ত সত্তার এই উচ্চতর শ্রেণি হলো আত্মা। সুতরাং আত্মার উচ্চতর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব এমনকি সর্বেশ্বরবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও।[১৮] ইকবাল আধুনিক দার্শনিক এফ. এইচ. ব্রাডলি (F. H. Bradley) এর উল্লেখ করে বলেন, আত্মা বা অহমের অস্তিত্বকে যে অস্বীকার করা অসম্ভব তা ব্রাডলি উৎকৃষ্টতর প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন।[১৯] ব্রাডলি তাঁর *Ethical Studies* গ্রন্থে আত্মার (খুদি) বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে অনুমান করেছেন এবং *Principles of Logic* গ্রন্থে কেবলমাত্র তার কাজের প্রকল্প (Hypothesis) হিসেবে আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অতঃপর ব্রাডলি তাঁর বিখ্যাত *Appearance and Reality* গ্রন্থে অহমের (আত্মা) একটা অনুসন্ধানমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের

দুটি অধ্যায় তথা 'The meaning of self' এবং 'The Reality of self' কে জীবাত্মার অবাস্তবতা সম্পর্কিত আধুনিক উপনিষদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২০] তাঁর মতে, বাস্তবতার প্রমাণ হলো বিরুদ্ধতা থেকে মুক্তি এবং যেহেতু তিনি দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে, অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ কেন্দ্রস্থল পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়, ঐক্য ও বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিরোধপূর্ণ বিপরীত বিষয়ের দ্বারা সংক্রমিত, সেহেতু আত্মা বা অহম কেবল একটি মায়ামাত্র। আত্মা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন- অনুভূতি, ব্যক্তি-অভিন্নতা, আত্মা, ইচ্ছা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কেবলমাত্র ধর্মীয় চিন্তার সাহায্যেই অনুসন্ধান করা যায়; যে ধর্মীয় চিন্তার বিষয়গুলোর প্রকৃতিই হলো সম্বন্ধমূলক এবং সকল সম্বন্ধই বিপরীতমুখী। ব্রাডলি'র নির্মম যুক্তি আত্মা বা অহম সম্পর্কে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়ালেও ব্রাডলি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, অহম বা আত্মা অবশ্যই এক অর্থে বাস্তব, এক অর্থে সন্দেহাতীত সত্য।[২১] আমরা সহজেই স্বীকার করতে পারি যে, প্রবল আত্মা জীবনের ঐক্য হিসেবে অপূর্ণই বটে। বস্তুত আত্মার প্রকৃতিই হলো আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, আরও কার্যকর, আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে এক অনন্য ঐক্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত। এই আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যে পৌঁছাতে একে নানা রকম পরিবেশ অতিক্রম করতে হয়। কখনো কখনো সামান্য উদ্দীপনাতেই এর ঐক্য ব্যাহত হতে পারে এবং তার নিয়ন্ত্রণ শক্তি হারাতে পারে। তথাপিও চিন্তায় একে যতভাবেই খণ্ডন এবং বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, আত্মা বা অহমের অনুভূতি আমাদের কাছে চরম এবং এতো অধিক শক্তিশালী যে, অধ্যাপক ব্রাডলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।[২২] ইকবাল মনে করেন, আত্মার যে বাস্তব সত্তা রয়েছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

যে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে মোল্লার কাছে
সে অবিশ্বাসী/নাস্তিক,
আর যে আত্মাকে অস্বীকার করে,
আমার কাছে সে আরও বেশি অবিশ্বাসী/নাস্তিক।[২৩]

সুতরাং, আত্মা সন্দেহাতীতভাবে বাস্তবসত্তা, যদিও এর বাস্তবতা বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতি গভীর। এ সম্পর্কে ইকবাল তাঁর 'গুলশান-ই-রাজ-ই-জাদীদ' কবিতায় বলেন,

If you say that the "I"
Is all pure fantasy,
Nothing but an illusory
Thing seen by the mind's eye,
Then tell me whose experience
Is this delusion of the inner sense?
Who is the subject of this fantasy?
Look inward at yourself: Are you not he?
Apparent though the world is, yet
you have to prove that it exists;
But doing so resists
A Gabriel's ethereal wit.
The self, is on the other hand,
Concealed from view, and yet
It is self-evident,
Beyound all argument.
Reflect a little on this and

Endeavour to find out
The meaning of this mystery.
The self is not Illusion but Reality.[২৪]

ইকবালের মতে, আত্মার দুটি দিক রয়েছে যথা: ১. উপলব্ধিজনক ২. দক্ষ/কার্যকর।[২৫] আত্মার দক্ষ/কার্যকর দিক স্থানিক জগতের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। যা মনস্তাত্ত্বিক অনুসঙ্গবাদের বিষয়বস্তু। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক আত্মা বস্তুর বাহ্য শৃঙ্খলা নিয়ে কাজ করে, যা আমাদের ক্ষণস্থায়ী চেতনাকে নির্ধারণ করে এবং এই ক্ষণস্থায়ী চেতনার উপর তাদের নিজস্ব স্থানগত পারস্পরিক আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের ছাপ মেরে দেয়। আত্মা এখানে ঠিক যেন তার নিজের বাইরে বাস করে এবং একটা সমগ্রতা হিসেবে যখন তার নিজের ঐক্য বজায় রেখে নিজেকে প্রকাশ করে তখন তা সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অবস্থার ধারা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং যে কালে দক্ষ বা কার্যকর আত্মার বাস তা হচ্ছে সেই কাল, যাকে আমরা দীর্ঘ ও স্বল্প সময় বলে থাকি। স্থান থেকে একে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমরা একে একজন পথিকের পথের বিভিন্ন মঞ্জিলের মতো বিভিন্ন স্থানিক বিন্দু দিয়ে তৈরি একটা সরলরেখা রূপে কল্পনা করতে পারি। কিন্তু বার্গসোঁর মতে, এই রূপে বিবেচিত কালকে সত্যিকারের কাল বলা যায় না। স্থানগত কালের অস্তিত্ব হলো মিথ্যা অস্তিত্ব।[২৬] ইকবালের মতে, আত্মার অপর দিক তথা উপলব্ধিমূলক দিক স্থানিক কালে নয় বরং পূর্ণ স্থিতিকালে অস্তিত্বশীল থাকে। ইকবাল তাঁর মতের সমর্থনে বলেন, চেতনার একটি গভীর দিক রয়েছে, আর তা হলো অনুভূতি, উদ্দেশ্য, মূল্য ইত্যাদি আমাদের চেতনায় যত বেশি সম্ভব ইন্দ্রিয় ছাপ তৈরি করে। আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকে ব্যবহার করে বাহ্যজগতকে খুঁজে পাই, আর এই বাহ্যজগতই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আমরা আমাদের সত্তার অন্য আরেকটি উপাদানকে ব্যবহার করি, যা দেশ-কালের জগতের দিকে চালিত নয় বরং নিশ্চিতভাবেই অন্য কোন দিকে চালিত এবং দৈহিক মস্তিষ্কে এর একটি বিমূর্ত রূপ গঠিত হয়।[২৭] ইকবালের মতে, অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো বর্তমান কালের মুসলমানরা 'গভীর আত্মা' হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারা বস্তু জগতের প্রতি এতো বেশি আসক্ত যে, তারা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার গোপন উৎসের কথা প্রায় ভুলেই গেছে। তাই ইকবাল মনে করেন, তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) অবশ্যই আত্মার গভীরতায় ডুব দিতে হবে।[২৮] উপলব্ধিজনক আত্মাকে কেবলমাত্র গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই জানা সম্ভব; যখন দক্ষ/কার্যকরি আত্মা বন্ধ থাকে। এ সময় আমরা আত্মার গভীরে প্রবেশ করে অভিজ্ঞতার গভীরতর কেন্দ্রে পৌঁছতে পারি।[২৯] উপলব্ধিজনক অহমের ঐক্যের মধ্যে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা সমগ্রকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। অহমের এই সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে সংখ্যাগত কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আর এই অহমের উপলব্ধিজনক উপাদানগুলোর বহুত্ব দক্ষ অহমের উপাদানগুলোর মতো নয়; বরং উপাদানগুলোর বহুত্ব সম্পূর্ণরূপে গুণাত্মক। সেখানে পরিবর্তন ও গতি আছে; কিন্তু এই পরিবর্তনও গতি অবিভাজ্য। তাদের উপাদানগুলো পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে অ-ক্রমিক অর্থাৎ সংখ্যাগত নয়। উপলব্ধিজনক অহমের এই গতি স্থান-কালের গতি নয়। সুতরাং উপলব্ধিজনক অহমের এই কাল হলো এক অখণ্ড কাল। এই কাল হচ্ছে খাঁটি কাল, স্থানের সংস্পর্শে তা বিকৃত নয়।[৩০] উপলব্ধিজনক আত্মা সৃজনমূলক। এটা বস্তুসমূহের অনুসন্ধান করে না; বরং তাদেরকে তৈরি করে। ইকবাল বিশ্বাস করেন, এই উপলব্ধিজনক আত্মার মাধ্যমে আমরা কেবল বস্তুসমূহ তৈরি করি না; বরং এই বস্তুসমূহের মধ্যে যে রাজনৈতিক ও নৈতিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের লক্ষ্যও নির্ধারণ করি। তিনি মনে করেন এর ফলে আমাদের দুই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। যথা: অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা এবং বাইরের অভিজ্ঞতা।

অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার ফলাফল হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্রমাগত সাফল্যকে সুদৃঢ় করা, যা ঘটতে থাকা সবকিছুকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে। সুতরাং ইকবাল অনুসারে, আত্মার জীবন গঠিত তার গতির মধ্যে। যে গতির প্রবাহ উপলব্ধি থেকে দক্ষতায়, স্বজ্ঞা থেকে বুদ্ধিতে, পূর্ণ স্থিতিকাল থেকে ক্রমিক কালের দিকে।

ফরাসি দার্শনিক ডেকার্ট তিনটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। যথা— ঈশ্বর, দেহ ও মন। এদের মধ্যে ঈশ্বর হলো পরম দ্রব্য। কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, পরম দ্রব্য হিসেবে ঈশ্বর নিজেই তার অস্তিত্বের কারণ। আর দেহ ও মন হলো আপেক্ষিক দ্রব্য। কেননা তাদের অস্তিত্ব অনন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।[৩১] দেহ বা জড়ের বৈশিষ্ট্য হলো বিস্তৃতি। এরা জায়গা/স্থান দখল করে, আর মন বা আত্মার বৈশিষ্ট্য হলো চেতনা এবং তা চিন্তা করতে পারে। সুতরাং দেহ ও মন সম্পূর্ণরূপে দুটি পৃথক সত্তা এবং তারা একে অন্যকে ছাড়া স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। কিন্তু ইকবাল কার্তেসীয় এই দেহ ও মনের দ্বৈতবাদী তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন। যেমতে দেহ ও আত্মা পরস্পর স্বাধীন এবং একে অপরকে প্রভাবিত করে না। তবে লাইবনিজের মতে, পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদের কারণে তাদের উভয়ের পরিবর্তন সমান্তরালভাবে হয়। এই মতবাদ আত্মার ভূমিকা হ্রাস করে আত্মাকে শারীরিক ঘটনাবলীর গৌণ দর্শকমাত্রে পরিণত করে। আর এজন্যই ইকবাল সমান্তরালবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৩২] অন্যদিকে যদি মনে করি যে দেহ এবং আত্মা একে অপরকে প্রভাবিত করে তাহলেও আমরা এমন কোন দৃশ্যমান ঘটনা পাই না, যার দ্বারা কিভাবে এবং কোথায় তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে এবং দুইয়ের মধ্যে কে মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করছে তা বুঝতে পারি না। দেহ ও আত্মার মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, আত্মা দেহের একটি যন্ত্র যা শারীরবৃত্তীয় উদ্দেশ্যে ক্রিয়া-কলাপ করে এটা যেমন সত্য; তেমনি এটাও সত্য যে, দেহ আত্মার একটি যন্ত্রবিশেষ।[৩৩] ইকবাল ল্যাঞ্জ (Lange) এর আবেগ তত্ত্বের উল্লেখ করে বলেন, দেহ ও আত্মার মিথস্ক্রিয়ার কাজটি দেহই প্রথম শুরু করে। আবার এ মতবাদের বিরুদ্ধ মতও রয়েছে। যাই হোক দেহ ও আত্মার মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেহ যদি প্রথম কাজটি শুরু করে, তবে আবেগ বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে আত্মা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথস্ক্রিয়ায় যোগ দেয় এবং মনের উপর ক্রমাগত ক্রিয়াশীল বাহ্যিক উদ্দীপনার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সমভাবে সত্য হয়।[৩৪] তাই মিথস্ক্রিয়াতত্ত্ব বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদও অসন্তোষজনক।

ইকবাল দেহ ও আত্মার দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, কাজের সময় দেহ ও আত্মা এক হয়ে যায়। কেননা আমি যখন টেবিলের উপর থেকে একটি বই গ্রহণ করি, তখন তা একটি মাত্র কাজ এবং অবিভাজ্য। আর এক্ষেত্রে দেহের কাজের অংশ এবং মনের কাজের অংশের মধ্যে বিভাজন রেখা টানা অসম্ভব ব্যাপার। ইকবালের মতে, দেহ সম্পূর্ণ শুন্যে অবস্থিত কোন বস্তু নয়; বরং দেহ ঘটনা বা কাজের একটি পদ্ধতি। যে অভিজ্ঞতার পদ্ধতিকে আমরা আত্মা বা অহম বলি তা কাজের পদ্ধতিও বটে। এটা দেহ ও আত্মার পার্থক্য দূর করে না, কেবল তাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। আত্মা বা অহমের বৈশিষ্ট্য হলো স্বতঃস্ফূর্ততা। যে কাজ দেহকে গড়ে তুলছে, সেগুলোই বারবার ঘটেছে। দেহ হলো আত্মার পুঞ্জীভূত কর্ম বা অভ্যাস। সুতরাং দেহ কখনোই আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। অন্য কথায়, দেহ হলো চেতনার একটি স্থায়ী উপাদান, আর স্থায়ী উপাদান বলেই বাহ্যিকভাবে তাকে স্থিতিশীল বলে মনে হয়।[৩৫] সুতরাং ইকবাল অনুসারে, দেহ ও মন দুটো বিরুদ্ধ সত্তা নয়। আমরা দেখেছি যে, ইকবাল জড় বস্তুকে মৃত

হিসেবে বিবেচনা না করে উপ-অহং হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সুতরাং জড় বস্তু নিজেই শক্তি এবং ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়। যখন ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা হয়, তখন এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় যে, দেহের নির্ধারক শক্তি কোন জড়বস্তু নয় বরং ইচ্ছা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ইচ্ছা বা শক্তি তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য দৈহিক আকার গ্রহণ করে।[৩৬] যেমনটি বিবর্তন সম্পর্কিত ইকবালের দৃষ্টি থেকে স্পষ্ট যে, সৃজনশীল ইচ্ছা তার ক্রমবর্ধমান আদর্শ উপলব্ধির জন্য অবিরাম সংগ্রামের মাধ্যমে দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে। সুতরাং ইকবালের মতে, দেহ ও আত্মা দুটি স্বাধীন দ্রব্য নয়। উভয়েরই বৈশিষ্ট্য হলো উভয়ই বাস্তব সত্তা। আর দেহ হলো আত্মার প্রকাশিত রূপ। এ প্রসঙ্গে ইকবাল তাঁর '*জাভিদ নামা*'তে বলেন,

> তুমি বলতে পারো যে আত্মা হলো আত্মার বাহন। আত্মার গোপনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করা যাক, আত্মা দেহের সাথে জড়িত নয়। এটা কোন বাহন নয়, এটা হলো আত্মার একটি অবস্থা। সুতরাং, আত্মাকে আত্মার বাহন বলা মূলত পদের বিভ্রান্তি। তাহলে আত্মা কী? আনন্দ উল্লাস এবং দুঃখ, আমোদ ইত্যাদির ঘূর্ণায়মান পরিমন্ডলের নিয়ন্ত্রণই হলো আত্মা। দেহ কী? দেহ হলো রং এবং গন্ধের অভ্যাস। জগত সংসারে বসবাস করার অভ্যাস।[৩৭]

ইকবাল দৈতবাদী তত্ত্ব তথা দেহ ও আত্মাকে পৃথক সত্তা হিসেবে মনে করাকে পাপ বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে, আত্মা হলো বিশুদ্ধ কাজ, আর দেহ হলো কেবলই কর্ম যা দৃশ্যমান। সুতরাং তা পরিমাপযোগ্য। দেহ এবং আত্মার সম্পর্ক অনেকটা জগৎ এবং ঈশ্বরের সম্পর্কের মতো। জগৎ যেমন ঈশ্বরের মূর্তরূপ তেমনি দেহ আত্মার মূর্তরূপ। আত্মার প্রকাশ এবং পূর্ণ বিকাশের জন্য দেহের প্রয়োজন।[৩৮] যখন তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন উভয়েরই অস্তিত্ব এবং তাৎপর্য থাকে। তবে ইকবাল মনে করেন, দেহের চেয়ে আত্মা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং দেহ তার অস্তিত্বের জন্য আত্মার কাছে ঋণী আর আত্মার উৎস হলো আল্লাহ।[৩৯]

ইকবাল আত্মা সম্পর্কে আল গাযালির উল্লেখ করে বলেন, তিনি আত্মাকে একটি সরল অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনীয় দ্রব্য হিসেবে মনে করতেন। তাঁর মতে, আত্মা মানসিক অবস্থাবলি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং কালপ্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত নয়। আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতা হলো আত্মার একটি ঐক্য। কারণ আমাদের মানসিক অবস্থাবলি সরল দ্রব্যের (আত্মার) গুণাবলির সাথে খুব বেশি পরিমাণে সম্পর্কযুক্ত, যে দ্রব্য (আত্মা) তার গুণাবলির প্রবাহ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় অবস্থায় লেগে থাকে।[৪০] ইকবাল আত্মাকে এমন একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করেন না যার মধ্যে মানসিক অবস্থাবলি অধিষ্ঠান করে এবং তিনি আত্মাকে একটি অধিবিদ্যক সত্তা হিসেবে কান্টের আপত্তির সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন।[৪১] কান্টের মতে, 'আমি চিন্তা করি' যা প্রতিটি চিন্তার সাথে থাকে তাহলো চিন্তার একটি প্রাসঙ্গিক শর্ত এবং চিন্তার প্রাসঙ্গিক শর্ত থেকে তত্ত্ববিদ্যক দ্রব্যের রূপান্তর যৌক্তিকভাবে অযৌক্তিক। অধিকন্তু দ্রব্যের অবিভাজ্যতা তার অবিনশ্বরতা প্রমাণ করে না। কেননা অবিভাজ্য দ্রব্য একটি নিবিড় গুণের মতই অদৃশ্য (শূন্যতায় পর্যবসিত) হয়ে যেতে পারে বা শূন্যতায় পর্যবসিত হতে পারে।[৪২] দ্রব্যের অবিভাজ্যতা সম্পর্কিত কান্টের এই মত অধিবিদ্যক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ইকবাল মনে করেন, একটি দেহের ওজনকে যে অর্থে দেহের গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সে অর্থে আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতাকে আত্মা-দ্রব্যের (Soul-Substance) একটি গুণ হিসেবে বিবেচনা করা কঠিন। পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতাকে বিশেষ কাজের রেফারেন্স হিসেবে প্রকাশ করে। আর এইভাবে তারা একটি সুনির্দিষ্ট সত্তার অধিকারী হয়। লেয়ার্ডের (Laird) মতে, এইভাবে পুরাতন থেকে নতুন জগত নয় বরং

একটা নতুন জগতই গঠন করে নেয়। এমনকি অভিজ্ঞতাকে যদি আমরা গুণ হিসেবে বিবেচনা করি তথাপিও আমরা আবিষ্কার করতে পারি না যে, তারা কিভাবে আত্মা-দ্রব্যের অন্তর্নিহিত গুণ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতা অহংকে আত্মা-দ্রব্য হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আমাদেরকে কোনো ধরনের সূত্র প্রদান করে না। কেননা আমাদের প্রারম্ভিক প্রকল্পই হলো আত্মা-দ্রব্য (Soul-Substance) অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে না। ইকবাল এটাও মনে করেন যে, একই দেহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আত্মা-দ্রব্যের অধিষ্ঠান অসম্ভব। কাজেই তত্ত্বটি মানুষের ব্যক্তিগত পরিবর্তনের মতো ঘটনার কোন পর্যাপ্ত ব্যাখা দিতে পারে না। অবশ্য অতীতকালে ব্যাপারগুলোকে দেহের উপর মন্দ আত্মার (ভুত-প্রেত) অস্থায়ী দখল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতো।[৪৩]

উইলিয়াম জেমস এর মতে, মনস্তাত্ত্বিক জীবনের সারবস্তু একটি প্রবাহ হিসেবে অনুভূত হয়, যেখানে প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক মুহূর্তের উপলব্ধি হয় তার নিজের পূর্বপুরুষদের ভিত্তিতে।[৪৪] তিনি মনে করেন, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এক ধরনের সমন্বিত নীতি কাজ করে যা তাদের উপর মনোযোগের জন্য দাগ কাটে। এর ফলে মানসিক জীবন প্রবাহে একে অপরকে ধরা দেয় এবং চিন্তা পদ্ধতির অংশ হিসেবে অহং ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি নিয়ে গঠিত হয়। বর্তমান এবং অতীতের চিন্তার প্রতিটি স্পন্দনের মধ্যে একটা অবিভাজ্য ঐক্য রয়েছে, আর তা হলো জানা এবং স্মরণ করা। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চিন্তার স্পন্দনের অধিকারী হলো অহং বা আত্মা। ইকবাল স্বীকার করেন যে, জেমস্ এর এই মনস্তাত্ত্বিক জীবনের বর্ণনা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত; কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে চেতনাকে যেভাবে পাই তার সাথে জেমস্ এর এই বর্ণনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চেতনা হলো এমন কিছু যার অস্তিত্ব একক, সমগ্র মনোজগৎ নিয়ে এর প্রকাশ এবং চেতনার ক্ষুদ্র অংশগুলোকে একে-অপরের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ হিসেবে প্রকাশ করা যায় না।[৪৫] বস্তুত উইলিয়াম জেমস আত্মা সম্পর্কিত হিউমের তত্ত্ব গ্রহণ করে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, যে আত্মা মানসিক অবস্থার বাইরে অভিজ্ঞতা গঠন করতে পারে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ইকবাল জেমস-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞতার স্থায়ী উপাদানটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এবং ব্যাখ্যা করতে পারে না যে কিভাবে একটি ক্ষণস্থায়ী চিন্তা, যা হারিয়ে গেছে, তা বর্তমান চিন্তার দ্বারা পরিচিত ও উপলব্ধি করা যেতে পারে যদি ক্ষণস্থায়ী চিন্তার মধ্যে ধারাবাহিকতা না থাকে।[৪৬] ইকবাল মনে করেন যে, অহং আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরের কোনো জিনিস নয় বরং অন্তঃস্থিত অভিজ্ঞতাই সক্রিয় অহমের নামান্তর। তবে তিনি অহমের ঐক্য ও ধারাবাহিকতার উপর জোর দিতে চান। যার কার্যকারিতা আমরা উপলব্ধি, বিচার ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশে দেখতে পাই। সে প্রাণশক্তি আহরণ করে চলেছে পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজের আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণের তীব্রতা থেকে। সুতরাং এই পারস্পরিক আক্রমণের ক্ষেত্র থেকে অহং বাইরে দাঁড়িয়ে নেই; বরং এর মধ্যেই সে পরিচালনাকারী শক্তিরূপে বিরাজিত। এখানেই সে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে পূর্ণ অবয়বে গড়ে তুলছে এবং নিজের পথ নির্দেশ করছে।[৪৭]

আত্মার বৈশিষ্ট্যসমূহ

আত্মা সম্পর্কিত ইকবালের দার্শনিক আলোচনায় আত্মার নানা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. আত্মা বা অহং হলো অনন্য: ইকবালের মতে, অহং নিজেকে ঐক্য হিসেবে প্রকাশ করে, যাকে আমরা মানসিক অবস্থা বলি। মানসিক অবস্থাবলি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে না; বরং একটি জটিল সমগ্রের পর্যায় হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এই আন্তঃসম্পর্কিত ঐক্যগুলো জৈব ঐক্যের অধিকারী এবং তা একটি বস্তুগত জিনিসের ঐক্য থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। সুতরাং মানসিক ঐক্য একেবারে অনন্য।

২. আত্মা স্থানে আবদ্ধ নয়: ইকবাল দেখিয়েছেন যে, দেহ যে অর্থে স্থানে আবদ্ধ আত্মা সেই অর্থে স্থানে আবদ্ধ নয়। 'আমরা বলতে পারি না যে, আমার একটি বিশ্বাস ডান দিকে এবং আরেকটি বিশ্বাস বাম দিকে অবস্থিত' আবার এটাও বলা যায় না যে, তাজের সৌন্দর্যের প্রতি আমার উপলব্ধি আগ্রা থেকে আমার দূরত্বের (দূরে অবস্থান) সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। স্থান সম্পর্কে আমার চিন্তা স্থানগতভাবে স্থানের সাথে সম্পর্কিত নয়। বস্তুতপক্ষে আত্মা একই সাথে অনেক স্থানের কথা চিন্তা করতে পারে। জাগ্রত চেতনার স্থান এবং স্বপ্নের স্থানের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নেই।[৪৮]

৩. কেবলমাত্র অহং বা আত্মা-ই সময়ের অধিকারী: ইকবাল দেখিয়েছেন যে, মানসিক এবং দৈহিক উভয় ঘটনাগুলোই একটা সময়ে ঘটে; কিন্তু অহং এর সময়ের ব্যাপ্তি দৈহিক সময়ের ব্যাপ্তি থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। দৈহিক ঘটনার সময়ের ব্যাপ্তিটা একটি বর্তমান ঘটনা হিসেবে স্থানের মধ্যে প্রসারিত হয়; কিন্তু অহং বা মানসিক ঘটনার ব্যাপ্তিটা বর্তমান এবং অতীতের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা অনন্য ধারায় নিবিষ্ট থাকে। দৈহিক ঘটনাগুলো একটি সুনির্দিষ্ট বর্তমান চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিত হয়, যা দেখায় যে, ঘটনাগুলো একটা সময়ে ঘটেছিল। কিন্তু এই চিহ্নগুলি কেবলমাত্র তার সময়ের প্রতীক; সময়কালটা নয়। সত্যিকারের সময়কাল কেবলমাত্র অহং বা আত্মার অন্তর্গত।

৪. আত্মা বা অহং স্বতন্ত্রতা ধারণ করে যা তার অনন্যতা প্রকাশ করে: ইকবাল অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র প্রকৃতি নির্দেশ করে বলেন, 'একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সহানুমানের সকল আশ্রয়বচনগুলোকে অবশ্যই একই মনে বিশ্বাস করতে হয়। যেমন- এক মন যদি বিশ্বাস করে যে, 'সকল মানুষ মরনশীল' এবং অন্যমন বিশ্বাস করে যে, 'সক্রেটিস একজন মানুষ'- এভাবে কোন অনুমান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত অনুমিত হতে পারে কেবল তখনই, যখন এই দু'টি বচন একই মন দিয়ে গ্রহণ করা হয়।... আবার কোন নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবে আমার। আমার আনন্দ, বেদনা, আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র আমারই এবং আমার অহং বা আত্মারই অপরিহার্য অংশ। আমার অনুভূতি, ঘৃণা, ভালোবাসা, সিদ্ধান্ত এবং সংকল্পগুলো কেবলমাত্র আমারই। কোন স্থান বা ব্যক্তিকে চিনতে পারার অর্থ হলো আমার অতীত অভিজ্ঞতাকে উল্লেখ করা; এবং অন্য কোন অহং বা আত্মার অভিজ্ঞতার উল্লেখ নয়।'[৪৯]

৫. আত্মা এবং অহং স্বতঃস্ফূর্ত: অহং বা আত্মা হলো একটা কর্ম ব্যবস্থা যা দেহ থেকে আলাদা সত্তা হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ততা ধারণ করে। যা একটি সঞ্চিত ক্রিয়া। ইকবাল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আত্মার অপরিহার্য প্রকৃতি হলো নির্দেশক, এবং এটি আল্লাহর নির্দেশিক শক্তি থেকে আসে।[৫০] তিনি কুরআনে উল্লেখিত 'খালক' এবং 'আমর' এর মধ্যে পার্থক্য করে বলেন,

'খাল্‌ক' হলো সৃষ্টি আর 'আমর' হলো নির্দেশ। কুরআনে ব্যবহৃত 'খাল্‌ক' দ্বারা জগতের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আর 'আমর' দ্বারা মানবাত্মার সাথে ঐশী আত্মার সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইকবাল বলেন, 'খাল্‌ক' শব্দটি আল্লাহর সাথে যেভাবে সম্পর্কিত 'আমর' শব্দটি সেভাবে সম্পর্কিত নয়; বরং কিছুটা পৃথক, তবে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবে ইকবাল স্বীকার করেন যে, ঐশী নির্দেশ কীভাবে অহং সত্তা বা আত্মা হিসেবে কাজ করে তা' বৌদ্ধিকভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা। এটা দেখা যায় যে, নির্দেশের জগৎ হল তাৎপর্যপূর্ণ জগৎ, অর্থপূর্ণ এবং তা' মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর অভ্যন্তরীণ সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে উপস্থাপন করে। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ বা 'আমর' থেকে 'সৃষ্টি' এবং 'তাৎপর্যপূর্ণ' উভয়ই বের হয়ে এসেছে। সুতরাং আত্মা অবস্থান করে 'আমর' এর জগতে এবং তা' গঠিত হয় 'আমর' বা নির্দেশের দ্বারা। আর তা' পরিচিত হয় তার নির্দেশমূলক মনোভাবের মাধ্যমে। ইকবাল বলেন, আমার সমগ্রসত্তা আমার নির্দেশকমূলক মনোভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। সুতরাং কেউ যদি আমাকে প্রত্যক্ষণ করতে চান, তাহলে স্থানে অবস্থিত বস্তুর মত বা জাগতিক কতগুলো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে প্রত্যক্ষণ করতে পারবেন না; বরং আমার বিচার-বিবেচনা, আমার ইচ্ছা-মনোভাব, আমার লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা, উপলব্ধি এবং মর্যাদা বিচার করেই আমাকে প্রত্যক্ষণ বা আবিষ্কার করতে হবে।[৫১]

৬. আত্মা স্বাধীন: ইকবাল মনে করেন, আত্মা ইচ্ছার স্বাধীনতার অধিকারী তবে এর বাস্তবতা কঠোরভাবে নির্ধারিত নয়। স্বাধীনতা একটা প্রকল্পের মতো নয়। যেখানে ইচ্ছার স্বাধীনতার সপক্ষে মনস্তাত্বিক যুক্তিগুলোতে বলা হয় আমরা আমাদের পছন্দ এবং কাজের স্বাধীনতার ব্যাপারগুলোকে স্বজ্ঞামূলকভাবে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ইকবাল দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, চিন্তা প্রক্রিয়াগুলো আবশ্যিকভাবেই যান্ত্রিক নয়; বরং চিন্তাশীল আত্মা স্বাধীন আর এটাই হলো সকল জ্ঞানের মৌলিক ধারণা। এক চিন্তা অন্য আরেক চিন্তাকে পরিচালিত ও প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এই দুই চিন্তার মধ্যে কোন যান্ত্রিক আবশ্যকতা নেই বরং প্রত্যেক কাজের বিচারের বা মূল্যায়নের জন্য একটি বিচারশীল আত্মা থাকে। আর এই আত্মা স্বাধীনভাবে বিচার বা মূল্যায়ন করে থাকে।[৫২]

উপসংহার

ইকবালের আত্মা-দর্শন মূলত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতকে খণ্ডন করে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনের একটা প্রচেষ্টা। তিনি আল্লাহর প্রকৃতির সাথে গভীর সম্বন্ধযুক্ত একটি বাস্তব সত্তা হিসেবে আত্মাকে অভিহিত করেছেন। স্বজ্ঞার মাধ্যমে যে সত্তার উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। ইকবাল আত্মার দক্ষ বা কার্যকর এবং উপলব্ধিজনক এ দুটি দিকের উল্লেখ করে দক্ষ বা কার্যকর আত্মাকে দীর্ঘ ও স্বল্প সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থানিক কালের প্রেক্ষিতে এবং উপলব্ধিজনক আত্মাকে সৃজনশীল হিসেবে এক অখণ্ড পূর্ণ স্থিতিকালের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দেহ ও আত্মা (মন) সম্পর্কিত দ্বৈতবাদী তত্ত্বকে অস্বীকার করে দেহ ও আত্মাকে দুটি স্বাধীন দ্রব্য হিসেবে নয়; বরং দেহকে আত্মার প্রকাশিত রূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং দেহের নির্ধারক হিসেবে ইচ্ছাশক্তির কথা বলেছেন। আর এই ইচ্ছাশক্তি তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্যই দৈহিক

আকার গ্রহণ করে বলে তিনি মনে করেন। ইকবাল দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সচেতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। আর চেতনা হলো এমন বিষয়, সমগ্র মনোজগত নিয়ে যার প্রকাশ এবং চেতনার ক্ষুদ্র অংশগুলোকে পারস্পরিক সংযোগ হিসেবে প্রকাশ করা যায় না। ইকবাল আত্মাকে অন্তঃস্থিত অভিজ্ঞতা হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। যে অন্তঃস্থিত অভিজ্ঞতা উপলব্ধি হয় স্বজ্ঞার মাধ্যমে। আর আত্মা তার অভিজ্ঞতার পথে পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে নিরন্তর প্রাণশক্তি আহরণ করে চলেছে। আর এর মাধ্যমেই আত্মার পূর্ণ অবয়ব (সত্তা) গড়ে ওঠে এবং দেহের পরিচালক হিসেবে পথ নির্দেশ করে। ইকবালের আত্মা সম্পর্কিত মত মুসলিম দার্শনিক আল-গাযালির মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা উভয়ই মনে করেন আত্মা হলো 'আমর' বা আল্লাহর নির্দেশ। আর নির্দেশ হলো এক ধরনের ঐশী ক্ষমতা। সুতরাং আত্মার মধ্যে এক ধরনের নির্দেশিক ক্ষমতা বা নির্দেশিক শক্তি রয়েছে। আর এই নির্দেশিক ক্ষমতাবলেই আত্মা জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

তথ্যনির্দেশ

১. Ishrat Hasan Enver, *The Metaphysics of Iqbal*, (Published by Sh.Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, 1944), P.2

২. M.M.Sharif (edt.), *A History of Muslim Philosophy*, (Vol.1, Low Price Publications, Delhi, 1993), P.432

৩. *ibid*, P.432.

৪. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, (নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৯১), পৃ. ১৬৮।

৫. M.M.Sharif, *ibid*, PP. 461-462

৬. আমিনুল ইসলাম, *তদেব*, পৃ. ১৭৬

৭. M.M.Sharif, *ibid*, P. 489

৮. আমিনুল ইসলাম, *তদেব*, পৃ. ১৮৩

৯. *আল-কুরআন*, ৩৩:৩০

১০. *আল-কুরআন*, ৩৮:৭১-৭২

১১. M.M.Sharif, *ibid*, P. 620.

১২. আল গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, অনু. নূরুর রহমান,(এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম খন্ড, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ৪০।

১৩. *আল-কুরআন*, ১৭:৮৫

১৪. M.M.Sharif, *ibid*, P. 620.

১৫. Ishrat Hasan Enver, *ibid*, P. 31.

১৬. ইকবাল, *আসরারে খুদি*, অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান, (বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২য় সংস্করন, ঢাকা, নভেম্বর, ২০২১) পৃ. ২৭।

১৭. Ishrat Hasan Enver, *ibid*, P. 32.

১৮. *ibid*, PP. 32-33.

১৯. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Dodo press, 2009), P. 107.

২০. *ibid*, P. 107.

২১. F.H. Bradley, *Appearance and Reality*, (1893), P. 89, Muhammad Iqbal, *ibid*, PP. 107-108.

২২. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.108

২৩. Muhammad Iqbal, *Javid Nama*, Trans. by A.J.Arberry (George Allin and Unwin Ltd., London, 1966), P.104.

২৪. Muhammad Iqbal, *Gulshan-i-Raz-i-Zadid and Bandagi Namah*, Trans. by M.Hadi Husain, *The New Rose-Garden of Mystery and The Book of Slaves*, P.18.

২৫. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Dodo press, 2009), P. 46.

২৬. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.47

২৭. Artur Stanley Eddington, *The Nature of the Physical World*, (Cambridge, 1929), P.323

২৮. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.185

২৯. *ibid*, P.47

৩০. *ibid*, P.47

৩১. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৮৪), পৃ. ১০৪।

৩২. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.113

৩৩. *ibid*, P.113.

৩৪. *ibid*, P.113

৩৫. *ibid*, P.114

৩৬. Jamila Khatoon, *The Place of God, The Man and Universe in the Philosophic System of Iqbal*, (Iqbal Academy Pskistan, Lahore, 1963), P.124

৩৭. Muhammad Iqbal, *Javid Nama*, Trans. by A.J.Arberry (George Allin and Unwin Ltd., London 1966), P.33

৩৮. Jamila Khatoon, *ibid*, PP.134-135

৩৯. Jamila Khatoon, *ibid*, P.135, *আল-কুরআন*, ১৫:২৯, ৩২:৯, ৩৮:১২।

৪০. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Dodo press, 2009), P. 109

৪১. Jamila Khatoon, *ibid*, P.125

৪২. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.110

৪৩. *ibid*, P.110

৪৪. J.O.Urmson (Edt.), *The Concise Encyclopaedia of Western Philosophy and Philosophers*, (Howthorn Books, January, 1960), P. 195

৪৫. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.111

৪৬. J.O.Urmson (Edt.), *ibid*, P.96

৪৭. ইকবাল, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, (অনু. আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ৯৩

৪৮. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.108

৪৯. *ibid*, P.109

৫০. *আল-কুরআন*, ৭:৮৭

৫১. Muhammad Iqbal, *ibid*, P.112

৫২. Ishrat Hasan Enver, *ibid*, P.42

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

বাংলাদেশের কাব্যনাটকের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা

ড. জান্নাত আরা সোহেলী*

Abstract

Verse-play is a unique genre in literature, born out of the mingling of two distinct genres of play and poem. Poetry was the language of all writing and literature since ancient times. However, in spite of the presence of poetic and dramatic qualities in many works of that time, it did not become what is meant by modern Verse-play. T.S.Eliot, the western poet of the twentieth century, is considered to father the genre of verse-play. According to literary critics, Rabindranath Tagore is Eliot's Bengali counterpart, who introduced this unique genre to the Bengali readers. Later, the best development of this genre was done by the poet Buddhadev Bose. As a result of this, many writers in Bangladesh have started to write Verse-play. Some of them have been successful, while some of them have not become full-fledged Verse-plays. The issue became very clear during the research on the perspective and genre of Verse-play of Bangladesh. However, verse-play is the latest addition to Bengali literature and has, therefore, received less critical attention than given to other established genres. Yet, the importance of the development of this particular genre can not be ignored in the broader view of the history of literature. This paper attempts to provide readers and researchers a comprehensive understanding of the background of verse-play and its gradual evolution as a genre. Two methods, namely descriptive and analytical, are employed to carry out the research work. Depending on the necessity of analysis of verse-plays, the comparative method is also consulted.

চাবিশব্দ : নাটক, কাব্যনাটক, বিশ্বসাহিত্য, বাংলাসাহিত্য, বাংলাদেশের সাহিত্যে কাব্যনাটক।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

কবিতা এবং নাটকের সুসমন্বয়ে যে সাহিত্যকলা গড়ে ওঠে তাকে কাব্যনাটক বলে। প্রাচীনযুগ হতে যাবতীয় লেখনী ও সাহিত্যের ভাষা ছিলো কাব্য। তবে সেকালের বহু রচনার মধ্যে কাব্যগুণ-নাট্যগুণের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আধুনিক কাব্যনাটক বলেতে যা বোঝায় তা হয়ে ওঠেনি। আধুনিক কাব্যনাট্যের সূচনা হয় পাশ্চাত্য কবি টি.এস. এলিয়টের হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে। আর বাংলাসাহিত্যে কাব্যনাট্যের আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। পরবর্তীকালে এই ধারার সর্বোত্তম বিকাশসাধন করেন বুদ্ধদেব বসু। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে অনেক লেখকই কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ সাফল্য পেয়েছেন, আবার কারো কারো রচনা সার্থক কাব্যনাটক হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা নিয়ে গবেষণাকালে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

বাংলাদেশের সাহিত্যে কাব্যনাটক একটি নবীনতম এবং তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত ধারা। অথচ সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে কাব্যনাট্য চর্চার প্রেক্ষাপট এবং ধারাবাহিকতার একটি সামগ্রিক রূপ গবেষক-শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে এ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। এ গবেষণায় মূলত বর্ণনাত্মক গবেষণাপদ্ধতি ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে কাব্যনাটক বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তুলনামূলক গবেষণাপদ্ধতিরও আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কাব্যনাটের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা

যে-রূপকল্পে দৃশ্যাত্মক পরিচর্যায় কাহিনি উপস্থাপিত হয় তা-ই নাটক। এটি 'জীবনের বহুবিচিত্র রূপের এক শক্তিশালী দর্পণ।'[১] সংলাপ ও দৃশ্যকে অবলম্বন করে রঙ্গমঞ্চে গতিশীল মানবজীবনের রূপায়ণ এবং জনচিত্তে তার শিল্পিত সঞ্চারণই নাটকের অন্বিষ্ট। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে, নাটক একপ্রকার দৃশ্যকাব্য। অর্থাৎ নাটক হচ্ছে সেই কাব্য যাতে লোকবৃত্তকে দৃশ্যরীতিতে উপস্থাপন করা হয়।[২] আবার পাশ্চাত্যরীতিতে নাটক সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'Drama is creation and representation of life in terms of the theatre.'[৩] অর্থাৎ দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে, অভিনেতাদের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে বহমান মানবজীবনের ছবিকে মূর্ত করে তোলাই নাটকের উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাব্যময় বলিষ্ঠ উচ্চারণই কাব্যনাটক। আধুনিক কাব্যনাটকে সাধারণত যেসব বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকসম্পাত করা হয় সেগুলো হচ্ছে– নাটকটিকে কাব্য-ভাষায় রচিত হতে হবে, বহির্বাস্তবতার তুলনায় সেখানে অন্তর্বাস্তবতার উপস্থাপনই মুখ্য হবে, ইতিহাস ও পুরাণের সমান্তরালে আধুনিক মানুষের যাপিত জীবনসংকট ও মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হবে, কাহিনি বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট পরিণামের তুলনায় চরিত্রের অর্ন্তদহন, ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন মুখ্য হয়ে উঠবে। কবিতা ও নাটক– কোনোটিই পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে না। অর্থাৎ কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের সুষম বিন্যাসের শিল্পিত উপস্থাপনই কাব্যনাটক।

বিশ্বসাহিত্যে কাব্যনাট্যের অবিস্মরণীয় আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিসের অবিসংবাদিত নাট্যকারদের মধ্যে এস্কিলাস (৫২৫-৪৫৬ খ্রিপূ), সফোক্লিস (৪৯৭-৪০৬ খ্রিপূ), ইউরোপিদিস (৪৮০-৪০৬ খ্রিপূ), এরিস্টোফানিস (৪৪৬-৩৮৮ খ্রিপূ) প্রমুখ কবি কবিতার ভাষায় লিখেছেন

কালজয়ী ট্রাজেডি ও কমেডি। প্রাচীন গ্রিসের পর প্রাচীন রোমেও আদি ফর্মের কাব্যনাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে। ইতালির কিংবদন্তিতুল্য কবি ও নাট্যকার ভার্জিল (৭০-২১খ্রি.পূ) এক্ষেত্রে পালন করেছেন মুখ্য ভূমিকা। রোমান এ নাটকগুলোর মূল প্রতিপাদ্য ছিল স্বজাতির মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন প্রচারের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ ও সুশিক্ষার সম্প্রসারণ। গ্রিক ও রোমানদের পর ইংরেজি ভাষামাধ্যমে রচিত হয়েছে কবিতায় লেখা নাটক। ইংরেজ কবিদের হাতেই মূলত আধুনিক কাব্যনাট্যের নানাবিধ রূপান্তর ঘটেছে। কেননা, তাঁরা কাব্যনাট্যের বিষয়কে কেবল ধর্মীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ না রেখে মানবিক বোধে প্রসারিত করেছেন, এবং নাটকের আঙ্গিকগত পরিবর্তন করেছেন অনন্য দক্ষতায়। ক্রিস্টোফার মার্লো(১৫৬৪-১৫৯৩), উইলিয়াম শেকসপিয়র(১৫৬৪-১৬১৬), বেন জনসন(১৫৭২-১৬৩৭) প্রমুখ কবি প্রাথমিকভাবে কবিতা ও নাটকে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসেন, এবং রচনা করেন অসামান্য কালজয়ী নাটক। বিশেষত উইলিয়াম শেকস্‌পিয়ার কাব্যময় ভাষায় যেসব নাটক রচনা করেছেন, সেগুলো বিষয় ও ভাষাগুণে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও আধুনিক কাব্যনাট্যের প্রয়োজনীয় গুণগুলো রক্ষিত হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ(১৭৭২-১৮৩৪), পিবি শেলি(১৭৯২-১৮২২), জন কিটস(১৭৯৫-১৮২১), জর্জ গর্ডন বায়রন(১৭৮৮-১৮২৪), আলফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২), রবার্ট ব্রাউনিং(১৮১২–১৮৮৯) প্রমুখ সাহিত্যিকগণ আধুনিক কাব্যনাট্যের আদলে কবিতার ভাষায় নাটক রচনার প্রয়াস নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা সেভাবে সফল হতে পারেননি। এরপর, বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এসে টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), ডব্লিউ. বি. ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯), জে. এম. সিঙ (১৮৭১-১৯০৯), ডব্লিউ. এইচ. অডেন (১৯০৭-১৯৭৩) প্রমুখ কবি আবারও কবিতার ভাষায় নাটক লেখা শুরু করেন। কাব্যনাট্যকার হিসেবে টি. এস. এলিয়ট এদের মধ্যে সফল ও পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে যেমন কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তেমনিভাবে এই তত্ত্বের বাস্তবিক প্রয়োগ দেখিয়েছেন মৌলিক কাব্যনাটক রচনা করে। বলাবাহুল্য সমকালে বিশ্বব্যাপী সংঘটিত বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলোনের প্রভাব, বিশেষত ফরাসি প্রতীকবাদ, জাপানি 'নো'[৪] নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এঁদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যে কাব্যনাট্যের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। যদিও বিশ্বব্যাপী এলিয়ট প্রবর্তিত কাব্যনাট্যের প্রভাব তখনো বিশ্বের এখনো অনেক অঞ্চলেই কার্যকর ছিল। যেমন আফ্রিকা অঞ্চলে কাব্যনাটক এখনো সমান জনপ্রিয়। এমনকি নাইজেরিয়ান নোবেলজয়ী (১৯৮৬) নাট্যকার ওলে সোয়াঙ্কি (জন্ম. ১৯৩৪) তাঁর প্রায় সব নাটকই কবিতার ভাষায় রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে *দ্য লায়ন এন্ড জুয়েল* (১৯৬২), এ *ডান্স অফ দ্য ফরেস্ট* (১৯৬৩) *ডেথ এন্ড দ্য কিংস হর্সম্যান* (১৯৭৫) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে, সংস্কৃত সাহিত্যে কবিতার ভাষায় প্রচুর কবি-নাট্যকার মঞ্চনাটক রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অযোধ্যার নাট্যকার অশ্বঘোষ(৮০-১৫০ খ্রিস্টাব্দ), প্রাচীন কুষাণ সাম্রাজ্যের কবি-নাট্যকার ভাস(২০০-৩০০ খ্রিস্টাব্দ), নাট্যকার শূদ্রক(২০০-২৫১ খ্রিস্টাব্দ), মহাকবি কালিদাস(আনু. খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক), উত্তরভারতের কবি হর্ষবর্ধন (৫৯০-৬৪৭), কবি ভবভূতি (খ্রিস্টীয় ৮ম শতক) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবজাত একথা স্বীকার করেও বলা যায়, আধুনিক বাংলা নাটকে সংস্কৃত সাহিত্য, এমনকি বাংলা

সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ*, মধ্যযুগের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, মঙ্গলকাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নাট্যব্যক্তিত্ব সেলিম আল দীনের (১৯৪৯–২০০৮) একটি মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে :

> সচরাচর দেখা যায় আমরা 'নাটক' কথাটাকে এক পূর্ব নির্ধারিত ইউরোপীয় ধারণার অমোঘ রূপ ও রীতির আলোকে বিচারের পক্ষপাতী। [...] আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো 'ন্যারেটিভ' ও 'রিচুয়াল' থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট্য, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বাঙলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা।[৫]

বস্তুত, প্রাচীন যুগের *চর্যাপদ*, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনা, বাঙালির হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি – লোকনাট্য, লোকগীত, ঐতিহ্যবাহী নানান অনুষ্ঠানে অভিনীত যাত্রাপালা, পাঁচালি প্রভৃতিকে আধুনিক কাব্যনাটকের শ্রেণিভুক্ত না করা গেলেও এ ধরনের রচনার মধ্যে কাব্যনাটকের একাধিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোককবিদের মননসৃজিত এসব রচনার ঘটনাসংগঠন, চমকপ্রদ নাট্যক্রিয়া, অলঙ্কার-শোভিত গীতময় সংলাপ, উপস্থাপন কৌশল সবকিছুর সঙ্গে আধুনিক কাব্যনাটকের সাজুয্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে আধুনিক নাটকের মতো চরিত্রগুলোর দ্বান্দ্বিক অবস্থান, মানসসংকটের তীব্রতা এগুলোতে অনুপস্থিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) পাশ্চাত্যরীতিতে তাঁর *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) নাটক রচনার মাধ্যমে আধুনিক বাংলা নাটকের যাত্রাপথ উন্মোচন করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একাধিক ভিন্ন ভিন্ন ফর্মের নাটক রচনার মধ্যদিয়ে এ ধারাকে ঋদ্ধ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৌলিক নাটক ছাড়াও রচিত একাধিক কাব্য নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১), *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)*, বিশেষত, *বীরাঙ্গনা কাব্যের* (১৮৬২) নাট্যিকগুণ পাঠককে মোহাবিষ্ট করে রাখে। তদুপরি, এগুলোকে পরিপূর্ণ কাব্যনাট্য বলা যায় না, বরং নাট্যগুণসমৃদ্ধ কাব্য বলা যেতে পারে।

আধুনিক কাব্যনাটক বলতে আমরা যা বুঝি– বাংলা সাহিত্যে তার শুভসূচনা করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ নাটকই কাব্যগুণসমৃদ্ধ। একজন প্রজ্ঞাবান সফল কবির হাতে রচিত নাটক এমন হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, টি. এস. এলিয়টের কাব্যনাটক রচনার পূর্বেই নিজস্ব মৌলিক ভাবনা ও নিরীক্ষাপ্রবণ মননের তাগিদে নাটকের ভাষা নিয়ে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নাটকে কাব্যভাষার সম্ভাবনা নিয়ে যাচাই করেছেন।[৬] বস্তুত 'মধুসূদনের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তারই ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাটকের পথচলা শুরু হয়েছিলো।'[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতময় সত্তার প্রভাবে তাঁর প্রায় সব রচনাতেই কাব্যসুর অনুরণিত হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৩), *গান্ধারীর আবেদন* (১৮৯৭), *সতী (*১৮৯৭), *নরকবাস (*১৮৯৭), *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (*১৯০০) নামে তিনি একাধিক নাট্যকবিতা রচনা করেছেন। এসব রচনায় কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হলেও এগুলোকে ঠিক আধুনিক কাব্যনাট্যের বিচারে কাব্যনাটক বলা যায় না। এখানে আধুনিক কাব্যনাট্যের বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আভাসিত হয়েছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *বিসর্জন* (১৮৯০) নাটকটিকে তাঁর প্রথম

ও সার্থক কাব্যনাটক বলা যেতে পারে। আচারসর্বস্ব ধর্মের অপরীতি ও আগ্রাসনের বিপরীতে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠায় প্রেমের জয়গান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। কোনো ধরনের হত্যা ও রক্তপাতের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরপূজা হতে পারে না; এবং জীবে দয়াই মানুষের প্রধান ধর্ম – এটিই *বিসর্জন* নাটকের মূল বক্তব্য। মূলত শান্তি, কল্যাণ, ক্ষমা, দয়া – আমৃত্যু এগুলোর সাধনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই অন্তরলালিত মানবিক বোধ ও বিশ্বাসের নান্দনিক উপস্থাপন ঘটেছে *বিসর্জন* নাটকে। কাব্যনাট্যের মূল যে বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্বপ্রকাশ, তার শতভাগ উপস্থাপন ঘটেছে *বিসর্জন* নাটকে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব গদ্যসংলাপাত্মক নাটক রচনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই কাব্যনাটকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে। তবে সমালোচকগণ এ ধারার নাটককে বলেছেন কাব্যনাটকের লক্ষণাক্রান্ত সফল কাব্যময় গদ্যসংলাপাত্মক নাটক। এ ধারার নাটকের মধ্যে *ডাকঘর* (১৯০২), *শারদোৎসব* (১৯০৮), *রাজা*(১৯১০), *মুক্তধারা*(১৯২২), *রক্তকরবী* (১৯২৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশেষত '*মুক্তধারা*, *রক্তকরবী* প্রভৃতি নাটক এদের বক্তব্য পরিবেশ, ঘটনা সংস্থান, কাব্যময় সংলাপ ইত্যাদি নিয়ে একেবারে আদ্যন্ত কবিতায় সংস্থাপিত বলা যায়। আর এখানেই এরা আধুনিক কাব্যনাট্যের সগোত্র হয়ে উঠেছে।[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যনাট্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে কবি-নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর(১৯০৮-১৯৭৪) হাতে। বুদ্ধদেব বসু তিরিশের দশকের কবি হলেও কাব্যনাট্য লেখা শুরু করেন ষাটের দশকে। কবি আলোক সরকার (১৯৩১-২০১৬) তাঁর *অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক* (১৯৬১) প্রবন্ধের পাদটীকায় বলেছেন, : '[...] বুদ্ধদেব বসু অনেকগুলি নাটক রচনা করেন, যাকে তিনি নিজে কাব্যনাটক বলে মনে করতেন।'[৯]

বস্তুত, বিভাগোত্তরকালে আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী বুদ্ধদেব বসু। বাংলা সাহিত্যে এরপর যাঁরাই কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই কমবেশি বুদ্ধদেব বসু রচিত কাব্যনাট্যের প্রভাব বিদ্যমান। বুদ্ধদেব বসু ১৯৬৬- ১৯৭৩ সময়পরিসরে সর্বমোট তেরোটি নাটক রচনা করেছেন যার মধ্যে ছয়টি নাটককে পরিপূর্ণভাবে শিল্পসফল কাব্যনাটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখযোগ্য কাব্যনাটকগুলো হলো – *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা (*১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০), *প্রথম পার্থ* (১৯৭০), *সংক্রান্তি* (১৯৭৩)। বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর অবদান নির্ণয় করতে গিয়ে সাহিত্য-গবেষক ড. মাহবুব সাদিক নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> বাংলা কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় পর্যায়টি সমৃদ্ধ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর একক কৃতিত্বে। আধুনিক কাব্যনাট্য রচনার পথিকৃৎ তিনি। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ বুদ্ধদেব বসু। [...] জীবনের অন্ত্যপর্বে তিনি নিবিষ্ট হয়েছিলেন নাটক রচনায়। [...] বাংলা কাব্যনাট্যের রূপকল্প গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।[১০]

মূলত, 'কবি ও কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব আধুনিকতার পতাকা সগৌরবে বরাবর উড্ডীন করে শেষ বয়সে দেশি ও বিদেশি পুরাণের হলেন নিবিষ্ট পাঠক। আর সেখান থেকেই পেলেন কাব্যনাট্য রচনার প্রেরণা।'[১১] বলাবাহুল্য বুদ্ধদেব বসুর সব কাব্যনাট্যে পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটেছে। পুরাণের অপেক্ষাকৃত গৌণ কাহিনিকে তিনি কল্পনার আশ্রয়ে সমকালীন ও অতীব প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। যেমন, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র কাহিনি তিনি *মহাভারতের* 'ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান' থেকে সংগ্রহ করেছেন।

পুরাণে উল্লেখিত সামান্য এক অনামী পতিতাকে তিনি আলোচ্য নাটকে তরঙ্গিণী নাম দিয়ে সমগ্র নারীত্বকে শ্রদ্ধার আসনে আসীন করেছেন। রাজগৃহে নানান অনুশাসন আর নিয়মের জালে বন্দি রাজকন্যা শান্তার পাশাপাশি আলোচ্য নাটকে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পতিতা নারীও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে; যা বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একদিকে রাজকুমারী শান্তা যেমন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পিতার অযাচিত হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে বিচিত্রগামিনী পতিতা নারী তরঙ্গিণী তার নতুন সত্তার আবিষ্কারে হয়েছে নিমগ্ন :

ক. শান্তা : আমার বিবাহ! আর আমারই অজ্ঞাতে তার আয়োজন! [...] এ কি ক্ষত্রনারীর স্বাধিকার নয় যে তার পতি হবে স্বনির্বাচিত? [১২]

খ. তরঙ্গিণী : আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো? [...] আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিলো – আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি – আমি খুঁজি সেই মুখ। [১৩]

স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুও এ বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে এ নাটক রচনার মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের ভূমিকায় বলেছেন :

> এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত – অর্থাৎ একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। [...] আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হ'য়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন;[১৪]

যদিও সমকালীন অনেক সমালোচক '*তপস্বী ও তরঙ্গিণী* পুরোপুরি কাব্যনাট্য নয়'[১৫] বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এটি কাব্য ও নাট্যমাধুর্যের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ কাব্যনাটক। যদিও এখানে লেখক গদ্যভাষা প্রয়োগ করেছেন, তবু এই গদ্যসংলাপে মিশে আছে কবিত্বের সুর। যেমন, প্রথম অঙ্কে প্রজাদের একটি সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

> কী দোষ করেছি আমরা – কেন দেয়া নির্দয়? [১৬]

এখানে 'কেন দেয়া নির্দয়?' অংশে স্পষ্টত কবিত্বের সুললিত মাধুর্য ধরা পড়েছে।

আবার, নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন চরিত্রের মুখের গানগুলিও চমৎকার শিল্পমাধুর্যসম্পন্ন শব্দ-ছন্দে অলঙ্কৃত। যেমন, একদিকে প্রেমিকের প্রেম, অন্যদিকে স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার – উভয় হারিয়ে মেকি জীবনযাপনে সমর্পিত রাজকন্যা শান্তার বিষাদাক্রান্ত মনোবেদনা প্রকাশের নিমিত্তে রচিত একটি গান উল্লেখ্য :

> আসে যায় দিন-রজনী
> আসে জাগরণ, তন্দ্রা
> শুধু নেই হৃৎস্পন্দ,
> লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন। [১৭]

এছাড়া তিনি *মহাভারতে*র ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি নিয়ে রচনা করেছেন *প্রথম পার্থ*, *অনাম্নী অঙ্গনা*, *কালসন্ধ্যা* প্রভৃতি কাব্যনাটক। পুরাণ থেকে ঘটনাংশ সংগ্রহ করে সেগুলো নিয়ে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন পুরাণ বর্তমানেও কতখানি প্রাসঙ্গিক; এবং *মহাভারতে*র বর্ণনাগুলো কিছু স্থবির কাহিনির সমষ্টি নয়, বরং তার প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলত, বিষয়বস্তু ও শিল্প নিয়ে

নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাট্যমানসকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় তাঁর অবস্থান সুনির্দিষ্ট, অবদান অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্যধারায় প্রাণিত হয়ে এরপর বাংলাদেশে অনেক কবিই কাব্যনাট্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তবু একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে, 'বাংলাদেশে কাব্যনাট্য রচয়িতার সংখ্যা সীমিত। মূল নাট্যধারার কেউ কেউ দু-চারটি কাব্যনাট্য লিখলেও তা তাঁদের সৃজিত অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় অধিক মানসম্পন্ন নয়। ব্যতিক্রম সৈয়দ শামসুল হক।'[১৮] তবে বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ধারায় তাঁদের অবদান স্মরণযোগ্য। বিভাগোত্তরকালে বাংলাদেশের সাহিত্যে যাঁরা কাব্যনাট্যরচনায় উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি আ ন ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) প্রমুখ কবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি ও নাট্যকার আ. ন. ম. বজলুর রশীদের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কাব্যনাট্য সংকলন *ত্রিমাত্রিক* (১৯৬৬) একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকগাঁথাকে অবলম্বন করে তিনি *ধনুয়া গাঙের তীরে*, *মেহের তোমার নাম* ও *কোনো এক দীপক সন্ধ্যায়* নামক তিনটি কাব্যনাট্য রচনা করে *ত্রিমাত্রিক* কাব্যনাট্য সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, *ত্রিমাত্রিক* কাব্যনাট্য সংকলনের নাটকগুলোতে মাত্রারিক্ত সংগীত ও সুরের প্রাধান্য লক্ষ করে এগুলোকে কোনো কোনো সমালোচক গীতিনাট্য বলতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু শিল্পমানের বিচারে কাব্যনাট্যের মর্যাদা না পেলেও এগুলোকে কাব্যনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। এ নাটকগুলো সম্পর্কে লেখক নিজেই নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> দেশের জনপ্রিয় লোকগাথার অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, অনুসৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য এবং এভাবেই আমাদের লোক-কাহিনীগুলি নতুন রূপ ও রূপায়ণে দীর্ঘায়ু লাভ করবে। ফলে আমাদের কাব্য-সাহিত্যের ভাব ও রেখা-দিগন্ত আরো প্রসারিত হয়ে পড়বে। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের 'দিওয়ানা মদীনা' ও পশ্চিম পাকিস্তানের 'উমর-মারুঈ' লোকগাথা দু'টিকে কাব্যনাটিকায় আধুনিক আঙ্গিক ও রসরূপে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি।[১৯]

অর্থাৎ নাট্যকার স্বয়ং তাঁর এ রচনাগুলোকে কাব্যনাটক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের অনন্য নিদর্শন *মৈমনসিংহ গীতিকা*র 'দেওয়ানা মদিনা' *পালা* অবলম্বনে লেখক তাঁর অন্যতম কাব্যনাটক *ধনুয়া গাঙের তীরে* রচনা করেছেন। এটি বাংলাদেশের প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোককাহিনির অনুরচনা হলেও বজলুর রশীদ ভাষার শিল্পসৌকর্যে, ছন্দের নিপুণতায় নাট্যকাহিনিটিকে কাব্যনাট্যের উপযোগী করে তুলেছেন।

কোনো এক দীপক সন্ধ্যায় নাটকটির কাহিনি তিনি রচনা করেছেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় লোকগাথা *উমর-মারুঈ* থেকে প্রভাবিত হয়ে। এটি একটি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি। সিন্ধু নদীর অববাহিকার মালি নামক গ্রামের মারু উপজাতির কন্যা মারুই ও একই গ্রামের রাখাল যুবক খেতসীনের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছে। কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের সমন্বয়ে এটি উন্নীত হয়েছে শিল্পসফল কাব্যনাট্যের মর্যাদায় ।

অনেকটা ঐতিহাসিক নাটকের ঢঙে রচিত হয়েছে *মেহের তোমার নাম* কাব্যনাটক। মানবহৃদয়ের প্রেমাবেগ, মিলনব্যাকুলতা, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা প্রভৃতি নিয়েই নির্মিত হয়েছে এ-কাব্যনাট্যের মূল

আলেখ্য। এর নাট্যঘটনা খুব বেশি দীর্ঘ নয়। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্মিত এ-নাটকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

কবিতার পাশাপাশি কাব্যনাট্য রচনায় ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বিরল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর একাধিক দীর্ঘ কবিতা কাব্যনাট্যগুণ-সম্পন্ন। *দরিয়ায় শেষ রাত্রি* (১৯৪৪), *নয়া জিন্দেগী* (১৯৫২) এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। *দরিয়ার শেষ রাত্রি রচনার* নাট্যগুণ প্রসঙ্গে কবি ও সাহিত্য-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন :

> ফররুখের কবিতায় শুধুমাত্র নাট্যগুণের দিকে তাকালে তাঁর কাব্যগুণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যে-ক'টি কবিতায় ফররুখ এই দুই আপাতপ্রতীপ গুণকে মিলিয়েছেন, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।[২০]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতারীতিতে প্রভাবিত হয়ে ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক *নৌফেল ও হাতেম*(১৯৬১) রচনা করেন। বাংলাদেশের একজন কবির হাতে এমন একটি শিল্পসফল রসোত্তীর্ণ কাব্যনাট্য সমকালে অনেককেই বিস্মিত করেছিল। কোনো কোনো সমালোচক এটিকে দুঃসাহসিক কবিকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিন অঙ্কে রচিত এ কাব্যনাট্যটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ইয়েমেনের দানশীল শাহজাদা হাতেমতায়ি ও আরব-রাজা নৌফেলকে ঘিরে। হাতেমতায়ির বিপুল জনপ্রিয়তা এবং দেশব্যাপী ভূয়সী প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে হাতেমতায়িকে ধরে আনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন নৌফেল। মানবতা ও সেবার পথে নিবেদিত হাতেম অর্থকষ্টে পতিত এক দরিদ্র কাঠুরিয়াকে নৌফেল কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের টাকা পাইয়ে দেবার জন্য নিজেই রাজদরবারে হাজির হন। হাতেমের এই আত্মত্যাগী মহানুভবতায় নৌফেল যারপরনাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। নিজেই তখন স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজ মস্তকের রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন হাতেমতায়ির উন্নত শিরে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চৌদ্দমাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ নতুন করে বিনির্মাণ করে আঠারো মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবি ফররুখ আহমদ তাঁর *নৌফেল ও হাতেম* কাব্যনাটকের ছন্দ প্যাটার্ন রচনা করেছেন; যা ছিল ফররুখ আহমদের স্বাভাবিক কাব্যভাষার তুলনায় স্বতন্ত্র। আবার, নাটকটির অঙ্গসজ্জার বহুক্ষেত্রেই মাইকেলের কাব্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য অবলীলায় অনুসরণ করেছেন তিনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন তাঁর রচিত মহাকাব্যগুলোতে দীর্ঘ-উপমা, উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন, ফররুখ আহমদের আলোচ্য কাব্যনাটকটিতেও তেমনটা পরিলক্ষিত হয়। নাটকের শেষ কটি অন্ত্যমিলযুক্ত চরণ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে :

> কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়, – শুধু সে মানুষ
> নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী –পারে যে জাগাতে
> সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ, – ঘুমঘোরে যখন বেঁহুশ
> জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;
> যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
> দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর। [২১]

ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ও জাতিসত্তায় ধর্মের ইতিবাচক মহিমা প্রচারের উদ্দেশে তিনি রচনা করেছেন *নৌফেল ও হাতেম*। আর এটি করতে গিয়ে তিনি প্রাক- ইসলামি যুগের কাহিনি বেছে নিয়েছেন।

> 'বাংলা কাব্যে যেসব মহাকাব্য ও কাব্যনাটক রচিত হয়েছে তার বেশির ভাগেরই কাহিনি ও চরিত্র হিন্দু-পুরাণ, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ইত্যাদি এবং কিংবদন্তি ও লোককাহিনি থেকে আহৃত, কবির কল্পনার রং মিশিয়ে কাহিনি ও ঘটনা বিধৃত করেছেন, চরিত্র চিত্রণ করেছেন, প্রতীক ও রূপক ব্যবহার ও চরিত্র-সৃজনের মাধ্যমে শুভ ও কল্যাণের বাণী এবং মানবতাবাদী আদর্শ তুলে ধরেছেন।'[২২]

যদিও *নৌফেল ও হাতেমে* ধর্মীয় আবেগ ও ঐতিহ্য উপস্থাপনের কারণে রচনার শিল্পগুণ কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে, তবু স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ইতিহাসে এটি অপেক্ষাকৃত অধিক সার্থক ও জনপ্রিয় কাব্যনাট্য। এখানে চমৎকারভাবে কাব্যগুণের সঙ্গে নাট্যগুণের অন্বয় সাধিত হয়েছে, যেটি কাব্যনাটকটিকে নান্দনিক ও শিল্পোত্তীর্ণ করতে সহায়তা করেছে। বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন সমালোচক ফররুখ আহমদ এবং অপর কবি-নাট্যকার আলাউদ্দীন আল আজাদের ভূমিকা স্মরণ করে বলেছেন 'ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ কাব্যনাট্য রচনা করে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এ আঙ্গিকে রচিত বাংলাদেশের সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্যের পথটি উন্মোচন করে দিয়েছেন। ফররুখ *আহমদের নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের *ইহুদির মেয়ে* (১৯৬২) কাব্যনাট্য বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের বর্তমান বিকাশের ধারায় বিশেষভাবে স্মরণীয়, কেননা এদের প্রদর্শিত পথেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কাব্যনাট্য রচনায় একটা সজীব উজ্জ্বলতা আমরা লক্ষ করি।[২৩]

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) একজন দেশবরেণ্য সার্থক কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি একটি কাব্যনাটক রচনা করেছিলেন। *তিনটি গোলাপ* (১৯৬৫) নামক এই কাব্যনাটকটির প্রেক্ষাপট ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের হুদায়রা নামক একটি গ্রামের অধিবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত জীবনযাপন এবং মসজিদের ইমামের নির্ভীক সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের পটভূমিতে রচিত হয়েছে আলোচ্য কাব্যনাটক। *তিনটি গোলাপ* নাটকে ব্যবহৃত কাব্যভাষা শিল্পগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একজন প্রথিতযশা কবির কাব্যভাষায় রচিত এ-কাব্যনাট্যের নাট্যগুণ দুর্বল। কবি মূলত কিছু চরিত্রের সন্নিবেশনে একটি সরলরৈখিক কাহিনি এতে বর্ণনা করেছেন। নাট্যদ্বন্দ্ব কিংবা নাট্যিক চমক এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। চরিত্রগুলোও কাব্যনাট্যের বৈশিষ্ট্যানুসারে যথেষ্ট পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশের আর একজন স্বনামখ্যাত কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) ষাটের দশকে *ইহুদীর মেয়ে* (১৯৬২) নামক একটি কাব্যনাটক রচনা করেছিলেন। *ইহুদীর মেয়ে* কাব্যনাট্যের মূল বিষয় নরনারীর প্রেম ও ধর্মীয় প্রথার দ্বন্দ্ব। কবি এ-নাটকের কাহিনি সংগ্রহ করেছেন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' থেকে। তবে এ নাটকের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন ষাটের দশকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের কোপানলে পড়ে কারাবাসকালে বিশ্বব্যাপী সংঘটিত নানান বৈষম্যমূলক সংবাদের চেতনাগত প্রতিক্রিয়া থেকে। তিনি বলেন :

> 'ইহুদীর মেয়ে' বইটা আকস্মিকভাবে লেখা, এমনকি, কতকটা দৈব যোগাযোগ বলা যেতে পারে, যদিও ওসবে বিশ্বাস নেই। জেলখানায় মনটা থাকে খেয়ালী ও স্পর্শকাতর; এবং খবরের কাগজ উত্তেজনার প্রধান অবলম্বন। খবরের কাগজে আমেরিকার একটি বিদ্যালয়ে বর্ণ-বিদ্বেষের বর্ণনা পড়ে যখন বিষণ্ণ, তখন 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র একটি জরাজীর্ণ কপি আমার টেবিলে থাকত; মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তার পাতা ওল্টাই। একবার জেনেসিসের একটি আখ্যানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম এ বিষয়ে শিল্পায়নের একমাত্র প্রকরণ কাব্যনাট্য।[২৪]

এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সালেমী রাজ্যের রাজা হামরের পুত্র সেচেম এবং উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ধনকুবের ইয়াকুব- কন্যা দিনা। তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু তাদের অবিভাবকরা জাত্যাভিমান, শ্রেণিবৈষম্য ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমনকি তাদের এই ভালোবাসার সূত্র ধরে দুই জাতির মধ্যে লেগে যায় তুমুল যুদ্ধ। আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রকৃতপক্ষে সালেম-দিনার প্রেমাবেগ ও তার করুণ পরিণতির মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের, বিশেষত আমেরিকায় সংঘটিত যাবতীয় বর্ণবৈষম্য, শ্রেণিবৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন। নাটকের অভ্যন্তরে নাট্যকারের মূল সে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে দিনার ভাই রুবেন নামক চরিত্রের মুখনিঃসৃত সংলাপের মাধ্যমে :

> বর্ণে বর্ণে ইতর–বিশেষ, জাতি-জাতি গোত্রে গোত্রে
> আকৃতি অশেষ; তবু মানতেই হবে যদি যুক্তি
> মূল্যবান, এ কেবল বাইরের রূপ, তার মানে
> আমরা সবাই এক আদমের বীজ, সুনিশ্চিত
> একই অস্থির রজ্জুতে আবদ্ধ স্বর্গভ্রষ্ট জীব। [২৫]

আলোচ্য নাটকে কাহিনির প্রবাহ তৈরিতে ও নাট্যগ্রন্থি উন্মোচনে উপযুক্ত দক্ষতা দেখিয়েছেন নাট্যকার। এছাড়াও অত্যন্ত আকর্ষণীয় নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি ও নিপুণ সংলাপনির্মাণে *ইহুদীর মেয়ে* নাটকটি বাংলা সাহিত্যে একটি সার্থক কাব্যনাটক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যে কাব্যনাটক রচনায় সৈয়দ শামসুল হকের(১৯৩৫-২০১৬) কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। একাধারে জনপ্রিয় ও শিল্পসফল কাব্যনাটক রচনায় তিনি তুলনারহিত শিল্পী। সৈয়দ শামসুল হক পেশাগত কারণে ইংল্যান্ডে থাকার সময় প্রচুর মঞ্চ নাটক প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তিনি গ্রিক ও শেকস্‌পিয়রিয়ান নাটকে ব্যবহৃত কবিতার লালিত্যপূর্ণ শক্তি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন। বিশেষত, এলিয়ট-ইবসেন রচিত কাব্যনাট্যের ধরন সৈয়দ হককে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। আবার এদেশীয় লোকসমাজ, লোকসংস্কৃতি, লোকগাঁথা, *মৈমনসিংহ গীতিকা* এমনকি মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের মাটিগন্ধী মাধুর্যে সৈয়দ শামসুল হক ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ফলত, পাশ্চাত্য নাট্যফর্ম ও প্রাচ্যের বিষয়– এ দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে তিনি কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হকের হাত ধরেই বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন :

> ৭১ পরবর্তী সময়ে সৈয়দ শামসুল হক যখন নাটক লিখতে শুরু করেন, তখন তিনি কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ... বিষয় বাদ দিয়েও ফর্মের দিক দিয়ে তিনি আমাদের নাট্যাঙ্গনে পথিকৃৎের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মনে করেন কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের মানুষের সাথে যোগাযোগ খুব সহজ হয়, কারণ কবিতা আমাদের মাটির কাছাকাছি। তার মত নিয়ে মতান্তর হতে পারে, কিন্তু কাব্যনাট্যকে তিনি আমাদের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২৬]

কাব্যনাটক রচনা সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হক বলেন :

> 'অনেকদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে এই বর্তমানে বাংলা ভাষায়, খণ্ড কবিতার সব সম্ভাবনা আপাতত আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি, এখন একে কিছুদিনের জন্য পাশে রেখে অন্যদিকে মুখ ফেরানো প্রয়োজন – হতে পারে মহাকাব্য, কথাকাব্য কিংবা কাব্যনাট্য।'[২৭]

সৈয়দ হকের কাব্যনাটকের সংখ্যা ১০টি – *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮১), *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২), *ঈর্ষা* (১৯৯০), *নারীগণ* (২০০৫), *চম্পাবতী* (২০০৮), *অপেক্ষমাণ* (২০০৯), *উত্তরবংশ* (২০০৮*) এবং মরা ময়ূর (২০১৪)*। এসব কাব্যনাট্যে উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর সৃজনী প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটকে প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইতিহাসকে। তবে মুক্তিযুদ্ধ এ নাটকের প্রেক্ষাপট হিসেবে উপস্থাপিত হলেও, নাট্যকার এখানে ইতিহাসের ঘটনাবলির ধারাবিবরণী উপস্থাপন করেননি। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে এ নাটকের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন – যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শ্রেণি রাজনীতির স্বরূপ, সর্বোপরি সাধারণ জনগণের ওপর ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাব। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঘটনার বিবরণী নয়, ঘটনার কার্যকারণ ও তৎসূত্রে চরিত্রের মনোকথন উন্মোচনই এখানে নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় এ নাটকটি রচনা করে তিনি বাংলাসাহিত্যে নাট্যভাষার এক নতুন ধারার সূচনা করেছেন।

নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটকটি বাস্তব ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক বীরযোদ্ধাকে নিয়ে রচিত হয়েছে। এখানে বাংলার বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের সাধারণ কৃষকজীবনের চাওয়া-পাওয়া, ক্ষোভ, দ্রোহ ও বঞ্চনার কথকতা যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি ভাগ্যান্বেষণে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুদূর বিলেত থেকে আগত ব্রিটিশ কর্মচারীদের শোষণ-শাসনের স্বরূপ, ব্যক্তিগত হতাশা ও জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখার গল্প উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। সৈয়দ শামসুল হকের রচনাগুণে ও ভাষানির্মাণ দক্ষতায় *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকের প্রায় অধিকাংশ সংলাপ আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। যখনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জনগণ জেগে ওঠে, তখনই তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নূরলদীনের – 'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়' সংলাপ।

এখানে এখন নাটকটি সৈয়দ শামসুল হকের একটি নিরীক্ষামূলক সামাজিক কাব্যনাটক। যুদ্ধোত্তর কালপরিসরে বিপর্যস্ত সমাজ, বিনষ্ট রাজনীতি, সর্বোপরি মানুষের মজ্জমান চেতনার স্বরূপ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। নাটকের প্লট নির্মাণ, চরিত্রায়ণ কৌশল কিংবা মঞ্চ-উপস্থাপনকৌশল সবকিছুতেই নাট্যকারের অভিনব ভাবনা নজর কাড়ে। ভাষাবিন্যাসেও তিনি তাঁর অন্যান্য রচনাশৈলীর মতো কুশলী ও সার্থক।

কিংবদন্তিতুল্য ব্রিটিশ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বিখ্যাত ট্রাজিক নাটক *জুলিয়াস সিজার* অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *গণনায়ক* কাব্যনাটকটি রচনা করেন। এ নাটকটি রচনার পেছনে নাট্যকারের প্রগাঢ় দেশপ্রেম, দেশের ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজ সম্পর্কে প্রবল সচেতনতাবোধ কাজ করেছে। বস্তুত, *গণনায়ক* নাটকটিতে রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। খুব কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা দ্বারা একজন রাষ্ট্রপতি কীভাবে খুন হতে পারে, বাস্তবতার আলোকে তার বর্ণনা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এখানে। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর ছায়া প্রবলতর। বস্তুত, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে যখন সমগ্র জাতি এক অদ্ভুত নিশ্চুপতায় ডুবে ছিল, সমগ্র দেশে যেখানে জাতির জনকের নাম মুখে নেয়াই নিষিদ্ধ ছিল; তখন সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বিভিন্ন লেখায় বিশেষত, এ-কাব্যনাট্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এককভাবে সৈয়দ হকই সম্ভবত শেকসপিয়ারের অধিক সংখ্যক নাটকের অনুবাদ করেছেন, কিংবা শেকসপিয়ার রচনাবলি থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে তা এদেশের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সমীকৃত করে বিনির্মাণ করেছেন। কাব্যনাটক *ঈর্ষা* এমনই একটি রচনা। এর মৌল বিষয় মানবিক ঈর্ষা। শেকসপিয়ারের *ওথেলো* নাটক থেকে ঘটনাংশ আহরণ করলেও তাকে একান্ত নিজের মতো করে আলোচ্য নাটকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। তিনটি মাত্র চরিত্রের সাতটি মাত্র সংলাপে তিনি মানবজীবনে জৈবিক ঈর্ষার বিষময় ফল চিত্রিত করেছেন। এ নাটকের ভাষা কবিত্বের মাধুর্যে অনন্য; নাট্যকাঠামোও অভিনব।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক *নারীগণ*। তবে পলাশির করুণ ইতিহাস এ- নাটকের প্রেক্ষাপট হলেও পূর্বজ নাট্যকারদের অনুসরণে তিনি সিরাজদ্দৌলা-বিষয়ক দেশাত্মবোধক ও ভাবাবেগসম্পন্ন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেননি। বরং তিনি এখানে রাজমহলের উচ্চবংশীয় নারীদের মনোকথনের পাশাপাশি উপস্থাপন করেছেন উপেক্ষিত সেইসব দাসীদের অনুক্ত কথা, যারা দাসপ্রথার নির্মম শিকার হয়ে পিতা-মাতা, গৃহ হারিয়ে অন্তঃপুরবাসিনীর জীবনযাপনে বাধ্য হয়, এবং রাজপরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। এ-নাটকে বারবিলাসিনীদের জীবনগাথাও অত্যন্ত দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। তিনি কুতুব চরিত্রের সংলাপে *নারীগণ* নাটক লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে বলেছেন : স্মৃতির প্রচ্ছদপটে আঁকা শুধু রাজাদেরই মুখ! / নারীর কথা কে লেখে ? কার মনে থাকে ?[২৮]

কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত জনপ্রিয় লোকনাটক *বেদের মেয়ে* অনুসরণে সৈয়দ হক তাঁর *চম্পাবতী* কাব্যনাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার মনে করেছিলেন জসীম উদ্‌দীন বাংলাসাহিত্যে প্রায় অনালোচিত বেদে সমাজকে পাঠক-দর্শকের সম্মুখে বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরার বাসনায় রচনার নাট্যগুণ ক্ষুণ্ন করে ফেলেছেন। ফলে তিনি মূল রচনার সুর অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন-পরিশোধন করে সেটি নতুন রূপে সাজিয়েছেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ হক জসীম উদ্‌দীনের মতো গতানুগতিক নাট্যধারা অনুসরণ না করে ১০টি দৃশ্যের মাধ্যমে আদ্যন্ত সমগ্র নাটকটি নির্মাণ করেছেন। ফলে নাটকটি লোকনাট্যের শিথিলতা পরিত্যাগ করে আধুনিক কাব্যনাটক হয়ে উঠতে পেরেছে।

অপেক্ষমাণ নাটকটি সৈয়দ শামসুল হক ইবসেন-নাট্যোৎসবে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশক আতাউর রহমানের বিশেষ পরিকল্পনা ও পরামর্শে রচনা করেছিলেন। এটি মূলত তিনটি নাটকের মিথস্ক্রিয়া। এখানে সৈয়দ শামসুল হক ও নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেন যুগলভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। সৈয়দ শামসুল হক হেনরিক ইবসেনের এমন দুটি কালোত্তীর্ণ নাটককে বেছে নিয়েছেন, যেখানে নাটকগুলোর প্রধান চরিত্ররা সত্যের প্রয়োজনে সমাজের বিরুদ্ধে লড়েছে। সমাজের বিপক্ষে কথা বলায় স্বভাবতই তারা একা হয়ে গেছে, তবু সত্যের পথ থেকে বিচলিত হয়নি। অন্যদিকে, তিনি তাঁর *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রকেও এ-নাটকের সঙ্গে যুক্ত করে করেছেন– যিনি শেষপর্যন্ত সত্যের আয়নায় দাঁড়িয়ে জীবনের প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

মরা ময়ূর নাট্যকারের একটি রূপকধর্মী রচনা। এ-নাটকে 'আজানে'র প্রয়োগ ও এতদ্বিষয়ক সংলাপকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মৌলবাদী গোষ্ঠী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এতৎসত্ত্বেও নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটি সমকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ একটি অসাধারণ নাট্যকর্ম। অন্যদিকে যুদ্ধপরাধী ও

মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবি নিয়ে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *উত্তরবংশ* নাটক রচনা করেছেন। একটি বিশেষ রাজনৈতিক সরকারের আমলে, মুক্তবুদ্ধির ওপর মৌলবাদীগোষ্ঠীর রক্তাক্ত হামলার প্রসঙ্গটিও এখানে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল একাত্তরের ঘাতক-দালালদের প্রকৃত ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, যেন তারা প্রকৃত সত্য অবগত হয়ে দেশ থেকে ঘাতক, রাজাকার, মৌলবাদী শক্তির বিনাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্যনাটকটি রচিত হলেও সৈয়দ শামসুল হকের সৃষ্টিশীল প্রতিভাগুণে এটি একটি সার্থক কাব্যনাটক হয়ে উঠতে পেরেছে।

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাট্য সৃজনে নিজস্ব কল্পনা ও পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন কাজে লাগিয়েছেন, ঠিক তেমনি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পঠন-পাঠনসূত্রে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমীকৃত করে তাঁর সৃষ্টিকে উত্তীর্ণ করেছেন অনন্য স্থানে। তিনি বরাবরই নিরীক্ষাপ্রিয় নাট্যকার। নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন তিনি অনন্য রুচিশীলতা দেখিয়েছেন, তেমনি কাব্যনাট্যের ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন। বস্তুত, সৈয়দ হকের সাহিত্যপ্রয়াসে তাঁর নাট্যসাহিত্য অতি-উজ্জ্বল অংশ অধিকার করে আছে। সমগ্র বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

সৈয়দ শামসুল হকের সমকালে যেসব কবি-নাট্যকার কাব্যনাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), সাজেদুল আউয়াল (জ.১৯৫৮), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যদিও সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যের সংখ্যার তুলনায় এদেঁর রচনা সংখ্যাগত দিক দিয়ে সীমিত, তদুপরি শিল্পমানবিচারে একেবারে অনুল্লেখ্য নয়।

কবিতা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়েই কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) কাব্যনাটক রচনায় উৎসাহবোধ করেন। বস্তুত 'আমরা আব্দুল মান্নান সৈয়দকে সৈয়দ হকের প্রতিদ্বন্দ্বী কাব্যনাট্যকার হিসেবে দাঁড় করাতে চাই না। তবে মান্নান সৈয়দকে কাব্যনাট্যকার হিসেবে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন বোধ করি।'[২৯] তিনি *বিশ্বাসের তরু* (১৯৬৯), *জ্যোৎস্না-রোদ্রের চিকিৎসা* (১৯৬৯), *চাকা* (১৯৮৫), *কবি ও অন্যেরা* (১৯৯৬), *আটতলার ওপরে* (১৯৯৭) প্রভৃতি কাব্যনাটক রচনা করেছেন।

ষাটের দশকের অনন্য কবিপ্রতিভা আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) *ওরা কয়েকজন* (১৯৭৫) নামক একটি কাব্যনাটক রচনা করেছেন। *ওরা কয়েকজন* কাব্যনাট্যের স্থান একটি জনবহুল রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুম। আর এখানে অপেক্ষারত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষই এ নাটকের চরিত্র। মূলত এসব চরিত্রের মনোকথন, অন্তর্গত সত্তার রহস্য উন্মোচন লেখকের মৌল উদ্দেশ্য। সে-বিচারে এটি কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করলেও এতে উল্লেখযোগ্য নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছেন হাসান। তবুও আবুল হাসানের *ওরা কয়েকজন* কাব্যনাটক বাংলাদেশের কাব্যনাটকের ধারায় অনন্য সংযোজন।

অপরদিকে, কবি-নাট্যকর্মী সাজেদুল আউয়াল ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিতাস পারের মালো সম্প্রদায়ের কর্মবৈচিত্র্যময় জীবন, সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার নির্মম বাস্তবতাকে উপজীব্য করে রচনা করেছেন তাঁর কাব্যনাটক *ফণিমনসা* (১৯৮৫)। সাজেদুল আউয়াল নিজে ছিলেন ঢাকা

থিয়েটারের সক্রিয় নাট্যকর্মী। একারণে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এই কাব্যনাটকের ক্যানভাসে বাংলার চিরায়ত ইতিহাস, ঐতিহ্যকে অনায়াসেই ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

স্বল্পায়ু তরুণ কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্যনাট্য *বিষ বিরিক্ষের বীজ* (১৯৯২)। এর বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকাল। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার আক্কেল মোড়লের যাপিত জীবনাচরণের মাধ্যমে রুদ্র সমকালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার এক নির্মম ছবি এ-নাটকে অঙ্কন করেছেন। গণআদালত পর্ব, বীরাঙ্গনা পর্ব, শুঁড়িখানা পর্ব, অস্ত্রসমর্পণ পর্ব, ক্যাম্প পর্ব, গর্ভপাত পর্ব ও ক্ষমা পর্ব – এই সাতটি পর্বের মাধ্যমে উপস্থাপিত এ-কাব্যনাট্যে কবি ও নাট্যকার হিসেবে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ নিজের আলোকিত একটি অবস্থান তৈরিতে যে সক্ষম হয়েছেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য প্রভাবে যে নাটক রচনা শুরু করেছিলেন, তারই পরবর্তী ধাপ কাব্যনাটক সৃষ্টি। মাইকেল-পরবর্তী নাট্যকারগণ, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিরীক্ষাপ্রবণ মনন ও নাটকে অভিনব আঙ্গিক পরীক্ষাগুণে বাংলাসাহিত্যে কাব্যনাটকের শুভসূচনা ঘটে; যেটি পরবর্তী কবিদের– বিশেষত কবি বুদ্ধদেব বসুর রচনার মধ্যদিয়ে ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ইতিহাসও কালধর্মের বিচারে দীর্ঘ নয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যেমন জন্ম, এদেশের সত্যিকার নাটকের জন্মও স্বাধীন বাংলাদেশে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে মঞ্চ নাটকের নবযুগ সূচিত হলো।'[২৮] অতঃপর প্রতিভাবান কবি-নাট্যকারদের মিলিত প্রয়াসে রচিত হতে শুরু করল বিচিত্র বিষয়বাহিত কাব্যনাট্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত সফল হলেন, আবার কারও কারও প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। তবে বাংলাদেশের কাব্যনাট্য বিকাশের ধারায় তাঁদের প্রত্যেকের অবদানই অনস্বীকার্য।

তথ্যনির্দেশ

১ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ববিচার*, (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, , ২০১৮), পৃ. ১৭

২ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ১৪৭

৩ Elizabeth Drew , *Discovering Drama* (উদ্ধৃত : শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ৭০

৪ পেশাদার নাট্যচর্চার প্রাচীনতম ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম জাপানের 'নো' নাটক। সংগীত, নৃত্য, ও অভিনয়ের সমন্বয়ে এ নাট্যধারার প্রচলন হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে, যেখানে বৌদ্ধধর্মের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : ড. মো. নজরুল ইসলাম, 'জাপানি নাটক : নো', সাহিত্যপাতা, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৩ আগস্ট, ২০১৯)

৫ সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ.১৯-২০

৬ 'কাব্যনাট্যের রূপতাত্ত্বিক ধারণা ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অনবহিত থেকেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হন। তৎকালীন বঙ্গীয় নাট্যবোধ ছিল প্রবলভাবে শেক্সপীয়র রূপরীতির দ্বারা দীক্ষিত এবং পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের চাহিদানির্ভর ও রুচিসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ দর্শকের নাট্যাদর্শের অভিমুখী হয়ে নাটক রচনায় নিয়োজিত হননি কিংবা মধুসূদনের মত পেশাদারি নাট্যমঞ্চের বহির্গত চাপেরও মুখোমুখি হননি। তাঁর নাট্যরচনায় শিল্পচেতনার

আভ্যন্তর প্রণোদনাই সক্রিয় ছিল বলে নাট্যরূপের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীন, অন্তত স্বকীয় রূপাদর্শের নিমার্ণলক্ষ্যে কাব্যনাট্যকে অনুসন্ধেয় করতে পেরেছিলেন।'– বেগম আকতার কামাল, *রবীন্দ্রনাথ : যেথায় যত আলো*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ১৬০

৭ অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ১১

৮ ড. কণিকা সাহা, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য : উদ্ভব ও বিকাশ*, (কলকাতা: সাহিত্যলোক প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৪৭

৯ আলোক সরকার, 'অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক', *প্রবহমান সাহিত্য*, (কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৭) [উদ্ধৃত : আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ.৯৫

১০ মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য : একালের জীবনভাষ্য*, (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০০৯), পৃ. ১২-১৭

১১ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫

১২ বুদ্ধদেব বসু, *কাব্যনাট্যসমগ্র*, বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত),(ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০১৩) পৃ. ১৬, ১৮

১৩ তদেব, পৃ. ৫৫

১৪ তদেব, পৃ. ২৮-২৯

১৫ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩০৬

১৬ বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১৭ তদেব, পৃ. ৬০

১৮ মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, আব্দুল মান্নান সৈয়দের নাট্যসাহিত্য 'প্রবন্ধ', *কালি ও কলম* (অনলাইন সংস্করণ), ২৩ এপ্রিল, ২০১৮

১৯ আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, *ত্রিমাত্রিক*, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৬), 'ভূমিকাংশ'

২০ আব্দুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

২১ ফররুখ আহমদ, *নৌফেল ও হাতেম*, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯), পৃ.৯২

২২ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, 'বাংলা কাব্যনাটকের ধারায় ফররুখ আহমদের নৌফেল ও হাতেম', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৪ জুন, ২০০২

২৩ বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.),(ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৩২৮-৩২৯

২৪ আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ইহুদীর মেয়ে', *শ্রেষ্ঠ নাটক*,(ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৮৩

২৫ তদেব পৃ. ৯৪

২৬ রামেন্দু মজুমদার, 'বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭২-৮৬', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

২৭ সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্যসংগ্রহ*, (ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ), ১৯৯১, ভূমিকাংশ

২৮ সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্যসংগ্রহ*, (ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশনী), ২০১৬, পৃ. ৩৮০

২৯ মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, পূর্বোক্ত

৩০ আতাউর রহমান, 'সাম্প্রতিক নাটকে প্রতিবাদী চেতনা', '*থিয়েটার*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), ঢাকা, ১৮ তম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১৪০-১৪১

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN 2519-5816

সাঁওতাল হুল সূত্র অনুসন্ধান: বাংলার কৃষক আন্দোলনের মার্কসীয় বিচার

মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান হাওলাদার*

Abstract

This article examines why the peasant insurrection, such as the *Santal Hool* in Bengal, could not reach the threshold of a revolution, using Marxist perspectives on revolution. Peasant uprisings and protests against colonial exploitation, persecution, and deprivation surged with spontaneous fervour and enthusiasm until the 1930s, beginning with Britain's formation of a colony in Bengal. This hasty insurrection ultimately failed to achieve revolutionary status. Prolific neo-Marxist historian Ranajit Guha sought to comprehend the reasons behind the failure of the *Santal Hool* and other insurgencies in Bengal, using Anthony Gramsci's concepts of 'Spontaneity and Conscious Leadership' on revolution, ultimately arriving at findings that were 'conscious and political'. This essay seeks to elucidate the awareness or spontaneous urge, although politically structured revolts expressed by Guha eventually failed to materialise into revolution from a Marxist perspective. This analysis aims to elucidate the traits of peasant uprisings in Bengal from a Marxist perspective, with a consideration of the context surrounding the *Santal Hull*.

চাবিশব্দ: সাঁওতাল হুল, নিম্নবর্গ, স্বতঃস্ফূর্ততা, বিদ্রোহী শ্রেণি-চেতনা, আপসতত্ত্ব।

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

সাঁওতাল হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতবর্ষের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা সাঁওতাল বিদ্রোহ। ভূমির চিরায়ত মালিকানা থেকে উচ্ছেদ ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে ভূমিপুত্র সাঁওতালদের নিজেদের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠার এক অনন্য অতুলনীয় বীরত্ব গাঁথা সাঁওতাল হুল। সুপ্রকাশ রায় এ বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১] নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় এ বিদ্রোহ যতটা আলোচিত হয়েছে ভারতের তথা বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনের ইতিহাস চর্চায় সাঁওতাল বিদ্রোহ ততটা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়নি। আমাদের ইতিহাস চর্চায় ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের যে মন ও মানসিকতা বিরাজমান সেখানে নিম্নবর্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরতে খানিকটা দ্বিধা ও উদাসীনতা লক্ষণীয়। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতালের রক্তে যে রাঢ়-বঙ্গের ভূমি সিক্ত হয়েছে সেখানে আজও সাঁওতালরা নিজেদের ভূমির মালিকানা প্রতিষ্ঠায় লড়ে যাচ্ছে। জাতীয় ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গের কৃষিজীবী আদি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের এই রক্তাক্ত ইতিহাস সঠিকভাবে চর্চিত না হওয়ায় এ মানবিক সংকট রয়েই গেছে, যেখানে স্বাধীন দেশে জাত্যাভিমান বড় হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের অধিকার অস্বীকার করার মধ্যে।

ভারত তথা বাংলার অন্যতম বৃহৎ ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরা অন্যতম। রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় বর্তমান নিবাস হলেও প্রধান আবাসভূমি রাঢ়-বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চল এবং ছোটনাগপুর। সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয় (প্রোটো অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশপরম্পর।[২] কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষি সংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে সাঁওতালরা স্বীকৃত। ভারতের বিহার প্রদেশে প্রধানত তাদের আদি বসতি। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সাঁওতাল পরগণায় জনসংখ্যা ছিল ৪৫৫,৫১৩।[৩] সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে ২,৭৫২,৭২৩ পশ্চিমবঙ্গে ২,৫১২,৩১৩ উড়িষ্যায় ৮৯৪,৭৪৬ আসামে ৫০০,০০০ এবং বিহারে ৪০৬,০৭৬।[৪] ১৯৪১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ লক্ষ। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর আদমশুমারিতে সাঁওতালদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গণ্য না করায় বহু দিন তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সাঁওতাল জনসংখ্যা ছিল দুই লক্ষের কিছু বেশি এবং সর্বশেষ ২০০১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩ লক্ষের কিছু বেশি।[৫]

আদিকাল থেকে কৃষিজীবী এ নৃগোষ্ঠী বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমে সেখানে একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যেখানে অর্থনীতি পরিচালিত হতো বিনিময়-প্রথার ভিত্তিতে। সাঁওতালরা বিশ্বাস করত, যে ব্যক্তি প্রথম জঙ্গল কেটে জমি চাষের উপযোগী করে জমির মালিকানা তারই। মুঘলরা এতে হস্তক্ষেপ না করায় তখন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৭৯০ সালের পর থেকে সাঁওতালরা তাদের আদি বসতি ছেড়ে বঙ্গদেশ ও বাংলা-বিহার সীমান্তে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে মূলত নতুন ভূমি-নীতির কারণে। নতুন ভূমি ব্যবস্থায় জমিদারগণ যে জমি লাভ করেছিল তা ঘন বন-জঙ্গলে আবৃত, সে জমিতে সোনা ফলাতেই পূর্ব অভিজ্ঞ চৌকস কৃষিজীবী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ডাক পড়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত রাঢ়-বঙ্গে। সাঁওতালগণ প্রথম এসেছিল বীরভূম জেলায়, তারপর ক্রম

ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পাকুর, দুমকা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। ভাগলপুরের সাঁওতাল প্রধান এ অঞ্চলের নাম 'দামিন-ই-কো', যা পরবর্তীকালে সাঁওতাল পরগণা নামে নামকরণ করা হয় এবং এ অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল বাস করত।[৬] ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জমিদারগণ যখন নবগঠিত এ কৃষি ভূমিগুলির মালিকানা দাবী করে তখন **১৮১১**, **১৮২০** এবং **১৮৩১** সালে সর্বপ্রথম সাঁওতালদের মধ্যে বৃটিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ, সুসংগঠিত ও ব্যাপক পরিসরে এ অভ্যুত্থান ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে রূপ নেয় **১৮৫৫-৫৬** সালে এবং তা দমন করতে সরকারকে সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছে কয়েক দফা। আলোচ্য প্রবন্ধটি সাঁওতালদের এ সশস্ত্র প্রতিরোধের কারণ অনুসন্ধান এবং বিদ্রোহ বিপ্লব না হওয়ার মার্কসীয় ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা।

বিদ্রোহের সূত্র অনুসন্ধান

১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল হুল আকস্মিক কোনো বিস্ফোরণ নয়, দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভুত ক্ষোভ, বঞ্চনা, হতাশা, নির্যাতন-নিপীড়ন, অপরিমেয় ক্লেশের চূড়ান্ত প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল সাঁওতালিরা। প্রকৃতির এ বরপুত্ররা যখন ঘন বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদের উপযোগী করে তুললো, তখন একে একে আরো অনেকেই উপস্থিত হলো। জমিদার তার খাজনা আদায় করতে গোমস্তা, নায়েব সাজোয়াল (রাজস্ব আদায়কারী) ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়ে হাজির হলো সেসাথে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রাব্যবস্থা অর্থনীতির অনিবার্য ফল হিসেবে আবির্ভাব হলো বানিয়া-মহাজন শ্রেণির। মহাজনী ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অবাধ সুযোগে আকৃষ্ট হয়ে সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরা ও অন্যান্য অঞ্চল হতে ভোজপুরি, ভাটিয়া, পাঞ্জাবি, বাঙালি দলে দলে 'দামিন-ই-কো'-তে আসতে শুরু করে। এ বানিয়াগোষ্ঠী অগ্রীম অর্থ, লবণ, তামাক এবং কাপড়ের বিনিময়ে সাঁওতাল পরগণা হতে সস্তায় বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, সরিষা ও তৈলবীজ মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় প্রেরণ করত এবং সেখান থেকে তা ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু সাঁওতালরা ন্যায্য মূল্য থেকেও অনেক অল্প মূল্যে বিক্রি করতে অনেকটা বাধ্য হতো।[৭] এ অভ্যুত্থানের মূলে ছিল গভীর অর্থনৈতিক হতাশা ও ক্ষোভ। বাঙালি জমিদার ও পশ্চিম ভারতের মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উৎপীড়ন ও প্রতারণার অনিবার্য পরিণতি এ বিদ্রোহ।

বর্ষাকালে বা দুর্যোগের সময় সাঁওতালদের কিছুটা আর্থিক সহয়তা বা সামান্য চাল বা অন্য কোনো দ্রব্য দিয়ে তাদের বাকি জীবনের ভাগ্য-নিয়ন্তার আসনে বসে যেত এ সকল ফড়িয়া ব্যবসায়ী। দেনার টাকা আদায়ের জন্য ফসল কাটার সময় এসে হাজির হতো এবং মিথ্যা ও ওজনের কারচুপির মাধ্যমে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করত। জমির সমস্ত ফসল হস্তগত হওয়ার পরও খাতকের ঋণ পরিশোধ হতো না, বাস্তবে একবার নেয়া ঋণ কখনই পরিশোধ হতো না।[৮] শোষণের অন্যতম কুশীলব মহাজন। তাদের প্রদত্ত ঋণের বোঝা সাঁওতালদের জীবনসংহার করেছিল সেসময়। বারহাইত ও হিরণপুর ছিল মহাজন শ্রেণির প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্র। এ দুটি কেন্দ্রে সাঁওতালদের দেওয়া সুদে খুব অল্প সময়ে একটি ধনী মহাজন শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। এ সকল মহাজন উচ্চহারে সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করত। একজন সাঁওতাল মহাজনের ঋণের জন্য তার জমির ফসল, হালের বলদ, লাঙ্গল এমনকি নিজেকে এবং পরিবারকে হারাতে হতো। দিন যত যেতো ঋণের পরিমাণ কেবল বাড়তেই থাকত, আর সে ঋণের দশ গুণ পরিশোধ করলেও ঋণের বোঝা কমতো না। প্রকৃতপক্ষে, মহাজনরা এ অঞ্চলে বসবাস শুরুর করার দিন থেকেই সাঁওতালদের অবস্থা দিনে দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।[৯]

ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম স্তম্ভ জমিদার শ্রেণি ছিল ব্যবসায়ী-মহাজনদের লুটের এ মহোৎসবের ঘনিষ্ঠ সহচর। জমিদার তার নায়েব-গোমস্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে সাঁওতালদের উপর ভয়ংকর শোষণ, বলপূর্বক সম্পত্তি দখল, অপমান এবং শারীরিক নির্যাতন-উৎপীড় চালাত। ঋণের সুদের পরিমাণ শতকরা ৫০ হতে ৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হতো। কৃষকের জমির শস্য নষ্ট করার জন্য জোরপূর্বক গরুর পাল, গাধা, ঘোড়া এমনকি হাতি পর্যন্ত শস্যক্ষেত্রে নামিয়ে দিতো। তাছাড়া দরিদ্র, অসহায়, অশিক্ষিত সাঁওতালদের ঋণের শর্ত হিসেবে দাসত্বের বন্ড লিখিয়ে নিত।[১০] সমসাময়িক বীরভূমের কবি কৃষ্ণদাস রায়ের 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া'তে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়,

শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুঁকেছে
বেটারা কুক্ ছাড়িল জড়ো হৈল হাজারে হাজার
কখন আসে কখন লুটে থাকা হৈল ভার।
গেল কুমড়াবাদে সকল ফদে হৈল একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা করলে ছারখার।
পোড়াইলে ধানের গোলা, তিল জুল্যা সরিষা আদি যত
গরু মহিষ ছাগল ভেড়া পুড়িল কত শত।

শোষকের দল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ইংরেজ শাসনে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় গুড়েবালি, কেননা পুলিশ-পাইক-পেয়াদা তথা সমস্ত প্রশাসন ছিল এ সকল লুটেরাদের পক্ষে। এ অত্যাচার অবসানের উপায় ছিল না। ইংরেজ বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ রাজস্ব আদায়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে, প্রজার এ সকল অভিযোগ শোনার সময় তাদের ছিল না। দেশীয় আমলারা ছিল জমিদার-মহাজনদের হাতের পুতুল এবং পুলিশ এ লুটের ভাগ পেতো।[১১] তাছাড়া ইংরেজদের ভূমি-রাজস্বনীতি ছিল সাঁওতালদের দুরাবস্থার অন্যতম কারণ। কৃষিকাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ব্যাপক হারে। ১৮৩৮ সালে যেখানে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল ২০০০ টাকা, সেখানে ১৮৫৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪৩ হাজার ১৩ আনায়।[১২] হান্টারও জমি বৃদ্ধির সাথে সাথে খাজনা বৃদ্ধির কথা বলেছেন। স্বল্প ব্যয়ে কার্যকর শাসনের উদাহরণ দিতে গিয়ে ইংরেজ প্রশাসন সাঁওতাল পরগণার কথা বলতেন। কিন্তু সাঁওতালদের উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ সরকার নেয়নি।[১৩] জমিদার-মহাজনসহ সমগ্র ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থাই ছিল সাঁওতালদের চরম দুর্দশার জন্য দায়ী। কারণ, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাই তাদের নিজেদের প্রয়োজনে জমিদার-মহাজনের সৃষ্টি করেছিল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করত। একদিকে জমিদার-মহাজন ঋণের ভারে জর্জরিত করেছিল অসহায় সাঁওতালদের, অন্যদিকে ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল বিনা উন্নয়নে। এভাবে বৃটিশ প্রশাসন, তাদের সৃষ্ট জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন, ব্যবসায়ী, পুলিশ, আমলা সকলে মিলে অসহায়, দরিদ্র সাঁওতালদের উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল কয়েক যুগ ধরে। অবশেষে এ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভূমিপুত্ররা গর্জে ওঠে–

নেরা নিয়ী নুরু নিয়ী
ডিঁডী নিয়ী ভিটী নিয়ী
হায়রে হায়রে! মাপাক্ গপচ্ দ।
নুরিচ নাঁরাড় গাঁই-কাডা
নাচেল লাগিৎ পাচেল লাগি'
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এ্যাম রুয়াঁড় লাগিৎ

তবে দেবন হুল গেয়া হো।

[স্ত্রী পুত্রের জন্য
জমি জায়গা বাস্তু ভিটার জন্য
হায় হায় এ মারামারি, এ কাটাকাটি।
গো-মহিষ, লাঙল,
ধন সম্পত্তির জন্য
পূর্বের মতো আবার সব ফিরে পাবার জন্য
আমরা অবশ্যই বিদ্রোহ করব।]

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্গীরণ ও বিস্তার:

১৮৫৪ সালের শেষভাগ থেকে নিদারুণ অন্যায়-অত্যাচার এবং শোষণ ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে সাঁওতালরা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। কেউ কেউ মহাজনদের বাড়িতে ডাকাতি বা চুরির মাধ্যমে তাদের আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধারে প্রয়াসী হয়। *ক্যালকাটা রিভিয়্যু* এ সকল কর্মকাণ্ডকে 'অহেতুক নিষ্ঠুরতার উপযুক্ত শাস্তি'[১৪] হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। বীরসিং মাঝি সাঁওতালদের নিয়ে একটি ডাকাতির দল গঠন করেন, যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙালি ও পশ্চিম ভারতীয় মহাজনদের বাড়ি-ঘর লুটপাট করে অত্যাচরের জবাব দেয়া। পাকুর জমিদারের দেওয়ান বীরসিংকে আটক করে এবং তার অনুচরদের সামনেই তাকে লাঞ্ছিত করে। এতে সাঁওতালরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের লুণ্ঠন কার্যক্রমের বেগ বাড়িয়ে দেয়। এ সময় পুলিশের সহায়তার জমিদাররা সাঁওতালদের দমনে তৎপর হয়ে ওঠে এবং গোক্কো নামের একজন সম্মানিত অবস্থাপন্ন সাঁওতালিকে গ্রেফতার করে এবং তাকে লাঞ্ছিত করে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৫৪ সালের শেষভাগে গোক্কো, বীরসিং মাঝি প্রমুখ সাঁওতাল সর্দারদের উপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ থেকে প্রায় সাত হাজার সাঁওতাল 'দামিন-ই-কো'-তে জড়ো হতে থাকে।[১৫] জমিদার-মহাজনদের পক্ষ নিয়ে সাঁওতালদের ওপর পুলিশের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে সাঁওতালিরা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। আর প্রতিবাদের ভেতর থেকেই ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের আবির্ভাব ঘটে চূড়ান্ত সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে।

সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব– চার ভাই। সাঁওতাল পরগণার সদর বারহাইতের ভাগনাদিঘি গ্রামে এক দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারে তাদের জন্ম। প্রতিবাদমুখর দিনগুলিতে তারা সাঁওতালদের সাথে জড়ো হয়েছিল দীর্ঘদিনের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। সিধু ও কানু জানতেন সাঁওতালরা সহজেই সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কোনো অলৌকিক নির্দেশের দ্বারা আবেগতাড়িত হবে। তাই সিধু ও কানু প্রচার করতে শুরু করেন যে, ভগবান সকল উৎপীড়নকারীদের উচ্ছেদ করে সাঁওতালদের স্বাধীন জীবন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬] তারা চতুর্দিকে শাল গাছের শাখা প্রেরণ করে ভগবানের আর্বিভাবের কথা প্রচার করতে শুরু করে এবং ঠাকুরের নির্দেশ শোনাবার জন্য ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন এক সমাবেশের দিন ধার্য করে। এদিনে সাঁওতাল পরগণার প্রায় ৪০০ গ্রাম থেকে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল ভাগনদিহিতে জড়ো হয়। সভায় সিধু ও কানু একে একে সাঁওতাল জীবনের দুঃখ কাহিনি, ইংরেজ-জমিদার-মহাজন ও পুলিশের অত্যাচারের কাহিনি এবং এদের দ্বারা সাঁওতাল মা-বোন-স্ত্রীদের লাঞ্ছিত হওয়ার সকল বিবরণ দিয়ে বক্তৃতা করে। সিধু-কানুর সাথে সাক্ষাতে ভগবান এ অনাচারের বিরুদ্ধে তাদের লড়তে নির্দেশ

দিয়েছেন বলে তারা জানান। এ মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় আজন্ম দুঃখ-লাঞ্ছনায় ভারাক্রান্ত সাঁওতালরা জমিদার-মহাজন-পুলিশ প্রশাসন, আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট তথা ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল এ সমাবেশে শপথ গ্রহণ করে যে, তারা তাদের ভূমি থেকে সকল উৎপীড়ককে বিতাড়িত করে সকল জমি দখল নেবে এবং স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। এ উদ্দেশ্যে কির্তা, ভাদু ও সুন্নোমাঝি ভাগলপুর ও বীরভূমের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং কতিপয় জমিদার বরাবর পনের দিনের মধ্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চরমপত্র পাঠায়।[১৭] তারা আরো ঘোষণা করে যে, কুমার, তেলি, কর্মকার, মোমিন (মুসলমান তাঁতি), চামার এবং ডোমদের বিরুদ্ধে তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।[১৮]

১৮৫৫ সালের ৩০ জুন শুরু হয়ে যায় ভারতের নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাসে অন্যতম রক্তাক্ত সংগ্রামের যাত্রা। এদিন থেকেই কলকাতার উদ্দেশ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার সাঁওতাল যাত্রা শুরু করেছিল বলে হান্টার মন্তব্য করেছেন। ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাইকে সাঁওতাল বিদ্রোহের দিন বলে উল্লেখ করেন হান্টার। কারণ, এদিনে তারা দিঘী থানার দারোগাসহ নয় জনকে হত্যা করে সশস্ত্র বিপ্লবের যাত্রা শুরু করে।[১৯] বিদ্রোহীরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে। ডাক ও রেল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়, তাদের অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং মহাজন-ব্যাবসায়ী, গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা, ডাক-হরকরা, চৌকিদার, জমাদার, রেলওয়েতে নিয়োগ প্রদানকারী ঠিকাদার প্রমুখ ইংরেজসৃষ্ট নিপীড়কদের যাদেরকেই তারা পেয়েছে, হত্যা করেছে। জমিদারদের সকল প্রকার খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয় এবং মহাজনদের সকল ধরনের ঋণপত্র ও তমসুক বা বন্ধকিপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। *ক্যালকাটা রিভিউ*-তে একজন ইংরেজ মন্তব্য করেছিলেন, এরূপ আর কোনো অদ্ভুত ঘটনা ইংরেজদের স্মরণকালের মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের সমৃদ্ধিকে বিপদগ্রস্ত করে তোলেনি।[২০]

এমতাবস্থায় বিদ্রোহীদের দমন করতে ভাগলপুরের কমিশনার এ অঞ্চলের সামরিক অধিনায়ক মেজর বারোজকে সৈন্যদলসহ রাজমহল পর্যন্ত অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন। মেজর বারোজ ১৬ জুলাই কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে ভাগলপুর জেলার পিপলিতে পীরপাইতির ময়দানে সাঁওতালদের গতিরোধ করে। সাঁওতালরা টাঙ্গি (কুঠার) ও তীর ধনুক নিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং এতে একজন ইংরেজ অফিসারসহ পঁচিশজন সিপাহী নিহত হয়। মেজর বারোজ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ইংরেজ বাহিনীর পরাজয়ে সাঁওতালরা আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তাদের আক্রমণে বিহারের কিছু অংশ বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার বেশির ভাগ অঞ্চলে ইংরেজ শাসন কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ভাগলপুরের কমিশনার এতে দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং লর্ড ডালহৌসিকে অনতিবিলম্বে 'মার্শাল ল' বা সামরিক আইন জারি করার জন্য অনুরোধ করেন। ১৮৫৫ সালের ১৯ জুলাই সামরিক আইন জারি করা হয় এবং বিদ্রোহীদের দেখামাত্র হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়।

মেজর বারোজের নেতৃত্বে পনের হাজার সদস্যের তিনটি সুসজ্জিত সৈন্যদল পুনরায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। ইংরেজ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের ফলে সাঁওতালরা পিছু হটতে শুরু করে এবং জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। জঙ্গল থেকেই তারা গুপ্ত আক্রমণের মাধ্যমে ইংরেজ বাহিনী মোকাবেলা করতে থাকে। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর বিপুল সামরিক শক্তির সমাবেশ এবং তাদের অবর্ণনীয় উৎপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞের ফলে বিদ্রোহের উত্তাপ

সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে আসে। একে বিজয় হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইংরেজ সরকার ১৭ আগস্ট বিদ্রোহের প্রধান নেতৃবৃন্দ ব্যতীত অপর সকল বিদ্রোহীকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেয় এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ জারি করে। কিন্তু বিদ্রোহীরা এ আদেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে এবং নতুন করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

আগস্ট মাসের কয়েক সপ্তাহ সাঁওতাল পরগণায় শান্তি বিরাজ করলেও সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে পুনরায় সাঁওতালদের গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়। কয়েকটি বৃহৎ বাহিনীতে ভাগ হয়ে তারা নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করে এবং বীরভূম থেকে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের কার্যত অবসান ঘটে। সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করে দেয়া হয়, জমিদারগোষ্ঠী ও নীলকর-মহাজন উৎপীড়কদের সমূলে বিনাশ করা হয় এবং নিপীড়কদের বেশির ভাগ এ অঞ্চল থেকে পালিয়ে যায় এবং ইংরেজদের প্রশাসনিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। এমতাবস্থায় ইংরেজ সরকার ১০ নভেম্বর পুনরায় সামরিক আইন জারি করে একটি বিশাল বাহিনী পাঠায় বীরভূম থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনার জন্য। সামরিক বাহিনী বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার উপর অবর্ণনীয় তাণ্ডব চালিয়েছিল। হাজার হাজার সাঁওতাল নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। উন্মত্ত হাতি ছেড়ে দিয়ে শত শত সাঁওতালিকে হত্যা করে সকল বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে তাদের গ্রামগুলি উজাড় করা হয়েছিল– এ যেন এক পৈশাচিক অভিযান, যেখানে নিরীহ সাঁওতালিদের নির্বিচারে হত্যা করা উৎসবে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে, কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বিপ্লবীদের মধ্যেও হতাশা দেখা দেয় এবং তারা পিছু হটতে থাকে।

এমতাবস্থায় বিদ্রোহের অবিসংবাদী নেতা সিধু ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। একদল হতাশ সাঁওতালি সিধুর গোপন আস্তানার কথা সৈন্যবাহিনীকে জানিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যরা সিধুকে গ্রেফতারের সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান চরিত্র সিধু মাঝির আকস্মিক হত্যাকাণ্ড বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ম্রিয়মান করে দেয়। ইতোমধ্যে বিদ্রোহের অপর দুই প্রধান সেনানি চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের নিকট এক যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বীরভূম জেলায় পুলিশের হাতে ধৃত হন বিপ্লবের অন্যতম দ্রষ্টা কানু। গ্রেফতারের পর পরই তাকেও গুলি করে হত্যা করা হয়।[২১] বিপ্লবের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও একে একে সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাদের প্রায় সবাইকে বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করে ঔপনিবেশিক সরকার। এ বিপ্লবীরা কেউ ক্ষমা প্রার্থনা বা মাথা নত করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে প্রাণ ছিল তারা সকলেই দৃঢ়তার সাথে লড়ে গেছেন। ইংরেজ সেনাপতিকে সাঁওতালদের এ দুর্দমনীয়-দুর্বিনীত বীরত্ব অবাক করে দিয়েছিল এবং কেউ কেউ শ্রদ্ধার সাথে তাদের বীরত্বের কথা অকপটে বর্ণনা করেছেন।[২২] একদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মৃত্যু, অন্যদিকে ক্রমাগত কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সাঁওতালরা হতাশ হয়ে চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং প্রাণ রক্ষার্থে পাহাড়ে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহে শতকরা পঞ্চাশ জন নিহত হয়েছিল।[২৩] তাছাড়া ১৯১ জন সাঁওতাল এবং ডোম, ধাঙ্গও, গোয়ালা, ভূইয়া প্রভৃতি নিম্নবর্গের হিন্দুদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৪৬ জন ছিল নয় থেকে দশ বছরের বালক, যাদেরকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। বাকিদের সকলকেই সাত থেকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।[২৪] তাছাড়া সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা ঘোষণা করে একজন ডেপুটি কমিশনারের অধীনে শাসনভার ন্যস্ত করা হয় এবং সকল বাঙালি মহাজনদের সাময়িকভাবে এ পরগণায় বসতি স্থাপন

নিষিদ্ধ করা হয়। সাঁওতালদেরকে একটি স্বতন্ত্র উপজাতির স্বীকৃতি দিয়ে তাদের নিজেদের আবাসভূমিতে তারদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু খাজনা ও রাজস্ব হ্রাসের যে দাবি তারা করেছিল তা শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল। আর এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জাগানিয়া সপ্রতিভ সাঁওতাল বিদ্রোহের।

বিদ্রোহ বিপ্লব না-হওয়া: সাওতাল হুলের মার্কসীয় বিচার

অর্থনৈতিক উন্নয়ন 'শ্রেণিসংঘাতে'র পথ দেখায় এবং প্রলেতারিয়েতদের হাত ধরে সামাজিক বিপ্লবের উন্মেষ, প্রসার এবং সংঘটিত হয়। পুঁজিবাদের উন্নয়নের পাঁচটি মৌলিক ফলাফল মার্কস ও এঙ্গেলস সারসংক্ষেপ করেছেন। যেমন-

প্রথমত, পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ কৃষক, কারিগর এবং অন্যান্য উৎপাদককে দখলচ্যুত করে। এর ফলে প্রলেতারিয়েতদের উৎপাদনমুখী কোনো সম্পদ থাকে না এবং তাদেরকে মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে হয়। শ্রমের পণ্যীকরণের ফলে জবরদস্তিমূলক বিকল্প শ্রমিক শ্রেণি তৈরি হয়। যেমন- দাস, ভূমিদাস, মজুর, পিয়ন ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ বা পুঞ্জিভূতকরণের ফলে ছোটো ছোটো ব্যবসাসমূহ এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি বিকল্প উৎপাদন খাতও হ্রাস পেতে থাকে বা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে পাতি-বুর্জোয়া এবং বর্ধিত সর্বহারারা সমাবর্তিত হয় নতুন সমাজ কাঠামোতে। তৃতীয়ত বড় আকারের শিল্পোন্নয়ন শ্রমিককে তাদের নতুন কর্মস্থলে একত্রিত করে এবং এ সমবেত শ্রমিক সহজেই নিজেদেরক একত্রিত ও যৌথ ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণে প্রেরণা দেয়। চতুর্থত, যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমবেত ইউনিয়ন, অবরোধকারী এবং বিদ্রোহীদের স্থানীয় সংগ্রামকে জাতীয় ইস্যুতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। পঞ্চমত, যান্ত্রিকীকরণ কারুশিল্প এবং নতুন কারিগর তৈরি হ্রাস করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদের ফলাফল হিসেবে শিল্পোন্নয়ন নতুন শ্রেণি কাঠামো গঠন এবং শ্রমিক শ্রেণিকে সংখ্যায় এবং ক্ষমতার দিকে থেকে সমবেত করতে পারে সহজেই। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা শোষণের বিরুদ্ধে সহজেই প্রতিবাদ করতে পারে, যদিও এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন শ্রমিকদেরকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করে না। যদি কখনও কখনও তারা সরাসরি সংঘাতে সমবেত এবং সংগঠিত হয়, কিন্তু তারা কেন একত্রিত হয়েছে সে ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তাদের ব্যাখ্যাদানের অপারগতা বুঝতে হলে 'শোষণের তত্ত্ব' (Theory of Exploitation) জানা আবশ্যক। উৎপাদকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য নিষ্কোষিত করে নেওয়াই হচ্ছে 'শ্রেণি-শোষণ' (Class Exploitation)। অর্থ্যাৎ শোষণের হার হচ্ছে শ্রমশক্তির মোট মূল্যের সাথে উদ্বৃত্ত মূল্যের আনুপাতিক হার।[২৫] আর মার্কসীয় তত্ত্বের মৌলিক উৎসই হচ্ছে এ শ্রেণি সংঘাত[২৬] যা পুঁজিবাদী সমাজের বা বিপ্লবের ভিত তৈরি করে। আপাতদৃষ্টিতে এটা স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণিশোষণই বিপ্লবের পথ দেখায়। তবে এ বিপ্লবকে পথ দেখাতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হচ্ছে, 'বিদ্রোহী শ্রেণিচেতনা' (Rebellious Class Consciousness)।

'বিদ্রোহী শ্রেণিচেতনা'র উৎস অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বিপ্লবকে বুঝতে। 'বিদ্রোহী শ্রেণি চেতনা' আসে রাজনৈতিক সংঘাতের ঐতিহ্য থেকে। অতীত সংঘাতে বুর্জোয়া শ্রেণির অংশগ্রহণ প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত করে যে, শ্রমিকরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন[২৭] এবং স্বতোস্ফূর্তভাবে এটাকে তারা যুদ্ধ (Fight it out) মনে করে।[২৮] মার্কস মনে করেন, শ্রেণিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই শ্রেণিচেতনার উৎসরণ। সংঘাতের ঐতিহ্য পরোক্ষভাবে শ্রেণিচেতনার কাঠামো এবং বিষয়বস্তু

নির্ধারণে ভূমিকা রাখে যা শ্রমিক শ্রেণি বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যগতভাবে লালন করে।[২৯] সাঁওতালদের বা কৃষকদের পূর্ব-বিদ্রোহের বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাস অভিজ্ঞতায় খুব বেশি আলোকিত নয়। এ পর্যন্ত বিদ্রোহ হওয়ার বা ফলাফল স্বরূপ বিপ্লব হওয়ার ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের সূত্র ধরে। কিন্তু বাংলায় বা ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুসন্ধান বাতুলতা মাত্র। তাই হুল বিদ্রোহের মার্কসীয় অনুসন্ধান পুঁজিবাদের বিকাশের ব্যাখ্যায় মেলানো সম্ভব নয়।

শ্রেণিচেতনা মানব সভ্যতার বিকাশে এমন একটি পর্যায়কে চিহ্নিত করে যেখানে সর্বহারা শ্রেণি তাদের শোষণ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে। মার্কসবাদে শ্রেণি চেতনা হলো, বিশ্বাসের এমন সব আনুষঙ্গিক অংশসমূহ যা ব্যক্তিবর্গের সমাজে তাদের সামাজিক শ্রেণি বা অর্থনৈতিক পদ মর্যাদা, তাদের শ্রেণিকাঠামো এবং তাদের শ্রেণিগত স্বার্থকে ধারণ করে।[৩০] কার্ল মার্কস মনে করেন, শ্রেণিচেতনা এমন একটি সচেতনতা যা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মূল চাবিকাঠি যা সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব তৈরি করবে, এটা হয়ে উঠবে মজুরি-উপার্জনকারী এবং সম্পত্তিহীন জনগোষ্ঠী কে শাসক শ্রেণিতে রূপান্তরিত করবে।[৩১] যদিও মার্কসবাদীরা শুধুমাত্র সর্বহারা শ্রেণির চেতনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, সমাজের উচ্চতর শ্রেণিগুলোও শ্রেণি-সচেতন উপায়ে চিন্তা ও কাজ করতে পারে। লিওনার্দো ফেইন যেমনটা উল্লেখ করেছেন, খুব ধনীরা তাদের শ্রেণিগত সুবিধা সম্পর্কে খুব সচেতন এবং তা রক্ষার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করে।[৩২] শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে সাথে আর্থ-সমাজিক বিভাজনকে সুস্পষ্ট করে তোলে। ফলে প্রতিটি শ্রেণি বিভাজিত কাঠামোতে তার অবস্থান সম্পর্কে আরো তীব্রভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। যদিও কার্ল মার্কস খুব কমই 'শ্রেণিচেতনা' (class consciousness) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি 'নিজের মধ্যে শ্রেণি'র (class in itself) পার্থক্য তৈরি করেছিলেন। একটি সাধারণ অভিযোগ এবং একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেওয়া সমাজের একটি স্তর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অন্যটি 'নিজের জন্য শ্রেণি' class for itself), যা সংজ্ঞায়িত করা হয় নিজের স্বার্থে সক্রিয় অনুসরণে সংগঠিত একটি ধাপ হিসেবে।[৩৩] মার্কসবাদীরা উৎপাদনের উপায়ের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণিগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করে। বিশেষত শ্রেণির সদস্যরা নিজস্ব পুঁজি থেকে উদ্ভূত কিনা সেটা বিবেচ্য হিসেবে ধরে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে সামাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে পৃথক করে, যেমন– আয়, জাতি, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা বা সামাজিক অবস্থান।[৩৪] সুতরাং মার্কসবাদী তত্ত্বানুসারে শ্রেণিচেতনা হলো অন্যের তুলনায় সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক শ্রেণিসম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষাপটে নিজে যে শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তার অর্থনৈতিক পদমর্যাদা বোঝা। উপরন্তু শ্রেণিচেতনা প্রদত্ত আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং সমষ্টিগত স্বার্থ বোঝার সাথে সম্পর্কিত। শ্রেণিচেতনা মার্কসের শ্রেণিসংঘাত তত্ত্বের একটি মূল দিক, যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর দৃষ্টিপাত করে। শ্রমিকরা কীভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে পারে এবং বৈষম্য ও শোষণের পরিবর্তে সাম্যের ভিত্তিতে একটি নতুন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের সাথে একত্রে অনুশাসনটি তৈরি করা হয়েছিল।

মার্কসের মতে, শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠার আগে তারা আসলে একটা মিথ্যা চেতনা নিয়ে বাস করছিল। মিথ্যা চেতনা শ্রেণিচেতনার বিপরীত। এটি একীভূত অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম এবং

স্বার্থযুক্ত একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে নয়, বরং নিজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় জড়িত একক সত্তা হিসাবে নিজের একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। মার্কস এবং অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, মিথ্যা চেতনা বিপজ্জনক ছিল। কারণ এটি মানুষকে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের বিপরীতে চিন্তাভাবনা এবং কাজ করতে উৎসাহিত করেছিল। মার্কস মিথ্যা চেতনাকে একটি শক্তিশালী সংখ্যালঘু অভিজাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি অসম সমাজ ব্যবস্থার পণ্য হিসাবে দেখেছিলেন। শ্রমিকদের মধ্যে মিথ্যা চেতনা, যা তাদের সমষ্টিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতা দেখতে বাধা দেয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈষয়িক সম্পর্ক এবং অবস্থার দ্বারা। যারা সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মতাদর্শ (প্রভাবশালী বিশ্বদৃষ্টি এবং মূল্যবোধ) দ্বারা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তারা কীভাবে সমাজে কাজ করে তার দ্বারা তৈরি হয়েছিল।

মার্কসের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, ইতালীয় পণ্ডিত, লেখক এবং কর্মী এ্যান্থনিও গ্রামসি মিথ্যা চেতনার আদর্শিক উপাদানটি প্রসারিত করেছিলেন এই যুক্তি দিয়ে যে, সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতা ধারণকারীদের দ্বারা পরিচালিত সাংস্কৃতিক আধিপত্যের একটি প্রতিক্রিয়া চিন্তাভাবনার একটি 'সাধারণ জ্ঞান' হিসেবে তৈরি হয়। যা স্থিতাবস্থাকে বৈধতা প্রদান করে। গ্রামসি উল্লেখ করেন যে, নিজের সময়ের সাধারণ জ্ঞানে বিশ্বাস করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শোষণ এবং আধিপত্যের শর্তগুলির সাথে সম্মতি জানায়, যা সে অনুভব করে। এই 'সাধারণ জ্ঞান'– যে মতাদর্শটি মিথ্যা চেতনা তৈরি করে-তা প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন সামাজিক সম্পর্কগুলির একটি ভুল উপস্থাপনা এবং ভুল বোঝাবুঝি।[৩৫] মার্কসবাদীরা বারবার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, শ্রেণিচেতনার উত্থান ইচ্ছাকৃতভাবে বুর্জোয়াদের শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দেওয়ার ক্ষমতা দ্বারা ব্যর্থ হয়। যার ফলে তাদের শোষণ সম্পর্কে একটি ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান রোধ করা যায়। মিথ্যা চেতনা, তাই, শাসক শ্রেণির দ্বারা ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। গিওর্গি লুকাচের মতো তাত্ত্বিকরা দাবি করেন যে, মিথ্যা চেতনা সর্বহারা শ্রেণিকে বিপ্লবী পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে সমাজের মধ্যে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধা দেয়।[৩৬] অন্যদিকে, মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ রাল্ফ মিলিব্যান্ড (১৯৭৩) যুক্তি দেন যে, মিডিয়া 'জনগণের নতুন আফিম' হিসেবে জনগণকে বশীভূত রাখার জন্য হ্যালুসিনেটরি ড্রাগ-এর কাজ করে।[৩৭]

বিদ্রোহী-চেতনার আরেকটি প্রাসঙ্গিক শব্দ হল দ্বৈতচেতনা, যেখানে একজন ব্যক্তি একই সময়ে বিশ্বাসের দুটি পরস্পরবিরোধী আনুষঙ্গিক অংশসমূহ ধারণ করে বলে ধারণা করা হয়। ইতালীয় মার্কসবাদী এ্যান্থনিও গ্রামসি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসের একটি অনুষঙ্গ ভাগ করে নিতে পারে যা হতে পারে কর্মক্ষেত্র থেকে অর্জিত মূল্যবোধের বিপরীত। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে, সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান সম্ভাব্য বিপ্লবী ছিল, তবে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে উত্থাপিত সেই চেতনা প্রশমিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে গ্রামসি অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ নিয়ে মার্কসবাদী ক্রিয়াকলাপ এবং পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিপ্লবকে পূর্বনির্ধারিত পরিণতিতে পরিণত করেছিল। গ্রামসি আরও দাবি করেছিলেন যে রাষ্ট্র কেবল তখনই আধিপত্যবাদী থাকতে পারে যখন তারা শোষণের শিকার ব্যক্তিদের দাবির সাথে আপস করতে প্রস্তুত থাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন শাসক শ্রেণির মধ্যে বিভক্তি এবং দ্বৈতচেতনার অস্তিত্বের কারণে শাসক শ্রেণির আধিপত্য কখনই সম্পূর্ণ হবে না। যেমন, রাষ্ট্রকে সর্বদা জনসাধারণের জন্য শ্রেণির জন্য কিছু ছাড় দিতে হয়,

যেমন- সম্পত্তিহীনদের ভোটাধিকার প্রদান। গ্রামসি এভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের পর্যবেক্ষণের পুনর্বিবেচনার প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি শ্রেণিচেতনার উপলব্ধির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

চেতনার দ্বৈততায় রণজিৎ গুহের ভারতীয় কৃষক বিদ্রোহ

এ পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় 'বিদ্রোহী শ্রেণিচেতনা' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কৃষক বিদ্রোহ ও আন্দোলনের গতিবিধি পর্যালোচনা করলে সাঁওতাল বিদ্রোহসহ অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহকে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে করেছে অনন্য। ভারতের এ কৃষক বিদ্রোহগুলির আলোচনা করতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এ্যান্তনিও গ্রামসির 'Subaltern' কথাটি বারবার ব্যবহার করেছেন। এ কৃষক বিদ্রোহগুলি ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের এক বিশেষ ধারা, ভারতের নিম্নবর্গের ইতিহাসবেত্তাগণ একে 'কৃষক জাতীয়তাবাদে'র ধারা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে, এ ধারাটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার (আপনমুখিতা যার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য) কি ব্যাপকতায়, কি গভীরতায়– সবদিক থেকে উন্নততর। এ বিদ্রোহগুলিকে তারা কখনও 'রাজনৈতিক সচেতন' কখনও 'র‍্যাডিকাল' বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কারণ এ আন্দোলনগুলি স্বতঃস্ফুর্ততার স্তরে ছিল, যা গ্রামসি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে বলে মনে করতেন।[৩৮]

রণজিৎ গুহর 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency' প্রকাশের দুই দশক পরেও ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণা হিসেবে এখনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। কৃষক বিদ্রোহকে কীভাবে উপস্থাপন করা উচিত? এ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি ঔপনিবেশিক ইতিহাস রচনার ধারার মধ্যে আটকা পড়েছিল বলে গুহ মনে করেন। এ ধারায় কৃষক বিদ্রোহ ছিল জনসাধারণের শান্তির বিপরীতে সহিংস বা প্রকৃতপক্ষে নিছক 'আইন-শৃঙ্খলা' সমস্যা অথবা জাতীয়তাবাদী বা সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের অল্প আলোয় বিকশিত সত্তার প্রকাশ হিসাবে ইতিহাস দেখার প্রবণতা ছিল।

গুহ আমাদের কৃষক বিদ্রোহের প্রাথমিক দিকগুলিতে কৃষক-ভিন্নমতের একটি ব্যাকরণ দিয়েছেন। কীভাবে এই ভিন্নমত কার্যকর করা হয়েছিল, কী মাত্রার সাফল্য এবং কী পরিণতি হয়েছিল? এটি কতদূর প্রসারিত হয়েছিল এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল? কৃষক-ভিন্নমতের ট্রপোলজি গুহের বর্ণনায় ধরা পড়েছে শব্দের ষড়ভুজ দিয়ে– নেতিবাচকতা; অস্পষ্টতা; পদ্ধতি; সংহতি; ট্রান্সমিশন; এবং আঞ্চলিকতা। প্রতিটি ধারণার বিপরীতে ধারণার অন্য অনুষঙ্গ দ্বারা অনুভূত হয়। যেমন- সংগ্রামের কার্যপদ্ধতি সর্বোত্তমভাবে ধরা পড়েছে চারটি প্রভাবশালী রূপ পরিগ্রহ করার মধ্য দিয়ে- পোড়ানো, লুটপাট, খাওয়া এবং ধ্বংস করা।[৩৯]

ইউরোপীয় ইতিহাস, সেমিওটিক্স ভাবনা, সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের কাজ, মার্কসবাদী ও নব্য-মার্কসবাদী পাণ্ডিত্য, উত্তর-কাঠামোবাদ, সমাজভাষাতত্ত্ব এবং অবশ্যই ঔপনিবেশিক ভারতের মহাফেজখানার উপর ভিত্তি করে এই অসাধারণ বিস্তৃত রচনায় গুহ ১৭৮৩ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারতে সংঘটিত কয়েক ডজন কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে বিধৃত করেছেন। গুহ বলেন, ১৭৮৩ সালের আগে ঐতিহাসিককে ইতিহাস উপাদানের অভাবের মুখোমুখি হতে হয়; অন্যদিকে, বিখ্যাত বিরসা মুন্ডার মৃত্যুর সাক্ষী গুহ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন কারণ এটি তাকে 'জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের রাজনীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করার আগে তুলনামূলকভাবে 'বিশুদ্ধ' অবস্থায় বিদ্রোহী চেতনার প্রাথমিক দিকগুলি অধ্যয়নের সুযোগ করে

দিয়েছিল।'[৪০] গুহের অধ্যয়ন যতই জটিল হোক না কেন, বিশ্লেষণাত্মকভাবে ঘন, অন্তদৃষ্টিপূর্ণ, এমনকি পাণ্ডিত্যের কাজ হিসাবে চিত্তাকর্ষক এবং অনুকরণীয়। মার্জিত সমাজতাত্ত্বিক সূত্রের প্রতি গুহের অনুরাগ এবং পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন, উভয়ই প্রায়শই তাকে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা, অদ্ভুত সূত্র এবং ঝাঁকুনি দেওয়ার দাবির দিকে নিয়ে যায়। তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামো ইউরোপীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্য এবং লেখনী থেকে উদ্ভূত; ভারতবর্ষ তার প্রায়োগিক ক্ষেত্র। সুতরাং এটা বলা যায় যে, ইতিহাসের কাঁচামালের ভাণ্ডার দক্ষতার সাথে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গুহ তাঁর ইউরোপীয় মন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এনলাইটেনমেন্টের ছাপ রেখে গিয়েছেন এতদঞ্চলের কৃষক বা নিম্নবর্গের সংগ্রামের আলোচনায়।

এ্যান্তনিও গ্রামসির কাজের উপর ভিত্তি করে, বিশেষত 'দ্বৈত চেতনা' বা একটি পরস্পরবিরোধী চেতনা সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে কেন্দ্র করে গুহ তাঁর ন্যারেটিভ তৈরিতে এগিয়েছিলে। অর্থাৎ একটি নৃ-গোষ্ঠীর বিশ্ব সম্পর্কে নিজস্ব (পর্যাপ্ত নাও হতে পারে) ধারণা থাকতে পারে। তবুও সে এমন একটি ধারণা গ্রহণ করে যা তার নিজস্ব নয় বরং অন্য গোষ্ঠী থেকে ধার করা। গুহ বিদ্রোহকে 'এমন একটি নির্মাণভূমি (site) হিসাবে তত্ত্ব দিয়েছেন যেখানে এ দুটির মধ্যে পরস্পরবিরোধী প্রবণতা এখনও অসম্পূর্ণ, প্রায় ভ্রূণীয়। তাত্ত্বিক চেতনা– শাসক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রক্ষণশীল প্রবণতা এবং সমালোচনাহীনভাবে শোষিত উপাদান এবং বিদ্রোহীর অস্তিত্বের লড়াইয়ের ব্যবহারিক রূপান্তরের দিকে পরিচালিত একটি র‍্যাডিকাল প্রবণতা– যা শক্তির একটি সিদ্ধান্তমূলক পরীক্ষার জন্য মিলিত হয়েছিল।'[৪১] গুহ মনে করেন এ বিদ্রোহী চেতনা, 'মুক্ত চেতনা নয়' এবং প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী প্রায়শই তাদের প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হন যাদের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ মুহূর্তে তার সহিংসতা পরিচালনা করেছিলেন।[৪২] তাই 'বিদ্রোহী-কৃষক' (peasant-rebel) আবার 'চাকর/ভৃত্য-কৃষক' (peasant-servant) এ ফিরে যেতে পারে– গুহ যাকে দ্বৈত স্থানচ্যুতি, বা 'বাস্তুচ্যুত' (displacement displaced) বলে অভিহিত করেছেন।[৪৩]

এক্ষণে, কোন ধরনের বিদ্রোহী চেতনা 'বিশুদ্ধ', এমনকি 'তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ', এবং এখানে খাঁটি, যা আসল বাস্তবতার জন্য বিশুদ্ধ নয়? বুর্জোয়া বা এলিট জাতীয়তাবাদ হিসেবে গুহ নিজে যে প্রভেদগুলো মঞ্জুর হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তা খুব কমই তদন্তযোগ্য– যা গুহ দ্বারা অভিব্যক্তির একটি অপ্রমাণিক রূপ হিসাবে কল্পনা করা হয়। অন্যদিকে, কৃষকের চেতনাকে এক বিশেষ ধরনের নিষ্পাপতা চিহ্নিত করে যা একটি নতুন ইতিহাস তৈরি করে। গ্রন্থ এবং বৌদ্ধিক ঐতিহ্যগুলি বেশ উজ্জ্বলতার সাথে ব্যবহার করা হয়; যেখানে গুহের পাণ্ডিত্যের ছাপ সর্বত্র এবং সেখানে গুহ তার শিক্ষাকে আত্মসচেতনভাবে বহন করেছেন অনিবার্য অনুভূতিগুলোকে ভারী তাত্ত্বিককাঠামো বেড়াজালে অত্যধিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তাই গুহের 'বাস্তুচ্যুত' মুখরোচকই মনে হয়।

সেমিওটিক্স এবং স্ট্রাকচারালিজমের প্রতি গুহর প্রবণতা এটা বলে দেয় যে, তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্য অনুসারে, জ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট ক্রমসহ শ্রেণিবিন্যাসে ক্ষীণভাবে আচ্ছন্ন। অপরাধ ও বিদ্রোহের মধ্যে তাঁর পার্থক্য নির্দেশের ধরন এক্ষেত্রে উদাহরণযোগ্য।[৪৪] বিদ্রোহী সহিংসতা 'মূলত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে' নিজেকে প্রকাশ করে যা প্রায়শই বিশ্বকে বদলে দেয়। অপরাধের লক্ষ্য ছিল ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অভিনয়ের নায়কদের কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করা। গুহ যুক্তি দেন যে, দৃঢ়তার সাথে বিদ্রোহকে অপরাধের বৃহত্তর কাঠামোতে একীভূত করা ঔপনিবেশিকতার কাঠামো অংশ ছিল। শুধুমাত্র বিদ্রোহকে তার রাজনৈতিক প্রধান্য ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যই এটি করা হয়নি,

বরং এটি ছিল বিদ্রোহীদের সাধারণ অপরাধীতে পরিণত করা এবং ফলস্বরূপ তাদের যথাযথভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনের অধীনে স্থাপন করা। তারপরও গুহ যখন অপরাধ ও বিদ্রোহের মধ্যে পার্থক্যের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গণনা করতে শুরু করেন, তখন তিনিও হোঁচট খান বা থমকে যান। রাষ্ট্র তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল বিদ্রোহকে 'সাধারণ অপরাধের নাড়ি' থেকে বের করে। কিন্তু এটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যেখানে সহিংসতা প্রকাশ্য (public), সমষ্টিগত (collective), ধ্বংসাত্মক (destructive) এবং তা পদ্ধতিতে সামগ্রিক (total)।'[৪৫] অবশ্যই, আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রয়োগ করা সহিংসতাই মূল বৈশিষ্ট্য। এই সহিংসতার কী নাম দেয়া উচিৎ? নিশ্চয়ই তা বিদ্রোহ নয়? তাহলে রাষ্ট্রের অপরাধ নিয়ে আমরা কোন ভাষায় কথা বলব? এখানেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ন্যারেটিভ গুহ ব্যাখ্যা করতে খুব একটা সফল হননি বা একদিকে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো, অন্যদিকে বিদ্রোহ এ দু'য়ের দ্বান্দ্বিকতায় আটকে গিয়েছিলেন।

গুহ তার বিদ্রোহী কৃষক চেতনার আলোচনা করেছেন ঔপনিবেশিক ভারতে নেতিবাচকতার নীতিকে সামনে রেখে যেখানে কৃষক নিজেকে জানতে শিখেছে নিজের সামাজিক সত্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি দ্বারা নয় বরং তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কর্তৃক যদি সেটা অস্বীকার করা না হয়। গুহ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের অভিজাত ও নিম্নবর্গের স্তরগুলোতে আধিপত্য ও অধীনতার একটি সুশৃঙ্খল সুউচ্চ কাঠামোর নীতির ভিত্তিতে সমাজ আত্মস্থ হয়েছিল।[৪৬] এই নীতিগুলি শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক তৈরি করা হয়েছিল এবং তা নিম্নবর্গীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গুহের এ অনুমানটি সঠিক নয় বলে মনে করেন কার্লো গিনজবার্গ। জনপ্রিয় শ্রেণির উপর আরোপিত সংস্কৃতি এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।[৪৭] সংস্কৃতি উৎপাদন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে অধীনস্থ গোষ্ঠীগুলির ক্রমাগত সংস্কৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়া ঘটে, বেছে বেছে গ্রহণ করে এবং পুনরায় ব্যাখ্যা করে যে সংস্কৃতি তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এভাবেই তারা তাদের নিজস্ব স্তরবিন্যাস করে থাকে এবং বিশ্বকে ব্যাখ্যা করে। অগত্যা তা অভিজাতদের সংস্কৃতি এবং উপলব্ধির বিপরীত নাও হতে পারে। গুহ তাদের ঊর্ধ্বতনদের সংস্কৃতির উপর অধীনস্থ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে পূর্বাভাস দিয়েছেন তাকে কি আমরা সত্যিই নিম্নবর্গের স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যের কথা বলতে পারি?

অধিকন্তু, ভারতীয় সমাজ যেখানে অধীনতার বিভিন্ন স্তর এবং রূপ বিদ্যমান এটা কি যুক্তিযুক্ত হবে যে, সাবঅল্টার্নদের কেবল বিশেষ গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ঊর্ধ্বতনরা তাদের নিজেদেরকে সংজ্ঞায়িত করেছিল?[৪৮] একজন ভাড়াটিয়া চাষী নিজেকে খুঁজে পেতো অন্যদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে, জমিদার ও ভূমিহীন শ্রমিকরা এবং একজন ভূমিহীন শ্রমিক তার সামাজিকতার নিরিখে নিজেকে একজন উর্ধ্বতন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারত যেখানে তার সাথে বসবাস করা তার স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে প্রেম এবং উদ্বেগের সম্পর্ক মধ্যেও রয়েছে তার আধিপত্য। সুতরাং দ্বৈতসত্তার জোড়া হিসেবে নিম্নবর্গকে বুঝতে আভিজাত্যের উপর ভিত্তি করে গুহের নেতিবাচক ধারণাটি নিম্নবর্গের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতে আমাদের সাহায্য করে না।

গুহের উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে একচেটিয়াভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে বিদ্রোহের মুহূর্তগুলোর উপর। সেখানে তিনি বলছেন কেবল সরকারি উৎসই নয় বরং লোককাহিনিও অভিজাত হতে পারে।[৪৯] যদি লোককাহিনি অভিজাতই হয়, তবে তার জন্ম অবৈধ এবং দূষণ চূড়ান্ত। কিন্তু ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হচ্ছে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট উৎস নিয়েই ভিন্নভাবে কাজ করা। বিশেষ করে

সামাজিক ঐতিহাসিকদের সমালোচনামূলক বোধগম্যতা ও কাল্পনিক সত্তার সাহায্যে এ নোংরা উৎস ঘেঁটে নিজেদের তুলে ধরতে সাহায্য করে। উৎস বাছাইয়ের এগুলোই বৈশিষ্ট্য হতে পারে কিনা সেটা তর্কবহুল। কিন্তু উৎসকে তার উল্টো করে পড়া বা তার বিস্তৃত ভাষাগত অনুশীলন কাম্য নয়।[৫০] গুহ দাপ্তরিক দলিল দস্তাবেজগুলো তাঁর কাজের ক্ষেত্রে এভাবেই ব্যবহার করেছেন। অথচ লোককাহিনি বা ফোকলোর নিয়ে কাজ করতে হলে যে কোনো উপায়ে সূক্ষ্মাতীত যাচাই-বাছাই ও কাল্পনিক সত্তাকে কাজে লাগাতে হবেই। যেমন আফ্রো-আমেরিকান ক্রিতদাসদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে লেভিন ভীষণভাবে লোককাহিনির ব্যবহার করেছেন যদিও সেগুলো অভিজাতদের হাত ঘুরেই তার কাছে এসেছিল যা আমাদেরকে জনপ্রিয় সংস্কৃতি এবং চেতনা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এদিক থেকে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে নিষ্ক্রিয়তা প্রতীয়মান হয় গুহের রচনায়, কারণ তিনি লোকজ উপাদানকে উপেক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি সরকারি দলিল দস্তাবেজ ব্যবহারেও তার নজরদারি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সুতরাং গুহের উৎস বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে যে সমস্যাটি চিহ্নিত করা যায় তা হলো– অভিজাতদের বিপরীতে নিম্নবর্গ অথবা নিষ্ক্রিয়তার বিপরীতে প্রতিরোধ কিংবা দাপ্তরিক ভাষার (official discourse) বিপরীতে বিদ্রোহী চেতনায় দ্বৈতসত্তার উপস্থিতি।

তাছাড়া আধিপত্যবাদ এবং অধীনতার লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ক খুব একটা গুরুত্ব পায়নি গুহের আলোচনায়। সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতে শ্রমিকদেরকে বিদ্রোহে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে গুহের মন্তব্য ছিল পুরুষরা শত্রু সম্পত্তি ধ্বংস করেছিল, আর নারী অংশ নিয়েছিল লুটপাটে।[৫১] লিঙ্গভিত্তিক শ্রমের এ বিভাজনের ধারাবাহিকতায় নারীর অধীনতাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে যা বিদ্রোহকে তীব্রতর না হওয়ার পেছনে একটি কার্যকর কারণ হিসেবে প্রকাশ করেছে। একইভাবে 'ছোটরাই দেশমাঞ্জি রিক কথায়' প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় বলা হচ্ছে অল্পবয়সী সাঁওতালি মেয়েরা হুল অনুষ্ঠানে ডাইনি হিসেবে উপস্থাপিত হতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাছাড়া আদিবাসী মহিলাদের কাছে সিধু এবং কানুর অবাধ বিচরণের কথাও এতে তুলে ধরা হয়।[৫২] এগুলো কৃষক বিশ্বে পুরুষ আধিপত্যের উদাহরণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু গুহর মতো সংবেদনশীল একজন ইতিহাসবেত্তা এ শ্রমবিভাজন এবং যৌন নিপীড়নের প্রক্রিয়াগুলোকে এড়িয়ে গেছেন এবং নারীর যৌন শোষণকে প্রাকৃতিক নিয়মের অংশ হিসেবে দেখে চুপ থেকেছেন। এ নীরবতা একটি রাজনৈতিক ভুল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন দ্যুবে।[৫৩]

এ পর্যায়ে রাজনৈতিকভাবে বিদ্রোহকে সংজ্ঞায়িত করে রাষ্ট্র কাঠামোর বিনির্মাণে জেফরি এম. পেজের হুল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি কৃষি/কৃষক বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করেছেন শিল্প গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যার 'আপস তত্ত্বে'র[৫৪] (Class Compromise Theory) অনুগামী হয়ে। পেজ অধিকতর বিদ্রোহপ্রবণ অঞ্চলের অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন সেখানে শ্রেণি সম্পর্ক প্রায় শুন্যের কোটায়, যেমন- বর্গাচাষ, যেখানে জমির মালিকদের সাথে কৃষকের আপস প্রায় অসম্ভব। এখানে শ্রমকে আয়ত্তে রাখতে সামান্য বা কোনো লভ্যাংশ বৃদ্ধি না করেই সম্পত্তির মালিকানার বৈধতার উপর ভিত্তি করে সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে। ফলাফল স্বরূপ শোষক শ্রেণির সাথে দমনমূলক রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে প্রায় সম্পর্কহীন শ্রেণির সাথে ভূমির মালিকানা বা দখল নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।[৫৫] এ পর্যায়ে কৃষি শ্রমিকরা ভূসম্পত্তির মালিকানা দাবি না করে শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধির জন্য সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু এ সংগ্রাম আপসের মধ্য দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামকে সফল করার কোনো ইঙ্গিত তৈরি করে না। এখানে গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কলেবর বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শিল্প শ্রমিক এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতো আপস সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা থাকে

না। কারণ, কৃষক বা কৃষি শ্রমিকদের আপসকামী বা আপসহীনভাবে জোটবদ্ধ করা খুবই কঠিন। তাই এক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, শহুরে বিপ্লবী বা বামপন্থী রাষ্ট্র কৃষক বিদ্রোহের সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।[৫৬] এর পরিণতিতে বিদ্রোহগুলো বিপ্লবে পরিণত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, বেশিরভাগ সময়ই শহুরে মানসিকতার সাথে গ্রামীণ মানসিকতার দূরত্ব এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করণের ব্যর্থতা কৃষক বিপ্লবীদের নিস্তেজ করে দেয় বা দীর্ঘ সংগ্রামের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাছাড়া বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সম্পর্কও অনেক সময় কৃষকদের মর্মাহত করে এবং নগরের সাথে সম্পর্ককেও ব্যাহত করে।[৫৭] এর ফলে ভীষণভাবে নিষ্পেষিত কৃষক এবং ভূমিহীন গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায় বিদ্রোহকে বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে। পেজ এবং টিম্বারলেক-এর এই ব্যাখ্যার অস্তিত্ব বা সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় হুল বিদ্রোহের আপসহীন জনমানুষের কলকাতা বা চা-বাগানগুলোতে অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে। যে চেতনা বা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদ্রোহের উন্মেষ হয়েছিল তা সরকারের দমননীতি ও সমন্বয়হীনতার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এবং শ্রেণিসম্পর্কের টানাপোড়েন বা গড়ে না ওঠার ফলে পরবর্তী বিদ্রোহের পথ আর কখনও মাড়ায়নি। এখানে 'শ্রেণিআপস তত্ত্বে'র 'negative class compromise'-এর ভিত্তিতে বলা চলে কেন বিদ্রোহ পরবর্তীকালে বিপ্লবের পথ খুঁজে পায়নি বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষক আন্দোলন কখনই রাষ্ট্র কাঠামোতে তাঁদের জন্য কল্যাণমূলক হয়নি।

উপসংহার

সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এ বিদ্রোহের একটি নিজস্ব ধরন ছিল। এ বিদ্রোহটিতে ঔপনিবেশিকতা, সামন্ততন্ত্র এবং বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিরোধী আন্দোলনের বলিষ্ঠ উপাদান রয়েছে। এতে বীরত্বব্যঞ্জক গণজাগরণের এক ছবি প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের জন্য বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সাম্য ও সৌহার্দ্যের স্বপ্নরাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদিও এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন। এ বিদ্রোহে চেতনার মান ছিল প্রাথমিক স্তরে। কেননা, কখনও ধর্মীয় আবেদন, কখনও অলৌকিক চিন্তা, কখনও পূর্বতন কল্পরাজ্য ফিরে পাবার স্বপ্ন বিদ্রোহীদের একত্রিত করেছিল। তাই স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা দখল করলেও জাতীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখল করার কথা ভাবতেও পারেনি সাঁওতাল বিদ্রোহীরা। তাছাড়া বিদ্রোহের নেতৃত্বও গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হতে। মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ এরিক হসবমের বলশেভিক বিপ্লবের পেছনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন এবং তাদের ভূমিকাকে জনপ্রিয় বিরোধীদলের ভূমিকার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি তাদেরকে মধ্যবিত্ত থেকে উদ্ভূত, উন্নত পরিব্রাজক এবং বিস্তর পড়াশোনা ও বিশদ লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত থাকাকে বিপ্লবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিপ্লবকে বলা চলে কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর ফিউশন।[৫৮] কিন্তু আমাদের কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এমন বুদ্ধিজীবীর সংকটই হয়তো শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথ দেখায়নি। তাই ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে কৃষককে দমন করা সহজ হয়েছিল। তারপরও এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, সিধু-কানুরা অন্যায়-অসাম্যের বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার হয়েছিল এবং ঢাল-তলোয়ার ছাড়াই সামান্য তীর-ধনুকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের আধুনিক অস্ত্রসম্ভারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেছিল এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তা পৃথিবীর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর টিকে থাকার সংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য উজ্জ্বল আপন মহিমা ও গৌরবে। কিন্তু আফসোস স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রেও তাদের স্বতন্ত্র ভূমির দাবি আজও পুরণ হয়নি, এখনও বুর্জোয়াদের বুভুক্ষু চাহনিতে ভূমিহারা হচ্ছে ভূমিপুত্ররা।

তথ্যনির্দেশ

১ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা, ১৯৬৬।

২ *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-১৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১।

৩ W W Hunter, *A statistical Account of Bengal*, Vol.14 , London 1877.

৪ "A-11 Individual Scheduled Tribe Primary Census Abstract Data and its Appendix", www.censusindia.gov.in. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Retrieved 20.05.2018.

৫ Francesco Cavallaro and Tania Rahman, "The Santals of Bangladesh", *The Linguistics Journal*, September 2009.

৬ W W Hunter, *Annals of Rural Bengal*, (New York : Leypoldt and Holt, 1868), p. 82.

৭ Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-56*, (University of Calcutta, 1940), pp.4-5

৮ *Ibid*, pp. 5-6

৯ *Calcutta Review*, 1856, p. 236.

১০ *Ibid*, p. 240

১১ W W Hunter, *Ibid*, p. 230

১২ সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা. ৩১৭

১৩ W W Hunter, *Ibid*, pp. 309-10

১৪ *Calcutta Review*, 1856, p. 238.

১৫ Kalikinkar Datta, *Op.cit*, p. 14

১৬ *Ibid*, p. 15

১৭ *Calcutta Review*, 1855, p. 237.

১৮ Kalikinkar Datta, *Op.cit*, p. 16.

১৯ W W Hunter, *Annals*, p. 313.

২০ *Calcutta Review*, 1855

২১ Kalikinkar Datta, *Op.cit*, p. 67.

২২ *Ibid*, p. 316

২৩ Eadward Green Balfour, *The cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia*, Vol. III, (London,1885), p. 527.

২৪ Kalikinkar Datta, *Op.cit*, p. 66.

২৫ Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, Vol. I, (Progress Publishers, Moscow, 1887), p.218.

২৬ Marx and Angles, *Manifestoof the Communist* Party, 1848, p.120.

২৭ Marx and Angles, *Marx/Engels Selected Works*, Vol. One, (Progress Publishers, Moscow, 1969), p.117.

২৮ Marx, *A Contribution to the Critique of Political* Economy, (1859), p.504.

২৯ Marx, *Ibid*, p.398-99.

৩০ Elizabeth Borland, ‘Class consciousness’, Parrillo, Vincent N. (ed.), *Encyclopedia of Social Problems*, Volume 1. (SAGE Publications, 2008), p. 134.

৩১ Laura Desfor Edles; Scott Appelrouth, *Sociological Theory in the Classical Era*, (SAGE Publications, 2020), p.48.

৩২ Michael Parenti, ‘Class Consciousness and Individualized Consciousness’, *Power and the Powerless*. (St. Martin's Press, 1978). pp. 94–113.

৩৩ Andrew Milner, ‘Class and Class Consciousness in Marxist Theory, *International Critical Thought*, Vol. 9, Issue. 2, (Taylor and Francis, 2019), p.163.

৩৪ Jon Elster (1986). ‘Class Consciousness and Class Struggle’, *An Introduction to Karl Marx*, (Cambridge University Press. pp. 122–140.

৩৫ David Cadeddu (ed.), *A Companion to Antonio Gramsci: Essayson Historyand Theories of History, Politics and Historiography*, (Brill, Leiden, 2020), Pp. 5-10.

৩৬ George Lukacs, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, (The MIT Press, 1972), p. 68.

৩৭ Ralph Miliband, *Marxism and Politics*, (Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 69.

৩৮ নরহরি কবিরাজ, ‘গ্রামশির চিন্তা ও ভারতে তার প্রাসঙ্গিকতা’, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *গ্রামশিচর্চা*, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠ-৬৬

৩৯ Ranjit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Introduction, (Oxford University Press, Delhi, 1983), p.136.

৪০ *Ibid*, p.13.

৪১ *Ibid*, P. 11.

৪২ *Ibid*, p.164.

৪৩ *Ibid*, p.218.

৪৪ *Ibid*, p.145.

৪৫ *Ibid*, p.109.

৪৬ *Ibid*, p. 18.

৪৭ Carlo Ginzburg, *The Cheese and the Worms: the Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*, (New York, 1982), p.xv.

৪৮ Tanika Sarkar, ‘Jitu Santal's Movement in Malda 1924-1932: A Study in Tribal Pro test’, Guha (ed.), *Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society*, Vol. IV.

৪৯ Ranajit Guha, *Ibid*, p. 15.

৫০ বিস্তারিত দেখুন, ‘The Prose of Counter-Insurgency’, Guha (ed), *Subaltern Studies, II: Writings on South Asian Historv and Society* (Delhi, 1983).

৫১ Ranajit Guha, *Ibid*, p. 130.

৫২ W. J. Culshaw and W. G. Archler, ‘Records Concerning the Santal’, Ramesh Chandra Roy, W G Archler and Verrier Elwin (ed.), *Man in India*, Vol xxv, No 4, (December 1945), pp. 220-221.

৫৩ Saurabh Dube, ‘Peasant Insurgency and Peasant Consciousness’, *Economic and Political Weekly*, Vol. 20, No. 11 (March 16, 1985), p. 446.

৫৪ The concept of “class compromise” invokes three quite distinct images. In the first, class compromise is an illusion. Leaders of working-class organizations—especially unions and parties—strike opportunistic deals with the capitalist class that promise general benefits for workers but that, in the end, are largely empty. Class compromises are, at their core, one-sided capitulations rather than reciprocal bargains embodying mutual concessions.

In the second image, class compromises are like stalemates on a battlefield. Two armies of roughly similar strength are locked in battle. Each is sufficiently strong to impose severe costs on the other; neither is strong enough to definitively vanquish the opponent. In such a situation of stalemate, the contending forces may agree to a “compromise”: to refrain from mutual damage in exchange for concessions on both sides. The concessions are real, not phoney, even if they are asymmetrical. Still, they do not constitute a process of real cooperation between opposing class forces. This outcome can be referred to as a “negative class compromise.”

The third image sees class compromise as a form of mutual cooperation between opposing classes. This is not simply a situation of a balance of power in which the outcome of conflict falls somewhere between a complete victory or a complete defeat for either party. Rather, here there is a possibility of a non-zero-sum game between workers and capitalists, a game in which both parties can improve their position through various forms of active, mutual cooperation. This outcome can be called a “positive class compromise.” Eric Olin Wright, ‘Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise’, *American Journal of Sociology*, Volume 105 Number 4, (January 2000), pp. 957–958.

৫৫ Paige, Jeffery M., *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Developed World*, (Collier Macmillan Publishers, London 1975), p. 60.

৫৬ Paige, Jeffery M., *Ibid*, pp.43-44.

৫৭ Timberlake, Michael, *Urbanization in the World-Ec*onomy. (New York: Academic Press 1985).

৫৮ Alvin W. Gouldner, *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*, (The Macmillan Press Ltd, 1979), pp. 54-56.

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 02, July-December 2024
ISSN 2519-5816

A Comparative Study of Modernism and Postmodernism in Creative Yields

Md. Abdus Salam*

Abstract

This article aims to provide light on the criticality and assessment of artistic creations by contrasting two well-known ideologies of 20th-century modernism and postmodernism. Modernism transcends time for its futuristic, time-winning, and avant-grade worthy elements, while postmodernism is a complex term. Modernism and postmodernism hovers in the creative thinking world after the two World Wars and thus become the contentious debatable fields in research arena. Subjectivity, individuality, distorted reality, hesitation, frustration and alienation become the motive of expressions through creative yields like poetry, drama, novel, fiction, art, architecture, sculpture, music, painting and dance etc. This is a review article in which qualitative secondary data analysis method was applied. This study requires answering the research question i.e., in what ways do modernism and postmodernism diverge in their critical assessment of artistic creative output. This paper finds modernism as the avant-grade movement, while postmodernism as the new avant-grade movement. Postmodernism is not a reaction against modernism; rather it is deconstruction, reconstruction, and logical addition to modern tenets and ideals in creative yields.

Keywords : Creative-yields, grand-narrative, meta or mini-narrative, modernism, postmodernism.

* Associate Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka.

Introduction

In today's era of numerous literary theories, it has become increasingly challenging to comprehend and appreciate various human sciences like literature, art, architecture, and sculpture. Scholars, critics, and litterateurs have consistently rearranged the thinking world, serving as unofficial legislators for society, country, and civilizations. Modernism and postmodernism promote critical appreciation and evaluation of literary productions and art, reflecting the intellect of individuals, societies, countries, and civilizations. Modernism and postmodernism have become contentious and debateable arenas (Szostak, 2007). The shift towards diverse perspectives in literature and art has significantly influenced the writing, composition, and evaluation of human sciences' creative art. Postmodernism, as defined by Hutcheon (1987), refers to the movement that emerged after the modernist era. The article explores the contrasting perspectives and motivations of modernism and postmodernism in literature and creative arts, analyzing their impact and reactions. The term 'modern' refers to the current state of literature and creative arts, as defined by Frank in 1945. Postmodernism refers to the literature and art that emerged after the rise of modernism, as defined by Connor (2004). So, postmodernism is a continuation of modernism, not its downfall. Postmodernism promotes continuous evolution in understanding literature, writing, and art, while modernism encourages innovation in thinking, attitude, and production.

Modernism is a significant and widely accepted view within the field of human sciences, as highlighted by Rosenau in 1991. Modernism is a significant movement that significantly influences the thought process of human beings, critics, scholars, and researchers. The exhibition showcases a wide range of contemporary art, sculpture, music, painting, drama, poetry, and fiction. This prompts various inquiries about modernism, its focus, literature, art exhibitions, and sculpture ventures. Modern writers and modernism cannot be synonymous or applied to recent thought, as stated by Eysteinsson (2018). Examples of writers from the fifth, sixth, seventh, and current centuries can be included. This phenomenon is crucial in various human studies, including writing, painting, music, and architecture, across all ages and periods. According to Children (2016), all aspects of human sciences will be viewed as modernism, with specific tenets. Modernism is a broad concept that encompasses all aspects of society and should not be defined in a specific manner. Modernism, originating in the late 19th century, has continued to evolve throughout the 20th century, despite its seemingly unrelated origins. Modernism, a diversified phase that began with the Renaissance, is a significant advancement in the field of modern art and design. However, it is rather an idea. Modernism, a concept that emerged through various ideas and diversified propensity, has evolved over time. The modernity of a piece of literature and creative arts is determined by the ideas it contains and the characteristics it possesses.

Postmodernism, a complex and slippery ideology, is as challenging to describe as many other ideologies due to its complexity and slippery nature. But postmodernism has been employed so extensively and widely in today's environment that the researcher is unable to ignore it. Umberto Eco states postmodernism as the

unfortunate term as noted by La Manna in 1992. He claims that postmodernists understand the need to review the past, in contrast to modernists who seek to eliminate it. In other words, postmodernism conjures popularity while modernism evokes solidity. Even if postmodernism peaks in the 1960s and 1970s, its roots can be seen in the 1930s of the 20th century. It is implied that modernism is dead when one speaks of postmodernism. Bronner (2017) argues that critical theory and appreciation often have a noteworthy moment, which is untrue. Postmodernism is, therefore, a supplement and addition to modernism. In this context, the researcher can consider a few of the more accessible definitions of postmodernism. An eclectic approach, alienator writing, parody and pastiche are the characteristics of postmodernism, according to Cuddon's entry in his *A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory* (Cuddon, 2012). The idea of literature, art, music, sculpture, architecture, and philosophy from the 1940s and 1950s, which flourished under the cover of modernism's evolution and tendencies, is challenged by postmodernism. Thus, postmodernism may be understood as a divergence from modernism as much as a critique of it.

Literature review

To Antin (1972), postmodernism integrates modern traits, convictions, and styles. Modernism can no longer denote present if it is reduced to a narrow collection of "stylistic features" (Antin, 1972; p. 98). This indicates that modernism explores unique qualities that are not time-bound, and modernism is constantly on the lookout for its futuristic, time-winning, and avant-grade features. Antin provides examples of modern and contemporary furniture to help explain the concept. Modernism is, therefore, "forever open" (p. 99). The "exotic look" (p. 99) of modern furniture has vanished and been released from the "time capsule" (p. 99). The literary and artistic references from Schoenberg, Varese, Ruth St. Denis, Isadora or Martha Graham, Picasso, Malevitch, Moholy Nagy, Eliot, and Pound, among others, reinforce Antin's assertion of modernism's timelessness and open characteristics.

Smythe (2015) describes postmodernism as "the onset of an age of after modernism" (p. 365), citing Nicolas Bourriaud. Terry Smith refers to the "reflexivity and avant-grade experimentality" (p. 365) of modern art as postmodern art due to the globalisation of the genre. Smythe (2015) defines postmodern art as the "resurgence of formalist and self-expressive" (p. 356) attitude of modern art, citing other groups such as David Geers. Postmodern art is, thus, defined by these "neo-modern" (p. 365) perspectives as the "discrete traits and tendencies of modernism" (p. 365). Smythe defines modernism, however, as the "necessity of innovation becoming the primary fact of life, work, and thought" (p. 366), quoting Smith. Smythe also contends that postmodernism is a reinterpretation of modernity and modernism in light of all of these. Therefore, postmodernism is not modernism's downfall but rather modernism's added avant-garde. According to Smythe (2015), the late eighteenth-century scientific, economic, and social revolutions marked a decisive departure from the ancient cultural and social models, and it was out of this mentality that modernism and postmodernism were born.

Ali (2020) finds modern English poetry characterized by "technical innovation through the extensive use of free verse" (p. 1) and the move away from poetic self to ideal readers or audience. It reads, innovative and experimental writing style and thematic expression in English poetry is labelled as modern poetry. To Ali, such move started early with William Wordsworth's publication of *Lyrical Ballads* (1789) and extends in Romantic "British poetry, Greek literature, Chinese and Japanese poetry, Dante and the medieval Italian philosophical poetry" (p. 1) etc. She also finds Ezra Pound's advice "on the meaning of words" (p. 2) in poetry, Walt Whitman's free verse, Oscar Wilde's prose poetry as the modern poetry. However, Zhang (2010) finds certain postmodern characteristics in poetry like the length, eloquent correlative demonstrability, distrust of reality, anarchic irruption, frivolity and self-pleasure in Irish literary critic and poet Denis Donoghue's poem *On Eloquence*. It goes that apart from the stylistic feature like long length, postmodern poetry presents thematic phenomena like distrust of reality and frivolity in post-war creative expressions.

Shepherd (2005) finds "performance reconstruction and reception analysis" (p. 60) as the true modernist theatrical production, though he observes ignorance in Finland, Sweden, Denmark, and Norway's theatre performance with modernist characteristics. It means, if there is innovative, new and experimental reconstruction or avant-grade remaking in a drama that is modern. A theatre performance can also be called modern observing and critically analyzing audience's reception and reaction. Shepherd claims that modern drama mentions entirely on English, American, French, and German work which proves that drama as a whole neither is nor evaluated on its true modern perspectives. For this reason, Innes points out that modern drama starts "not from Ibsen, but from Dada" (cited in Shepherd, 2005; p. 59). So, Susan Stanford Friedman finds contradictions in current definition of modernism (cited in Shepherd, 2005; p. 59). However, Richardson (2001) finds that postmodern drama discovers "numerous wonderful specimens" (p. 69) like presentation of voice and narration in drama. It reads, while traditional drama tends to stage performance only, postmodern drama goes further avant-grade stage performance through voice and narration. Richardson also mentions Bakhtinian "polyphony or interior polemical speech" (cited in Richardson, 2001; p. 692) is also a tenet of postmodern drama which can traverse the literary boundary "between drama and film" (p. 692). It means that if modern drama offers new avant-grade, postmodern drama hovels extra newer avant-grade in theatre presentation, performance and narration as well.

McCracken and Jo (2015) claim that modern novel starts in between 1902-1939 James Joyce's 'Ithaca' episode in his lengthy novel *Ulysses* (1920). It seems that before 1902, novels were written in moderate length. This very James Joyce initiated experimenting lengthy novel with his writing. Thus, a stylistic experiment and innovation in novel started with James Joyce in 1920. McCracken and Jo mention Franco Moretti's "super-canonical form" (cited in McCracken and Jo, 2015; p. 270) in Henry James' *Wings of a Dove* (1902), Thomas Mann's *The Magic Mountain* (1924) and Virginia Woolf's *The Years* (1937) etc. It speaks that modern novel starts from 1902 in one hand and on the other the canonical stylistic features of novel calls modernist temperaments. They also argue that in 1920s, Proust, Richardson, and

Joyce's novels reject the conventional "nineteenth-century realist novel" (p. 270) as well as welcome narrative experiments, impressionism, point of view, alternative states of consciousness, dreams and undocumented banalities of human life. Hence, modernism not only innovates style rather it reshuffles thematic presentations in novels as the creative genre. On the contrary, Owen (1997) claims that detective novel's inversions in forms, content, and expectations embraces epistemological and ontological innovations in creative fiction. Thus, to Owen these are the tenets of postmodern novel. It raises the questions of differentiating modern and postmodern novels. Owen, here, mentions Michael Holquist and points out that detective geme experiments the possibilities, limitations, and the power of conscious perception and the search for knowledge which exemplify postmodern novel. It means, postmodern novels usher lights on the ever newer imaginative as well as surrealistic themes in creative fiction.

Scruton (2004) claims that modern philosophy starts with Descartes (1596 – 1650), who is largely credited with helping modern philosophy and science, come into being. To Scruton, Descartes' arguments radically change "the method of philosophy" (p. 12). It means, changes in method and outlook become the tenet of modern philosophy. He elaborates that science requires evidence, while literature in based on creative reality. But modern philosophy assumes the in-between roles of science and literature. Scruton's book titled *A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein* (2004) also suggests that modern philosophy ends with Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889 – 1951) who focused on logic, mathematics philosophy, philosophy of mind, and philosophy of language. It goes that modern philosophy starts with Descartes' in-between position of science and literature, and ends with Wittgenstein's philosophy of mind and language. On the opposite side of the coin, mentioning Dr. Earl Creps, the head of Springfield, Missouri's Assemblies of God Theological Seminary's doctor of ministry program, Farhan (2019) finds postmodern philosophy "plurality of worldviews [like] centrality of community, subjectivity of truth, complexity of human perception, fragility of progress, unreality of absolutes [and] enormity of the spiritual" (p. 2). It tells that postmodern philosophical perception of truth and reality is varied to person to person, where one phenomenon has multiple meanings and reality.

Volavkova (1971) finds Twentieth-century sculpture "as the reaction against the preceding century" (p. 317) in which clay model and plaster cast sculpture design gained popularity. But, in 20th century, sculptor combined design with realization. To Volavkova, Brancusi (1876 – 1957) — presents a new meaning for the sculptural concept of originality. It means, modern sculpture initiates realization and perception with the sculptural design, while traditional preceding sculptors value model and design only. However, Levin (2007) finds surrealism in Andre Masson, Matta and Picasso's art and architecture as the expression of postmodernism.

Reviewing the plethora of existing literature, the researcher finds research gap in the comparative study in modernism and postmodernism. Thus, this article intends to find the answer of the following research question:

1. How and which ways do modernism and postmodernism differ in critical appreciation and evaluation of creative production?

Methodology

This article utilized a qualitative data analysis approach, utilizing secondary and tertiary data from various sources such as articles, journals, books, magazines, and websites to address the research question.

Discussion

The author of this article explores ancient literature, including the epic poem Beowulf and Old English works like "The Wanderer", "The Seafarer", and "The Dream of the Rood" with modern ideals and characteristics. There is no inquisitiveness, most of these are easy, the surface of simple interpretation of modernism. This tendency meets a great shuffle in the age of Chaucer in 14th century. Chaucer is widely recognized as the leading figure in modern literature, according to Brown (2008). Even the English language which would use before Chaucer gets new entity and loses totally afterword. Thus, Chaucer can be treated as the harbinger of modern tendency.

Renaissance becomes the age of rebirth and reawakening, the most important thing as for as Modernism (Baker, 1987). Renaissance opens up the new outlook, new perspective, new paradigm to begin with this revolutionary appeal around human. So, Renaissance’s human centralism refuels modernism. Before Renaissance, everything would treat either nature or God or something else. But Renaissance establishes that everything should be treated in terms of human appeal (Nelson, 1973). The classical learning of the pre-Jesus period, the Greco-Roman period was centered with man, but for certain reasons it was veiled. With the flashlight of Renaissance it revives again. The Greco-Roman learning comes back and some literary scholars come to the current phase and the Greco-Roman tradition spread all over Europe in terms of literature, art, painting and sculpture. Thus, the self-centered individualistic idea concerning past, nature and God turns to human beings and their expressions in creative art, literature, painting, sculpture etc. Renaissance ushers a notion that visible human being is more precious than invisible God (Hofele and Stephan, 2011). So, this study assumes the Greco-Roman learning as the first thought of the first idea of modernism i.e., this study finds human being as the nucleus of modernist phenomena. Next-time, Restoration, Reformation, Classical, Neo-classical are not so important in terms of modernism (Chabard, 2021). During the time of renaissance the evolution of human thought meets a great shuffle that changes the total outlook of creative art, literature, painting, sculpture that paves modernism.

Literary invention like renaissance and revolution change the economic ideas and the idea of creative art as well. Enlightenment, Industrial Revolution, and French Revolution assemble together and give radical change to human thought. This very movement proceeds towards the closing of 19th century. So, narrowly, this study finds that Modernism begins from this very moment from which modernism inceptors almost all of human sciences.

Modernism breaks the tradition and the established view (Eysteinsson, 2018). It is a development, introduction of new idea. So, modernism supplies the introduction of some new ideas in one hand and on the other breaks the tradition. Again human being is the centred idea of modernism (Childs, 2016). Thus breaking away the accepted ideas and the introduction of fresh ideas rationalized in the terms of humanistic appeal are called Modernism. In literature, art, painting, music and architecture, this paper finds some established tradition, when this study discovers any break in these established tradition, the researcher finds it modern.

Avant-grade movement depicts modernism (Zhang, 2021). The critical arena heavily relies on the structure and form of creative art, literature, music, painting, and sculpture. But, modernism challenges traditional forms and promotes experimentation in various creative genres. If this study observes any experiment in a literary from, that will be modern. Arthur Miller's *Death of a Salesman*, 'King Lear', 'Hamlet', and 'King Oedipus', serve as tragic heroes and protagonists. They are the kings and commander-in-chief, i.e., man of position and rank in society. Arthur Miller proves in *Death of a Salesman* (1949), that if it is properly handled, any person can act as a tragic hero (Halassa and Rania, 2020). Here, the hero is not a societal figure like king or general, but a door-to-door salesman selling commodities. Thus, it is an experiment in the traditional established form of a tragic hero. Such experiment is modern. Again, this study finds similar experiment in the traditional concept of heroine in Leo Tolstoy’s *Anna Karenina*. Thus, the changes in attitude, the experiment in form assume and flourish modernism. This experiment may be in all sectors. Even the antithesis of the current approach to teaching and learning languages is modernism in language teaching and learning, due to the fact that it is a language learning and teaching experiment.

Literature does not have particular full stop (Bennett and Nicholas, 2023). It goes on and on in an eternal way. However, this study gets experiment in literature and creative yields. So, experiment is the basic idea of modernism. Spain (2000) states that women are often prohibited from going outside their dwellings at night due to various reasons within society. If someone exhibits a sense of progressiveness in this field, they will likely adopt a modern attitude. Thus, progressiveness in any sector is another basic idea of modernism.

A fresh perspective on modernism and postmodernism brings a significant shift to the field of contemporary thought (Cooper and Gibson, 2015). The term "postmodernism" was coined by certain French critics in the 1930s. It is considerably later in history, to be sure. This article ought to bring forth one historical instance from 1980. Habermas' 2016 article "Modernity - An Incomplete Project" introduces postmodernism, which focuses on the incomplete nature of modernity. Habermas claims that the modern era began during the Enlightenment Ideals, which spanned from the mid-17th to mid-18th century. During the Enlightenment, a renewed belief in the power of reason to improve human society emerged (Kent, 2002). Kant, Voltaire, and Diderot, along with Locke and Hume, are all philosophers who share similar ideas in Germany, France, and Britain. The era in Britain is known as "The Age of Reason" (Tonelli, 1971). The Enlightenment, also known as the Age of

Reason, aimed to solve society's problems through disinterested individuals applying reason and logic, breaking from tradition and religious adherence. The French Revolution serves as the initial test for this theory. To Habermas, it is modern (Habermas and Seyla, 1981). In the 18th century, reason and logic reached their peak, influencing science, technology, art, culture, architecture, literature, and music, ultimately dispelling superstitions. People believe that humanity will be prioritized and that all individuals will lead fulfilling lives. Humanity and solidarity thrived in the early 20th century, but World Wars destroyed these ideals and led to six million deaths. Habermas questions modernism and Enlightenment values, advancing postmodernism's central thesis. He concludes modernism as a myth and the Enlightenment fails to meet expectations. Modernists, according to him, are "young conservatives" (Richters, 1988). Postmodernism is an academic response to the characteristics of modernism and Enlightenment, presenting a sharp critique of these values.

Lyotard's 1984 book, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, is credited with defining postmodernism, as exemplified in his essay "Answering the Question: What is Post-modernism?" he critiques modernism's fallacy and enlightenment's goals, arguing that while people may feel happy during these times, their core ideals are corrupt, and understanding these flaws can lead to happiness. People often accept fallacy due to a deep hole in their hearts, but they eventually realize these ideals are untrue and fail to fulfil their commitments. Lyotard has criticized Habermas as he has not entirely abandoned the modernist ideal. Regarding Habermas, Lyotard believes to get rid of the incomplete project of modernism, that of the Enlightenment, under the banner of post-modernism (Goodfield, 2020). To Lyotard, the Postmodern would be that which in the modern invokes the unpresentable in presentation itself; that which refuses the consolation of correct forms; that which refuses the consensus of taste permitting a common experience of nostalgia for the impossible (Jenkins, 2013). The text suggests that this is the postmodernist approach to stating that something is unpresentable in presentation. Lyotard critiques modern-day traditions, including the "Grand" story and Meta (master) story, as he refers to them. Lyotard argues that a comprehensive portrayal of a society is impossible, unlike the ethnographies of the early 1900s (Rynkiewich, 2012). Lyotard's well-known definition of postmodernism refers to 'meta-narratives'. He, therefore, defines postmodernism as "mini- or meta-narratives" and modernism as "Grand Narratives" (Fitriah, 2010). Lyotard's postmodern meta-narratives provide a comprehensive understanding of the reasons behind specific behaviours or beliefs within a specific environment. They provide a framework for managing various 'mini- or meta' narratives. Lyotard, thus, argues that postmodernism and modernism are not diametrically opposed. Postmodernism undermines modernity since it is a response to modern ideals and the Enlightenment.

Baudrillard studies Marxist criticism of capitalism that focuses on postmodernism too. Helen Rosenau identifies Baudrillard as a cynical postmodernist, stating that everything has already happened and no new can occur (Weiss and Karla, 2002). Baudrillard's analysis of modernity and postmodernity remodels the world in a new system. Habib (2018) defines postmodernity as the era of mass media, including

photography and film. Baudrillard defines early modernity as the period between the Renaissance and the Industrial Revolution, and modernity as the beginning of the Industrial Revolution. To him, our environment is made up of images, yet these images are merely simulations (Wolny, 2017). In today's era, truth is a product of consensus values, and 'science' is just a term people use to describe certain explanation modes. Baudrillard (1988) argues that postmodern is a concept that many people seem to struggle to comprehend.

Derrida is a skeptic postmodernist and a poststructuralist. Deconstructing texts and examining the connections between their meanings are major topics of Derrida’s writing (Silverman, 2004). Derrida directly addresses the reason concept found in Western philosophy. To him, ‘a metaphysics of presence’ rules reason. Foucault argues that historical developments have significantly influenced the unchanging principles of human nature and society, as per O'Farrell (2013). Foucault's postmodernism focuses on the analysis of power and its fluctuating patterns as a key pillar. Foucault, a postmodern theorist, challenges the conventional notion of history as a sequence of unavoidable truths.

Lyotard views postmodernism as a lack of consensus in taste (Burdman, 2020). Postmodernist aesthetic practices multiplicity in forms, outlooks, agendas etc. It deploys a fractured, systematically deranged language aimed at destabilising the systems (Murdoch, 2005). Postmodern literature challenges traditional narrative conventions in American and British writers of 1960s and 1970s through their 'meta-fictions'. Fragmentation, inter-textuality, discontinuity like ‘hypertext’, characterise postmodern literature. Postmodern literature and art are characterized by the blurring lines between 'high' and 'elite', 'serious art' and 'low', popular art. Hybrid genres blur the lines between literature and journalism, literature and autobiography, literature and history. Postmodern literature's most notable expression emerged during the 1970s with the rise and spread of feminist, multiethnic, multicultural, and postcolonial literature. The term 'avant-grade' originates from French and refers to a progressive program or advance guard. Postmodernism, originally seen as a solution to modernism, encourages forward thinking and rejects outdated ideas, making it the new avant-garde. T. S. Eliot's *The Waste Land* is a collection of incomplete, aleatory stories that incorporate chance and randomness. This work employs a postmodern technique similar to 1917 Dadaists, who created poems from random newspaper sentences (Beals, 2013). The Dada movement, originating post-World War I, consisted of artists who embraced absurdity, irrationality, and anti-bourgeois protest, rejecting the logic and aesthetics of contemporary capitalism.

Samuel Beckett's 1955 novel, *Waiting for Godot*, utilizes postmodern techniques. Estragon and Vladimir play language games without realising their full significance. Postmodernists agree that games are common among people, with no transcendental reality behind them. However, Estragon and Vladimir desire more. Franz Kafka's *Metamorphosis*, despite being irrational and nonsensical, explores fundamental aspects of human existence through a postmodern eclectic and aleatory approach. This experimental technique may refer as modern technique. Nouveau-roman and anti-novel are distinct that offer new experiments and explore different genres.

Nouveau-Roman literature often sees villains transform into heroes, as seen in Emily Bronte's *Wuthering Heights*, where Heathcliff's lack of maternal care leads to a monster. 'Heathcliff'' becomes postmodern of how modernism inspires new experimentation while postmodernism creates newer experimentation. Magic-realism of contemporary African literature is a postmodern characteristic. Realism is anti-magic. Postmodernism finds flaws in realism (Pilgrim, 2000), seeing that they cannot express their viewpoint in concrete realism. Magic realism combines something real and something unreal as in Coleridge's 'Willing suspension of disbelief' and Emily Bronte's extra-realistic character in 'Heathcliff'. Postmodern mini-narratives are an eclectic, aleatory approach, often parodied and pastiches of larger narratives like hoz-poz, modern music, Marxist, feminist, psychoanalytic criticism, science fiction, neo-Gothic, and horror stories.

Postmodernist art, originating in the 1960s, critiques institutionalized sexism and male bias like 'male gaze' in the art system through feminist, pop, and Fluxus art forms (Fournier, 2021). Postmodernist architecture diversifies in spirit and style, movement and project (Jencks, 2002). Postmodernist architecture focuses on particularity, specificity, and complexity, as seen in the 550 Madison Avenue skyscraper in Midtown Manhattan, designed by Philip Johnson and John Burgee. Philip Johnson's AT&T headquarters in New York City, an austere, International-style skyscraper with a baroque Chippendale pediment, is considered a postmodernist building.

Postmodern dance and music displace classical harmonies with ever-more-complex, almost unmusical sounds and noises (Black, 2012). Postmodernist dance, characterized by the collapse of boundaries, shares much formal experimentation. Postmodernists emphasize the works of Bill T. Jones, Twyla Tharp, and Mark Morris, replacing traditional dances like jazz, folk, and tribal, ballroom, break, and line dancing.

Postmodern philosophy, originating from the critique of Continental philosophy, challenges the fundamental assumptions and structures of philosophy (Silverman and Donn, 1988). It was greatly influenced by phenomenology, structuralism, and existentialism, including the writings of Nietzsche, Heidegger, Kierkegaard, and Hegel. Postmodern philosophy is skeptical of modern values and assumptions, such as the notion of human essence and the superiority of one form of government over another. Postmodern philosophy is linked to critical theory, deconstruction, and various fields like post-feminism, post-Marxism, and post-structuralism, unlike structuralism's binary oppositions.

Postmodernism is originally a reaction to modernism and modern ideals (Foster, 1983). Postmodernism, influenced by World War II, refers to a complex, interconnected, and often parody-like state of culture, intellectual, and artistic existence. The matter has led to allegations of fraudulence. When the idea of a reaction or rejection of modernism is borrowed by other fields, it became synonymous in some contexts with post-modernity. The term is closely associated with Derrida's post-structuralism and modernism, as it represents a rejection of bourgeois elitist culture. Post-modernism emerged as a reaction to the despair,

disillusionment, and ambiguity caused by World War II, as a response to the ideals of modernism. Postmodernism is derived from Nietzsche's critique of the waning aspects of modernity, particularly the nihilism and decadence that have characterized it. Rudolf Pannwitz's postmodernism, unlike Nietzsche's, incorporates nationalist and mythical elements, challenging the modern human to overcome it. Kierkegaard, Nietzsche express their scepticism through the appeal of existentialism and argue against objectivity, particularly with regard to social morals and societal norms that are destroyed, tormented, tortured, and ultimately destroyed by World War II.

Conclusion

Modernism breaks away from established rules, traditions and conventions, and refreshes ways of looking at human’s position and function in the universe and many remarkable experiments in form and style of creative art, music, literature, painting and sculpture etc. Structuralism is closely concerned with modern tenderness and ideals. So, this study finds modernism as an innovative movement, a revivifying movement which includes the fresh and new idea, welcomes ever fresh idea in the unfathomable world of critical theory, art and literature. However, postmodernism focuses a change in the concept of art, architecture, music, film, literature, sociology, communications, fashion, and technology. It is also difficult to locate postmodernism historically because it is unclear exactly when postmodernism begins. Thus, postmodernism is an amorphous term and that it cannot be termed in a neat-narration.

References

Ali, Diana A. "Modernist Poetry in English." *University of Diyal*, 2020.

Antin, David. "Modernism and Postmodernism: Approaching the Present in American Poetry." *Boundary 2* (1972): 98-133.

Baker, Houston A. *Modernism and the Harlem Renaissance*. University of Chicago Press, 1987.

Barry, Peter. *Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory*. Manchester University Press, 2017.

Baudrillard, Jean. *Jean Baudrillard: Selected Writings.* Edited by Mark Poster. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1988.

Beals, Kurt. *From Dada to Digital: Experimental Poetry in the Media Age*. Doctoral Dissertation. UC Berkeley, 2013.

Bennett, Andrew, and Nicholas Royle. *An Introduction to Literature, Criticism and Theory*. Routledge, 2023.

Berger, Arthur Asa. *The Portable Postmodernist*. Rowman Altamira, 2003.

Black, Chris. *Sound-as-art: The Rise of the Corporeal and Noise in Twentieth-century Art Practice*. Diss. Open Access Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington, 2012.

Bronner, Stephen Eric. *Critical Theory: A Very Short Introduction*. Vol. 263. Oxford University Press, 2017.

Brown, Peter, ed. *A Companion to Chaucer*. John Wiley & Sons, 2008.

Burdman, Javier. "Universality without Consensus: Jean-François Lyotard on Politics in Postmodernity." *Philosophy & Social Criticism* 46.3 (2020): 302-322.

Chabard, Pierre. "'New Classical' Contemporary Architecture: Retrotopic Trends and Phantasms of Tradition." *Footprint* 15.2 (2021).

Childs, Peter. *Modernism*. Routledge, 2016.

Cooper, Robert, and Gibson Burrell. "Modernism, Postmodernism and Organizational Analysis: An Introduction." *For Robert Cooper*. Routledge, 2015. 141-167.

Cuddon, John Anthony. *A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. John Wiley & Sons, 2012.

Eysteinsson, Astradur. *The Concept of Modernism*. Cornell University Press, 2018.

Farhan, Ria. "Understanding Postmodernism: Philosophy and Culture of Postmodern." *International Journal Social Sciences and Education* 2.4 (2019): 22-31.

Fitriah, WaOde Fadhilah. "Critics toward Metanarratives in the Movie Babel Viewed by Jean Francoois Lyotard's Thought: A Study of Postmodernism." 2010.

Foster, Hal. "Postmodernism: A Preface." *The Anti-aesthetic: Essays on Postmodern Culture* (1983): ix-xvi.

Fournier, Lauren. *Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism*. mit Press, 2021.

Frank, Joseph. "Spatial form in Modern Literature: An Essay in two Parts." *The Sewanee Review* 53.2 (1945): 221-240.

Goodfield, Eric. "Postmodern Paper Tiger: Lyotard, Baudrillard, and the Contemporary Politics of Poststructuralist Subversion." *Public Culture* 16.2 (2020): 233-252.

Gillard, William, James Reitter, and Robert Stauffer. *Speculative Modernism: How Science Fiction, Fantasy and Horror Conceived the Twentieth Century*. Vol. 77. McFarland, 2021.

Habermas, Jurgen. "Modernity – An Incomplete Project." *Postmodernism*. Routledge, 2016. 98-109.

Habermas, Jürgen, and Seyla Ben-Habib. "Modernity versus Postmodernity." *New German Critique* 22 (1981): 3-14.

Habib, Munther Mohd. "Culture and Consumerism in Jean Baudrillard: A Postmodern Perspective." *Asian Social Science* 14.9 (2018): 43.

Halassa, Messaouda, and Rania Serraye. *The Tragic Hero in Shakespeare's Macbeth and Arthur Miller's Death of a Salesman: A Comparative Study*. Diss. University Kasdi Merbah Ouargla, 2020.

Hofele, Andreas, and Stephan Laque, eds. *Humankinds: The Renaissance and its Anthropologies*. Vol. 25. Walter de Gruyter, 2011.

http://www.connect.net/ron [Retrieved on 01.09.2024]

http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism [Retrieved on 01.09.2024]

http://www.colorado.edu/English/courses/ENGL2012Klages/pomo.html [Retrieved on 01.09.2024]

http://science.jrank.org/pages/10807/Postmodernism-Postmodernism-in-Literature-Art.html [Retrieved on 01.09.2024]

http://elab.eserver.org/hfl0256.html [Retrieved on 01.09.2024]

Hutcheon, Linda. "Beginning to Theorize Postmodernism." *Textual Practice* 1.1 (1987): 10-31.

Jencks, Charles. *The New Paradigm in Architecture: The Language of Post-modernism*. Yale University Press, 2002.

Jenkins, Keith. "Modernist Disavowals and Postmodern Reminders of the Condition of History Today: On Jean-François Lyotard." *At the Limits of History*. Routledge, 2013. 169-187.

Kent, John. "The Enlightenment." *Companion Encyclopedia of Theology*. Routledge, 2002. 251-271.

Levin, Gail. "Modern and Postmodern Art and Architecture." *A Companion to the Classical Tradition* (2007): 371-392.

Lyotard, Jean-François. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Vol. 10. U of Minnesota Press, 1984.

McCracken, Scott, and Jo Winning. "The Long Modernist Novel: An Introduction." *Modernist Cultures* 10.3 (2015): 269-281.

Murdoch, Jon. "Post-structuralist Geography: A Guide to Relational Space." *Post-structuralist Geography* (2005): 1-232.

Nealon, Jeffrey Thomas, and Susan Searls Giroux. *The Theory Toolbox: Critical Concepts for the Humanities, Arts, and Social Sciences*. Rowman & Littlefield Publishers, 2012.

Nelson, William. *Fact or Fiction: the Dilemma of the Renaissance Storyteller*. Harvard University Press, 1973.

O'Farrell, Clare. "Michel Foucault: The Unconscious of History and Culture." *The SAGE Handbook of Historical Theory* (2013): 162-182.

Owen, Kathleen Belin. "'The Game's Afoot': Predecessors and Pursuits of a Postmodern Detective Novel." *Theory and Practice of Classic Detective Fiction* 62 (1997): 73.

Pierce, Gillian B. "Contemporaneity and Antagonism in Modernist and Postmodern Aesthetics." *The Comparatist* 37 (2013): 54-70.

Pilgrim, David. "The Real Problem for Postmodernism." *Journal of Family Therapy* 22.1 (2000): 6-23.

Richardson, Brian. "Voice and Narration in Postmodern Drama." *New Literary History* 32.3 (2001): 681-694.

Richters, Annemiek. "Modernity-Postmodernity Controversies: Habermas and Foucault." *Theory, Culture & Society* 5.4 (1988): 611-643.

Rosenau, Pauline Marie. *Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions*. Princeton University Press, 1991.

Rynkiewich, Michael. *Soul, Self, and Society: A Postmodern Anthropology for Mission in a Postcolonial World*. Wipf and Stock Publishers, 2012.

Scruton, Roger. *A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein*. Routledge, 2004.

Shepherd-Barr, Kirsten. "Modernism and Theatrical Performance." *Modernist Cultures* 1.1 (2005): 59-68.

Silverman, Hugh J., and Donn Welton, eds. *Postmodernism and Continental Philosophy*. Vol. 13. SUNY Press, 1988.

Silverman, Hugh J., ed. *Derrida and Deconstruction*. Routledge, 2004.

Smythe, Luke. "Modernism Post-postmodernism: Art in the Era of Light Modernity." *Modernism/Modernity* 22.2 (2015): 365-379.

Spain, Daphne. *Gendered spaces*. Univ of North Carolina Press, 2000.

Szostak, Rick. "Modernism, Postmodernism, and Interdisciplinarity." 2007.

Tonelli, Giorgio. "The “Weakness" of Reason in the Age of Enlightenment." *Diderot Studies* 14 (1971): 217-244.

Volavkova, Zdenka. "The Theory of Material and Material Realization and the Beginnings of

Modern Sculpture." *Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Bniverzity. F, Řada Uměnovědná* 19.F14-15 (1971): 317-328.

Weiss, Shannon, and Karla Wesley. "Postmodernism and its Critics." *Department of Anthropology* (2002).

Zhang, Jingsheng. *The Rising of the Avant-Garde Movement in the 1980s People’s Republic of China: A Cultural Practice of the New Enlightenment*. Doctoral dissertation. University of South Carolina, 2021.

Zhang, Jieqiang. "Poetry as postmodern." 2010.

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 02, July-December 2024
ISSN 2519-5816

Thirty-five years later: Long-term effects of Maternal Health on the number of Births at Matlab, Bangladesh

Md. Rezaul Karim*

Abstract

Maternal health has long been a significant concern over the century, as marital status had been identified as a significant predictor of women's health and mortality, with married individuals generally experiencing better health outcomes than unmarried individuals. This study examines the long-term effects of maternal health on birth rates in Matlab, Bangladesh. It explores the relationship between the number and timing of births and Bangladeshi women's health, reproductive function, and autonomy. Using secondary data from a large quantitative study, the research investigates how maternal health influences the frequency of childbirth.The data include key socioeconomic variables such as birth control usage, social class, assets, education, and environmental toxin exposure. These factors are also incorporated into the analysis. The outcome variables include overall health status assessments and specific disease experiences. The study identifies a clear association between maternal health and reproductive patterns in Matlab, Bangladesh. Findings indicate that a higher number of births is closely linked to increased health risks, including maternal morbidity, obesity, and chronic conditions.

Keywords: Maternal health, thirty-five years, number of children, Matlab-Bangladesh.

* Assistant Professor, Department of Social Work, Jagannath University, Dhaka

Introduction

In recent decades, there has been tremendous progress in women's health, and the development has long standing significance and benefits over the long-term event of the life course. Influences over women's health include socioeconomic status and other life conditions. According to Henretta (2007), reproductive birth counts, and early childbearing has been linked to a range of adverse health outcomes for women, including increased risk of mortality. Marital status had been identified as a significant predictor of women's health and mortality, with married individuals generally experiencing better health outcomes than unmarried individuals. According to Griceet al. (2007), the findings of the author's analysis of the longitudinal data which emphasize women's reproduction function and minimize their autonomy, women have more children more often. Intense reproductive labor in this manner has been associated with poor health for women and children (Adhikari 2016, Barham 2012 &Henretta, 2007). Sociologically, women's subordinate gender status places them at increased risk of over-work around reproduction, placing their health and well-being at risk. This study investigates the relationship between the number and timing of births and the health of Bangladeshi women, utilizing secondary data from a large-scale quantitative study. In addition to reproductive patterns, the analysis incorporates key socioeconomic factors such as birth control use, social class, asset ownership, education, and environmental toxin exposure. Health outcomes are assessed through both overall health status and specific disease experiences.

In the next section of the paper, research from around the world regarding women's status, reproduction, and health is reviewed. This is followed by review of literature regarding Bangladesh, before details of the data, analyses, and findings are discussed.

Literature Review

Christopher (2005) highlights the significance of social roles in shaping women's experiences and opportunities.He identifies role strain as the stress and strain individuals experience when they cannot fulfill the demands of multiple roles, contending that role strain can adversely affect women's health outcomes, particularly when experienced across several domains, such as work, family, and community roles. Mothers who experience a sudden increase in fertility are more likely to develop health problems, such as high blood pressure and obesity, likely due to increased stress, financial hardship, and the physical demands of raising more children (Cáceres-DelpianoandSimonsen, 2012). Weng et al. (2004) investigate the link between obesity and the number of children among middle-aged men and women. Using data from the Health and Retirement Study (HRS), a sample of individuals aged 50 and over in the United States, the authors analyzed information from over 15,000 participants. They studied the correlation between the number of children and body mass index (BMI). The study discovered that women with more children were more prone to obesity. Each additional child "was associated with a 7% increase in the likelihood of obesity."

According to Grice et al. (2007), "women who experienced high levels of work-family conflict" in the early months after childbirth were more likely to report poorer

health outcomes later, including symptoms of depression, anxiety, and physical health problems. The importance of maternal health service utilization in improving maternal and child health outcomes is discussed by Ramesh Adhikari (2016), who notes that despite progress, maternal mortality and morbidity rates remain high in Nepal, particularly among marginalized and disadvantaged populations. To address this issue, Adhikari suggests that improving women's autonomy and agency may be a crucial strategy for increasing maternal health service utilization and reducing maternal health disparities in Nepal. Women's autonomy, as measured by various indicators such as decision-making power, mobility, and financial independence, is positively correlated with maternal health service utilization in Nepal. Women with higher levels of autonomy "were more likely to use antenatal care, delivery, and postnatal care services compared to those with lower levels of autonomy" (Adhikari, 2016), and other factors, such as education, wealth, and geographic location are also determinant of maternal health service utilization in Nepal. This work highlights the critical role of women's autonomy in overcoming barriers to accessing and utilizing maternal health services, particularly for marginalized and disadvantaged women (Adhikari, 2016).

Callander (2021) highlights the disparities in healthcare services received by Indigenous mothers who experience stillbirth compared to non-Indigenous mothers in Australia. The study found that Indigenous mothers had lower rates of appropriate care and support, experienced multiple stillbirths, and had stillbirths at earlier gestational ages. Geographic and socioeconomic disadvantages, cultural barriers, and racism and discrimination within the healthcare system contributed to the inequitable use of health services for indigenous mothers. The author suggests interventions to address these issues, including reducing racism and discrimination, improving access to culturally responsive care, and addressing social and economic determinants of health. The author emphasizes the importance of involving Indigenous communities in designing and implementing these interventions.

Rahman (2017) argued that the impact of contraceptive use on changes in weight, body composition, and fat distribution in women was investigated. The study highlights the potential impact of contraceptive use on women's body composition and fat distribution. It suggests that healthcare providers should consider these effects when counseling women on contraceptive options. However, the study's reliance on a specific population and limited timeframe may limit its generalizability to other groups or longer-term effects of contraceptive use.

Schittker (2004) argued that the relationship between employment and health outcomes is complex for women with children. Women with children who were employed in 2004 reported better health outcomes than those who were not, but only if they worked full-time. Part-time employment was not associated with better health outcomes for women with children:

> "Giving birth multiple times can have various impacts on a woman's health, which depend on factors such as her age, overall health, and pregnancy spacing. Potential impacts may include an increased risk of maternal mortality, physical changes like weight gain and stretch marks, a higher likelihood of experiencing pregnancy

> complications such as gestational diabetes or preterm labor, an impact on reproductive health like an increased risk of uterine prolapse, and the potential toll on mental health due to the demands and stress of caring for multiple children". (Schnittker, 2004, p.286–305).

According to Uri P.Dior et al. (2013), there is an association between the number of children and the mortality risk of mothers. The findings indicate that maternal pregnancies and postnatal characteristics, as reflected by the number of children, may have lasting consequences for maternal health.

Bearing Children in Bangladesh

The impacts of giving birth multiple times on a woman's health can vary depending on factors like age, overall health, and pregnancy spacing. These impacts may include a higher risk of maternal mortality, physical changes such as weight gain and stretch marks, an increased likelihood of experiencing pregnancy complications like gestational diabetes or preterm labor, potential effects on reproductive health like uterine prolapse, and a toll on mental health due to the stress and demands of caring for multiple children (WHO, 2019).

Family programs are considered one of the vital agendas in most developing countries where people have limited access to resources compared to the population. The programs aim to give fertility assistance rather than population control. Sometimes overpopulation is considered a burden for the country and thinking of hindering development (WHO, 2019). After the birth of Bangladesh, the government has taken different initiatives through various five years plans; family planning is one of them. It is believed that small families have benefits for maternal health or less burden to educate children. Once, the government had to telecast the advertisement to the mass media to create awareness, stating, "Small family is a happy family." A small family doesn't mean a nuclear family but limiting the number of births. So, it is argued that the number of births in the family has a significant role in maternal health.

Douglas (1984) investigated the initial impact of a family planning program on contraceptive use and fertility in rural Bangladesh. The study used data from a baseline survey of 21,675 women of reproductive age in 67 rural villages in Bangladesh, where villages were "randomly assigned to either a treatment group or a control group." The treatment group received family planning services, including contraceptives, health education, and counseling, while the control group did not. Koenig (1988) analyzed maternal mortality rates in rural Matlab, Bangladesh, between 1976 and 1985. The authors aimed to assess the maternal mortality ratio (MMR), identify the leading causes of maternal deaths, and examine factors associated with maternal mortality. The study was conducted in a demographic surveillance area (DSA) in eastern Bangladesh, using data from the DSA's health and demographic surveillance system, which records important events such as births and deaths. The study found that the MMR in the Matlab DSA was 550 per 100,000 live births during the study period, with bleeding being the primary cause of maternal deaths, followed by sepsis and eclampsia. Additionally, maternal mortality

was higher among younger women, those with lower levels of education, and those from poor households.

Mobarak et al. (2017) examined the effects of a wealth shock on marriage market outcomes in rural Bangladesh, focusing on consanguineous marriage (marriage between close relatives). The study utilizes data from a randomized controlled trial that provided cash transfers to households in rural Bangladesh. The authors investigated the impact of cash transfers on various marriage market outcomes, including consanguineous marriage, marriage age, and educational attainment. The study finds that cash transfers led to an increase in consanguineous marriage, especially among poorer households. The authors suggest that this may be due to a heightened demand for marriage partners within the same wealth class and a desire to maintain family ties and social networks. Furthermore, the study reveals that cash transfers resulted in a rise in marriage age and educational attainment among women, indicating positive effects on women's empowerment and agency.

It is crucial to consider the context and implications of the Matlab program. The Matlab program was implemented in Bangladesh in the 1980s to improve the health and well-being of mothers and children in the region. The program provided family planning services, maternal and child health care, and nutrition education. The program's long-term effects on older women's well-being have been examined in recent research. The analysis of the statement indicates that the Matlab program had a positive long-term impact on older women's well-being (Barham, 2012). The study found that older women who were exposed to the program had better health outcomes, including lower rates of chronic illness, disability, and cognitive impairment. This suggests that the program had a lasting impact on the health of women who were exposed to it. Rahman et al. (2019) examined the long-term effects of the Matlab Maternal and Child Health/Family Planning Program on older women's well-being in the region 35 years after its initiation. Rahman et al. (2019) argued that the program significantly positively affected older women's health and well-being. Women exposed to the program had better physical "health, lower rates of chronic disease, longer life expectancy, better mental health outcomes, including lower rates of depression and anxiety." Women exposed to the program had better economic outcomes, including higher income levels and better access to healthcare. Tania Barham and Randall Kuhn (2009) examined the impact of a health and family planning program on migration patterns in rural Bangladesh. Using data from the Matlab Health and Demographic Surveillance System, the study analyzed a treatment group of 52 villages that received access to health and family planning services and a control group of 58 villages that did not have access to these services until later. The study finds that the health and family planning program significantly affected out-migration patterns, specifically for women. Women in the treatment group were less likely to migrate out of their home villages than those in the control group. The authors suggest that this may be due to improved health outcomes, increased economic opportunities, and greater control over reproductive decision-making.

Tania Barham (2012) explored how a health and family planning program implemented in the early 1990s in the Matlab area of Bangladesh impacted women's cognitive functioning in the medium term. The study used data from the Matlab Health and Demographic Surveillance System to compare the mental functioning of women who participated in the program to those who did not, using tests that measured memory, attention, and executive function. The study found that women who participated in the program had significantly better scores on memory and executive function tests than women who did not participate. The program's positive effects on cognitive functioning were found to be greater for women with fewer children and higher levels of education. These results suggest that the health and family planning program improved women's cognitive functioning in the medium term, particularly for those who had greater access to education and fewer child-rearing responsibilities. Henretta (2007) analyzed HRS data examining the relationship between early childbearing and mortality risk among women over 50. The research shows that "women who had their first child before the age of 20 had a significantly higher risk of mortality compared to women who had their first child at age 20 or older, even after controlling for other factors." The relationship between early childbearing and mortality was also stronger among unmarried women. This suggests that promoting reproductive health and family planning may be an essential strategy for reducing mortality among women after age 50, particularly among available women at greater risk. The article also "highlights the need for further research to better understand the underlying mechanisms." In a separate study, Schnittker (2007) examined the relationship between women's employment and health outcomes. The analysis showed that in 2004, employed women reported better health outcomes than those who were not, even after controlling for other factors such as age, race, marital status, and education.

Sullivan (1990) aimed to analyze the trends and patterns of contraceptive use among married women in the Matlab region of Bangladesh in 1990. The study utilized data from the Matlab Demographic Surveillance System (DSS), a representative population sample. The authors found a significant increase in contraceptive use in the region between 1979 and 1990. In 1990, 43 percent of married women used some form of contraception, while only 6% did in 1979. The most used method was the pill, followed by female sterilization and condoms. The author identified several factors that contributed to the increase in contraceptive use, including the availability and accessibility of family planning services, increased awareness, and knowledge about family planning methods, and changing social norms regarding family size and contraceptive use. The study also revealed that age at first marriage and level of education were positively associated with contraceptive use. The authors highlighted the importance of improving access to family planning services and increasing awareness and knowledge about family planning methods to increase contraceptive use in the region. Phillips et al. explored the factors influencing reproductive change in a traditional society. The authors conducted a longitudinal study between 1982 and 1988 in Matlab, Bangladesh, to assess the factors affecting fertility and family planning use. The study collected data on socio-demographic characteristics, fertility, contraceptive use, family planning knowledge, and attitudes toward family

planning through in-depth interviews, focus group discussions, and surveys. This author discusses the implications of these findings for public health policy and practice.

The study aims to fill a gap in knowledge by examining women's health and social status as they age beyond the specific focus on maternal and child health outcomes. The focus of this study is to know the sociological aspects of women as a gender and family as a social institution, and health status as a part of rights.

Methodology

To examine the long-term effects on adult women's health status, I have identified one independent variable and one dependent variable. The variables are the number of children born live (IV) and Women's Health Status (DV).

Research Questions:

Was there any relationship between the number of births and the health condition of the older women at Matlab town, Bangladesh? Is birth spacing and timing related to women's health?

Hypotheses:

H1: Women with smaller numbers of children born live will have better health status than women with larger numbers of children.

H2: Women with larger birth intervals, later age at first birth, and earlier age at last birth will have better health status than women who have children younger, older, and closer together.

Data:

The study analyzed secondary data obtained from the Matlab Health and Demographic Surveillance System (MHDSS) and the first and second Matlab Health and Socioeconomic Surveys (MHSS1 and MHSS2), which were conducted 35 years after the initiation of the maternal and child health/family planning (MCH/FP) program in Matlab, Bangladesh. Despite the belief that family planning programs have long-term benefits for women's health and well-being, there have been few studies examining their extent and direction. The MCH/FP program provided a 12-year period of documented differential access to services. The study evaluated the program's impacts on women's fertility, health, and economic outcomes over their lifetime, from 1978 to 2012, by following 1,820 women of reproductive age for those born 1938-1973. The researchers used intent-to-treat single-difference models to compare treatment and comparison area women. The study found that the MCH/FP program significantly increased contraceptive use, reduced completed fertility, lengthened birth intervals, and reduced age at last birth. However, the program was not found to have significant positive impacts on women's health or economic outcomes.

To gather data for the research, two main sources were used: the Matlab Health and Demographic Surveillance System (MHDSS) and the Matlab Health and Socioeconomic Surveys (MHSS1 and MHSS2). The MHDSS is an ongoing system

that collects information on the health and demographic characteristics of individuals in the Matlab area of Bangladesh. This is done through regular visits to households, where surveyors conduct interviews to gather information on various aspects of health and demographic data. This system allows for tracking individuals over time and provides valuable information on reproductive health and other relevant factors.

The MHSS1 and MHSS2 were specifically conducted for the research study and aimed to collect additional data on socioeconomic factors such as education, income, and employment, as well as health-related variables. The surveys were conducted through household interviews using structured questionnaires and provided data at specific time points to assess the long-term impact of the MCH/FP program. By combining data from both sources, the research study was able to obtain comprehensive information on women's reproductive health, health behaviors, socioeconomic status, and other relevant factors over a long period of time. This allowed for a robust evaluation of the long-term effects of the MCH/FP program.

Analysis

I performed descriptive analyses on each variable. To find out the causal relationship among the variables, I conducted Pearson correlations analyses and regression analyses for all independent variables (number and timing of children born) regressed on overall health status to find out the causal relationship among the variables.

Results

The study explored the effects of childbearing on women's health status. Analyses were undertaken to test the propositions of both hypotheses, whether the number of children and spacing of children is associated with health status. The results showed that the number of children is directly proportional to health status. In contrast, those who had a smaller number of children enjoyed better health status.

Demographics:

As seen in Table 1, there were 1820 respondents. The average age for first childbirth was around 19 and the youngest age for first child was 14 years. The average age for the last child born was around 34 and the maximum age was 56, with an average interval of around 4 and maximum of 16. The average number of children was around 6 and the maximum was 14. The average surviving children were around 5 and the maximum was 12. It showed that the men have a comparatively better education rate (2.25 years) than the women (less than 1 year) where the maximum is 11 years.

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Age	1820	86.00	.00	86.00	20.1350	12.46105	155.278	.942	.057	2.189	.115
HH years of education, Maktab=0	1820	11.00	.00	11.00	2.2455	3.09855	9.601	1.291	.057	.740	.115
HH spouse's years of education, Maktab=1	1820	11.00	.00	11.00	.7835	1.69229	2.864	2.410	.057	5.594	.115
Family size	1820	27.00	1.00	28.00	6.9040	2.91530	8.499	1.484	.057	5.007	.115
Latrine (=1)	1820	1.00	.00	1.00	.8553	.34904	.122	-2.037	.057	2.171	.115
Drinking water, tubewell (=1)	1820	1.00	.00	1.00	.2278	.41635	.173	1.308	.057	-.273	.115
Drinking water, tank (=1)	1820	1.00	.00	1.00	.3593	.47634	.227	.591	.057	-1.637	.115
1982 Land size	1820	232.00	.00	232.00	11.2654	15.68178	245.918	3.701	.057	28.173	.115
Number of rooms per capita	1820	1.00	.00	1.00	.2067	.09153	.008	2.381	.057	13.052	.115
Arsenic level 50-99 PPB	1820	1	0	1	.06	.230	.053	3.864	.057	12.941	.115
Arsenic level 100-149 PPB	1820	1	0	1	.08	.264	.070	3.222	.057	8.392	.115
Arsenic level 150-399 PPB	1820	1	0	1	.43	.495	.245	.300	.057	-1.912	.115
Arsenic level >400 PPB	1820	1	0	1	.21	.404	.163	1.459	.057	.129	.115
Children Born	1819	14	0	14	5.41	2.395	5.738	.318	.057	-.153	.115
Surviving Children	1819	12	0	12	4.43	1.886	3.557	.293	.057	.180	.115
Age at First Child	1787	29	12	41	19.41	3.760	14.137	1.463	.058	3.394	.116
Age at Last Child	1787	42	14	56	33.17	5.490	30.143	-.052	.058	-.151	.116
Average Birth Interval	1755	16.00	.00	16.00	3.3551	1.42025	2.017	2.229	.058	9.702	.117
Injection	1820	1	0	1	.40	.491	.241	.390	.057	-1.850	.115
IUD	1820	1	0	1	.07	.262	.069	3.253	.057	8.588	.115
Pill	1820	1	0	1	.46	.499	.249	.141	.057	-1.982	.115
Sterilization	1820	1	0	1	.15	.357	.127	1.968	.057	1.875	.115
MHSS2 Annual Earnings (2012 USD)	1776	1902.00	.00	1902.00	35.2719	184.39260	34000.630	7.972	.058	70.453	.116

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
MHSS2 Employed (=1)	1816	1	0	1	.36	.480	.230	.586	.057	-1.659	.115
MHSS2 Has Savings (=1)	1765	1	0	1	.12	.321	.103	2.390	.058	3.714	.116
MHSS2 Has Productive Asset (=1)	1773	1	0	1	.14	.343	.118	2.119	.058	2.495	.116
BRAC	1820	1	0	1	.58	.494	.244	-.316	.057	-1.902	.115
Angina	1818	2.53	-.49	2.04	.0741	1.05334	1.110	1.337	.057	-.212	.115
Stroke	1818	4.71	-.22	4.49	.0810	1.15730	1.339	3.554	.057	10.640	.115
Overweight or Obese	1750	2.14	-.69	1.45	.0203	1.00727	1.015	.709	.059	-1.500	.117
Stage 1 Hypertension	1779	2.18	-.66	1.52	.0444	1.01777	1.036	.757	.058	-1.429	.116
Stage 2 Hypertension	1779	2.39	-.54	1.85	.0751	1.04523	1.093	1.110	.058	-.768	.116
Difficulties w/ Activities	1818	2.14	-.69	1.45	.0279	1.01002	1.020	.697	.057	-1.516	.115
Poor Health Status	1818	2.11	-.72	1.39	.0348	1.01090	1.022	.597	.057	-1.645	.115
Chronic Lung Disease	1817	4.80	-.22	4.58	.0433	1.08948	1.187	3.929	.057	13.451	.115
Asthma	1816	3.17	-.35	2.82	.0828	1.09413	1.197	2.105	.057	2.434	.115
EDUC	1820	22.00	.00	22.00	3.0290	4.20992	17.723	1.633	.057	2.267	.115
ASSETS	1820	232.22	.00	232.22	11.4722	15.67580	245.731	3.703	.057	28.211	.115
SOCCLASS	1820	1936.94	.00	1936.94	49.5253	183.15475	33545.664	7.997	.057	71.525	.115
SAFEWATER	1820	1.00	.00	1.00	.3687	.48258	.233	.545	.057	-1.705	.115
LIVECOND	1820	2.00	.00	2.00	1.2240	.60359	.364	-.162	.057	-.502	.115
BIRTHCONTROL	1820	4.00	.00	4.00	1.0929	.95740	.917	.469	.057	-.563	.115
ILLDIAG	1819	21.92	-3.17	18.75	.4175	3.72327	13.863	1.193	.057	1.379	.115
POORHEALTH	1819	24.03	-4.58	19.45	.4802	4.40218	19.379	1.034	.057	.958	.115
age74_chcl>13 (FILTER)	1820	1	0	1	.67	.472	.222	-.707	.057	-1.502	.115
Valid N (listwise)	1638										

Table 1: Descriptive Statistics

The number of women use different contraceptives in an average such as pill, IUD, injection was .5% which was very low. Women had very few opportunities to use proper sanitation (latrine) which is below 1%. They had access to limited space in the house. The average number of rooms they had was .30% around. But the interesting thing is that around 12% of the women had assets. In case of safe drinking water, only .5% women had access to this. From the histogram, we can see that women become mother at very early age, started from 12 and continued up to at the age of 56. But the average age was 19.

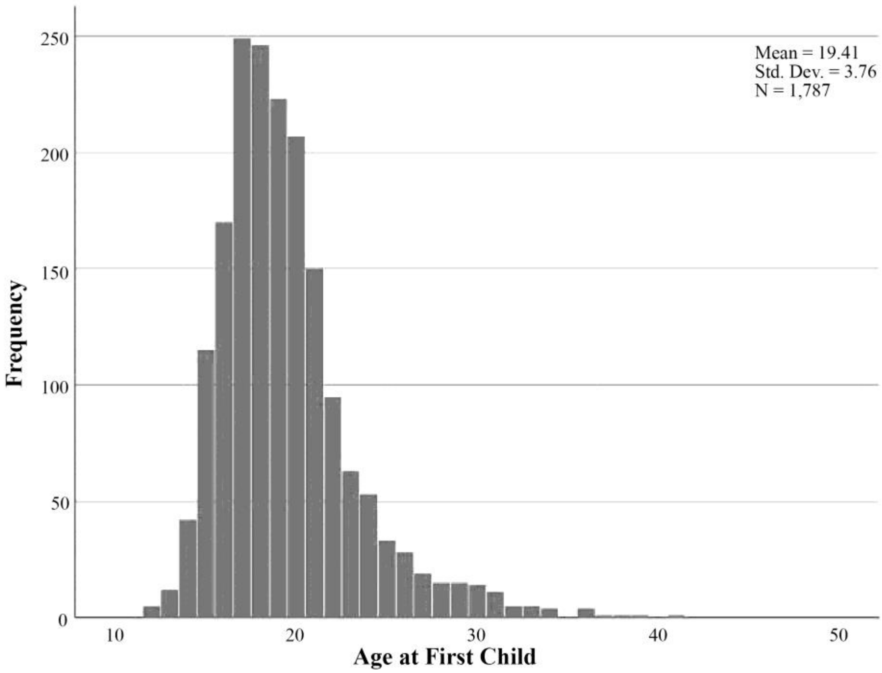

Figure 1: Histogram of Age at First Child Born

Table 2 shows the relationship between respondent age respondent children born, age at last child, age at first child, respondent birth interval, education, safe water, living conditions, social class, arsenic exposure, and respondent birth control and respondent ill health diagnoses. Among the variable, Age at Last Child (p-vale =.013) and ''EDUC'' ($p<.001$) are significant.

The R2 for Model-1 is .029, which indicates that with all these variables considered, then the illnesses of respondents can be accurately predicted 2.9 percent of the time.

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.176	1.151		-.152	.879
	age74_chcl Age	.020	.011	.052	1.783	.075
	sum_child_all_any Children Born	.266	.144	.151	1.843	.066
	sum_child_all_alive Surviving Children	.082	.110	.038	.747	.455
	m2_ageatfirstchild Age at First Child	.055	.057	.045	.967	.334
	m2_ageatlastchild Age at Last Child	-.123	.049	-.175	-2.478	.013
	m2_avgbirthint Average Birth Interval	.321	.173	.094	1.854	.064
	EDUC	.121	.028	.135	4.364	<.001
	ASSETS	.010	.008	.035	1.134	.257
	SOCCLASS	.001	.001	.026	.899	.369
	SAFEWATER	.519	.408	.065	1.273	.203
	LIVECOND	-.412	.332	-.063	-1.241	.215
	BIRTHCONTROL	.221	.127	.053	1.742	.082
	ARSENIC	-.188	.283	-.019	-.666	.506

a. Dependent Variable: ILLDIAG

Table 2: Regression on Ill Health Conditions/Diagnoses

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
2	(Constant)	-.444	1.359		-.326	.744
	age74_chcl Age	.043	.013	.095	3.229	.001
	sum_child_all_any Children Born	.370	.170	.179	2.176	.030
	sum_child_all_alive Surviving Children	-.025	.129	-.010	-.192	.848
	m2_ageatfirstchild Age at First Child	.048	.067	.033	.720	.472
	m2_ageatlastchild Age at Last Child	-.113	.058	-.137	-1.932	.054
	m2_avgbirthint Average Birth Interval	.267	.204	.067	1.307	.191
	EDUC	.094	.033	.090	2.889	.004
	ASSETS	.008	.010	.023	.753	.452
	SOCCLASS	.000	.001	-.005	-.173	.863
	SAFEWATER	.572	.482	.061	1.187	.235
	LIVECOND	-.332	.391	-.043	-.848	.397
	BIRTHCONTROL	.082	.149	.017	.551	.582
	ARSENIC	-.463	.334	-.040	-1.388	.165

a. Dependent Variable: POORHEALTH

Table 3: Regression on Overall Poor Health

Table 3 shows the relationship between respondent age children born, age at last child, respondent education. The table shows that age (p-value=.01),number of children born (p-value=.03) and education (p-value=.004) are significant. The R2 for Model-2 is .018, which indicatesall these variables known, then the conditional poor health can be accurately predicted about 2 percent of the time.

Table 3 also shows other variables such age at first child, age at last child, birth interval, surviving children, assets. social class, safewater, living conditions, birth control is not significant as they p-vale > .05. These variables don't impact the women's health status.

Discussion

The research found a causal relationship between the number of birthsand the health status of older women. The study provided insight and knowledge on the survivors 35 years later their health compared to a different number of births.

The findings of this study support the hypotheses, finding a significant relationship between the number of biological births, age at last child born, respondent education, respondent age and health status. This overall finding remained significant with all other variables included in the regression models. According to Henretta (2007) and Schnittker (2004), reproductive birth counts and women's health and longevity show early childbearing has been linked to a range of adverse health outcomes for women, including increased risk of mortality, there is a significant body of research that supports the findings of Henrietta's (2007) study on the relationship between early childbearing and mortality risk. For example, a study by Smith-Greenaway et al. (2013) found that women who gave birth before the age of 18 were more likely to experience adverse health outcomes, including mortality, compared to women who gave birth at age 18 or older. Another study by Hinkle et al. (2014) found that women who had short interpregnancy intervals (less than 18 months) had an increased risk of adverse pregnancy outcomes, including preterm birth and low birth weight, which can have long-term health consequences for both the mother and child.

The importance of considering the potential health impacts of multiple births when providing reproductive health care to women is supported by the findings of Schnittker's (2004) Healthcare providers should be aware of the potential health risks associated with higher parity and consider these risks when providing reproductive health care to women. Providers should discuss with women the benefits and risks of different contraceptive methods, including the importance of spacing out pregnancies, to promote better health outcomes for women and their families.

Additionally, the study underscores the importance of addressing socioeconomic factors that may contribute to poorer health outcomes among women with higher parity, such as poverty, limited access to healthcare, and other social determinants of health. Rahman (2017) and Barham (2011) provide valuable insights into the potential effects of contraceptive use and birth interval and family planning

programs on women’s health and well-being and highlight the need for further research in these areas. The studies provide important insights into the potential effects of contraceptive use and health and family planning programs on women's health and well-being and highlight the need for further research in these areas.

Douglas (1984), Koenig (1988), Barham (2011), Rahman et al. (2019), and Sullivan (1990) are important contributions to the field of reproductive health research, particularly in the context of Bangladesh. These studies provide valuable insights into the impact of family planning programs on contraceptive use, fertility rates, and maternal mortality in rural Bangladesh. The study also provides valuable insights into the impact of family planning programs on reproductive health outcomes in rural Bangladesh and supports the need for continued investment in family planning and maternal health interventions in the region.

Conclusion

The study founds a clear link between maternal health and reproductive patterns in Matlab, Bangladesh, revealing that an increased number of births is closely associated with heightened health risks such as maternal morbidity, obesity, and other chronic conditions. The findings align with prior research indicating that early and frequent childbearing detrimentally affects both the physical and mental well-being of women. Moreover, the study highlights the significant role of socioeconomic factors—namely education, healthcare access, and economic status—in influencing maternal health outcomes.In light of these results, it is evident that effective family planning programs and robust healthcare interventions are crucial for mitigating the adverse consequences of high fertility rates. Policies aimed at promoting birth spacing, ensuring contraceptive access, and enhancing maternal healthcare are imperative to improve women’s long-term health. Besides, increasing awareness and empowering women regarding their reproductive choices can lead to better autonomy and overall well-being.

However, the study also acknowledges several limitations. The reliance on secondary data may not fully capture the nuanced personal experiences and health conditions of women, while external influences such as environmental changes, healthcare advancements, and policy shifts over the study period were not comprehensively accounted for. Furthermore, the focus on a specific population in Bangladesh limits the broader applicability of the findings, and the analysis did not fully explore cultural, psychological, and intersectional factors, including ethnicity, gender, and social class.

Given these considerations, further research is necessary to examine additional variables, such as environmental exposures, cultural influences, and the long-term impacts of policy changes. In the future, researchers also should give attention to how ethnicity/race, gender, and social class intersect with mental well-being in relation to reproductive health among women. It is important to continue studying the possible impact of birth control on the mental health of families, considering gendered factors such as the age gap between partners. Whenever possible, future

research should include data on women’s mental health. As communication technologies continue to advance, it will be necessary for researchers and policymakers to monitor how women engage socially through different modes. Having a better understanding of women’s health is critical for preventing harmful social diseases in this population.

Ultimately, reducing the health risks associated with multiple births requires a multifaceted approach that integrates educational initiatives, improved healthcare access, and supportive policies. By prioritizing maternal health through such comprehensive strategies, societies can not only improve the quality of life for women but also foster broader public health improvements and sustainable development.

References

Adhikari, Ramesh. (2016). Women's autonomy and maternal health service utilization in Nepal. *Women & Health*, 56(5), 553-572.

Barham, Tania & Randall Kuhn. (2009). Staying for Benefits: The Effect of a Health and Family Planning Program on Out-Migration Patterns in Bangladesh. *Demography*, 46(3),497-512.

Barham, Tania. (2012). Enhancing cognitive functioning: medium-term effects of a health and family planning program in Matlab. *Health Economics,* 20(9), 1071-1089. doi 10.1002/sec.1726

Berenson, Abbey B. &Mahbubur Rahman. (2017). Changes in weight, total fat, percent body fat, and central-to-peripheral fat ratio associated with injectable and oral contraceptive use. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 216(5), 484.

Cáceres-Delpiano, Julio & Marianne Simonsen.(2012). The toll of fertility on mothers’ wellbeing. *Journal of health economics 31(5), 752-766.*

Callander, E., Fox, H., Mills, K., Stuart-Butler, D., Middleton, P., Ellwood, D., Thomas, J., & Vicki Flenady. (2021). Inequitable use of health services for Indigenous mothers who experience stillbirth in Australia. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12884-021-03724-5

Dior, Uri P., et al.(2013). Association between number of children and mortality of mothers: results of a 37-year follow-up study. *Annals of epidemiology, 2(3.1), 13-18.*

Henretta, John C. (2007). Early childbearing, marital status, and women's health and mortality after age 50. *Journal of Health and Social Behavior*, 48(3), 254-266.

Huber, Douglas H. &Atiqur Rahman Khan. (1984). Contraceptive distribution in Bangladesh villages: *The initial impact. Studies in Family Planning,* 15(4), 159-168.

Koenig, M. A., Fauveau, V., Chowdhury, A. I., Chakraborty, J. & M. A. Khan. (1988). Maternal mortality in Matlab, Bangladesh: 1976-85. *Studies in Family Planning*, 19(2), 69-80.

Lichter, D. T., Parisi, D., Grice, Steven. M. & Michael C. Taquino. (2007). National estimates of racial segregation in rural and small-town America. *Demography*, 44(3), 563-581.

Mobarak, A. Mushfiq., Kuhn, R. & Christina Peters. (2017). Consanguinity and other marriage market effects of a wealth shock in Bangladesh. Demography, 54(3), 1201-1229. doi: 10.1007/s13524-017-0582-x

Phillips, J. F., Simmons, R., Koenig, M. A. & J. Chakraborty. (1988). Determinants of reproductive change in a traditional society: Evidence from Matlab, Bangladesh. *Studies in Family Planning,* 19(5), 288-299.

Schnittker, J. (2007). Working and the self-rated health of women. *Journal of Health and Social Behavior,* 48(4), 390-405.

Sperling, Rhoda S., Bertrand JT., Rice J., Shelton JD et.al & John L. Sullivan. (1990). Contraceptive use in Matlab, Bangladesh in 1990: levels, trends, and explanations. *Stud Fam Plan,* 25(5), 319-34. doi: 10.2307/2137978. PMID: 7826917

Weiss, Christopher C. & Mary Elizabeth Hughes. (2005). Social Roles and Health: An Overview of Current Understanding and Directions for Future Research. *In Handbook of the Sociology of Mental Health, edited by Carol S. Aneshensel, Jo C. Phelan, and Alex Bierman*, 91-105.

Wood, David. (2003). Effect of Child and Family Poverty on Child Health in the United States. *Pediatrics,* 112(3), 707-711.

World Health Organization. (2019). Maternal mortality, Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality.

www.jnu.ac.bd